পূর্ণিমা

দ্বাদশ বর্ষ।

সন ১৩১১ সাল।

নব বর্ষ ও আত্ম-কথা।

অতীতের বিস্মৃতির মহাসাগরে আর একটী বৎসর গড়াইয়া পড়িল, আর একটি বৎসর ইহকালের মত ডুবিয়া গেল। কোথায় গেল বলিতে পারেন? বলিতে পারুন আর নাই পারুন আমরা ইহা বলিতে পারি—সকলেই বলিতে পারেন—যে অশীতিপর বৃদ্ধ, পঞ্চাশের প্রৌঢ়, ষোড়শের যুবক, আর সদ্যোঃজাত শিশু সকলেই মৃত্যুর দিকে একপদ অগ্রসর হইল। আর আমাদের সাধের পূর্ণিমাও, বিধির নির্ব্বন্ধ, সেই অলঙ্ঘনীয় মৃত্যুর দিকে একপদ অগ্রসর হইল। কে বলিতে পারে সে দিন কত দূরে?

কি করিয়া মানব মস্তিষ্ক অখণ্ড কালকে খণ্ডিত করিল, সূর্য্যের উদয় অস্ত দেখিয়া মাস ও বৎসর কল্পনা করিল সে এক বিরাট রহস্য। কে বলিবে কেন ঋষিগণ মৃগশিরার সঞ্চার দিন হইতে বৎসর কল্পনা করিয়াছিলেন আবার সেই মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) ত্যাগ করিয়া, কে, কবে, বৈশাখ মাসে,—কেনই বা বৎসর গণনা আরম্ভ করিলেন, কে বলিবে? কেন য়ুরোপ খণ্ড জান্নুয়ারী পছন্দ করিল, কেন মুসলমানেরা মহরমে মতলব করিল, অপরাপর জাতিরা অপরাপর ভাবে কেন ভোর হইল এ সকল রহস্য আজি কে বুঝাইতে সমর্থ? আর কতকাল ধরিয়া যে এইরূপ বৎসর গণনা চলিয়া আসিতেছে তাহাই বা কে নির্ণয় করিবে? চারিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়া-

ছিল একথা ধর্ম্মগ্রন্থে লেখা থাকিলেও কেহ আর এখন—ভূতত্ত্ব বিদ্যার দিনে—বলিতে সাহস করেন না। বর্ত্তমান ভূতত্ত্ববিদ্, একটা স্তর নির্ম্মাণেই পৃথিবী লক্ষ বৎসর লাগাইয়াছেন, বলিয়া থাকেন। এমন কতকত স্তর আছে। বর্ত্তমান জ্যোতিষ শাস্ত্রও বলেন যে সৌর জগতের সৃষ্টি যে কতকাল হইয়াছে তাহা ধারণা করা দুঃসাধ্য। এমন স্থির নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার আলোক এখনও পৃথিবীতে আসিয়া পঁহুছায় নাই অথচ সৃষ্টির দিন হইতে ক্রমাগত পৃথিবী অভিমুখে চলিতেছে। এই সকল গণনা করিতে সংখ্যা ফুরাইয়া যায় বলিয়া আমেরিকা ৮০০ বৎসর কে "এক" ধরিয়া গণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতেও সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যাইতেছে। সুতরাং য়ুরোপ আমেরিকায় পুরাণ পৃথিবী সৃষ্টির কথা ভাসিয়া গিয়াছে।

এখন হিন্দুর সময়ের ধারণাটা একবার দেখা কর্ত্তব্য। দৈব গণনা ছাড়িয়া দিলাম। আমাদেব এক বৎসরে দেবতাদের একদিন। সেইরূপ দেবতাদের শত বৎসরে ব্রহ্মার একদিন। এইরূপ যে গণনা আছে তাহা ছাড়িয়া দিলাম। তাহা ত্যাগ করিলেও মানুষের গণনাতেও অস্থি শীতল হইয়া আসিবে। আমাদের চতুর্যুগের পরিমাণ ৪৩২০০০০। এই সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি-মনে করুন ৭২বার ঘুরিয়া আসিলে তবে এক কল্প। এইরূপ কত কল্প আছে তাহার মধ্যে শ্বেত বরাহ কল্প অব্দ হইতেছে ৪৩২০০০০০০০। ইহার গত হইয়াছে ১৯৭২৯৪৯০০৫। ভূসৃষ্টি হইয়াছে ১৯৫৫৮৮৫০০৫। কলির পরিমাণ ৪৩২০০০, কলির গিয়াছে ৫০০৫, কলির আরও আছে ৪২৬৯৯৫। ইহার তুলনায় চক্ষুর নিমেষে একবার দেখুন ইংরেজী সন চলিতেছে মাত্র ১৯০৪। ওঃ মানব তুমি কত ক্ষুদ্র, আর কত নীচ ও আধুনিক: তোমার সভ্যতা, তোমার যাহা কিছু উন্নতি উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে হইয়াছে মাত্র। বলিতে বুক ফাটিয়া যায় যে জড় সেই সভ্য আর যে চৈতন্যময় যে আধ্যাত্মিক সেই অসভ্য; আবার যে জড় সে স্বাধীন যে চৈতন্যময় সে পরাধীন ও পদ দলিত। সময়ের এই বিরাটত্ব ও মানবের ক্ষুদ্রত্ব—অতি ক্ষুদ্রত্ব—অতি তুচ্ছতা—পর্য্যালোচনা করিলে এই উপলব্ধি হয় যে মানুষের কোন কার্য্যেই কোন হাত নাই; যে একজন কর্ত্তা আছেন তাঁহারই ইচ্ছায় সকল কর্ম্ম হইতেছে। যদি মঙ্গল চাও তাঁহার শরণাপন্ন হও। তাই হিন্দু কালের বিরাটত্ব দেখাইয়া নিশ্চিন্ত হন নাই। সেই কালের, সেই বিরাট

কালের সেই মহাকালের বুকে দণ্ডায়মানা দেখাইয়াছিলেন সেই মহাকালের কর্ত্রী, সেই মহামেঘপ্রভা মুক্তকেশী দিগম্বরী, দেখাইয়াছেন সেই মহাকালী, দেখিয়াছেন—

জ্যোতিরূপা হি সা দেবী সর্ব্বপ্রাণি ব্যবস্থিতা।
ব্যাসস্য সংশয়ংচ্ছেত্তুং স্বতন্ত্রাকৃতি মাদধে॥
স্ফুরৎ সূর্য্য সহস্রাভাং চন্দ্র কোটি সমদ্যুতিং।
সহস্র বাহুভির্যুক্তাং দিব্যাস্ত্রৈরভি সংবৃতৈঃ॥
দিব্যালঙ্কারভূষাঢ্যাং দিব্যগন্ধানুলেপনাং।
সিংহপৃষ্ঠে সমারূঢ়াং কদাচ্ছব বাহনা॥
চতুর্ভির্বাহুভির্যুক্তা নবীন জলদপ্রভা।
দ্বিভুজাচ চতুর্হস্তা তথা দশভুজা ক্ষণে॥
অষ্টাদশভুজা কাপি শত সংখ্যভুজা তথা।
অনন্তবাহুভি র্যুক্তা দিব্যরূপ ধরা ক্ষণে॥
কদাচিদ্বিষ্ণু রূপাচ বামেচ কমলালয়া।
রাধয়া সহিতা কস্মাৎ কদাচিৎ কৃষ্ণরূপিণী॥
বামাঙ্গাধিগতা বাণী কদাচিদ্ ব্রহ্মরূপিণী।
কদাচিচ্ছিবরূপাচ গৌরী বামাঙ্গ সংস্থিতা॥
এবং সর্ব্বময়ী দেবী কৃত্বা রূপাণ্যনেকধা।
ব্যাসস্য সংশয়চ্ছেদং চকার ব্রহ্মরূপিণী॥

হিন্দু দেখিয়াছেন, মজিয়াছেন, গলিয়াছেন। যিনি দেখিয়াছেন—তিনি দ্রষ্টা—তিনি ঋষি। যে হিন্দু তাঁর পাদপদ্মে মন সংযোগ করিয়া বসিয়া আছেন তিনি মুনি (সংলীন মানসঃ)। হিন্দু বুঝিয়াছেন যে ইহার যে প্রেম তাহাতে পাগল করে, মানবকে পথের ভিখারী করে। ইহাতে উঠা নাবা আছে, ইহাতে প্রাণভাসিয়া যায় প্রাণের জন্য, ইহাতে কোথাও ঘুরণ পাক, কোথাও চুবন খেয়ে হাঁকিয়ে উঠে দুনিয়া দেখে ফাক্। এই প্রেমে হিন্দু বিকাইয়াছেন। এই প্রেমের বিন্দু মাত্র পাইয়া কপিলবস্তুর রাজপুত্র রাজ্যভোগ ত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছিলেন। নদীয়ার বিজ্ঞ, সুধী ভট্টাচার্য্য মহাশয় ন্যায় ছাড়িয়া, মাতা শচী ও স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া ছাড়িয়া একেবারে কৌপীনধারী সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। এস ভাই আমরা মুণ্ড-

মালিনীর নিকট যুক্ত করে স্বদেশবাসীর জন্য সেই প্রেমের এক বিন্দু ভিক্ষা করি। আসুন সকলে ভক্তিভাবে দেবীকে প্রাণের অন্তস্তল হইতে ডাকি, ডাকিয়া জানাই। আসুন সকলে প্রণাম করি, আসুন সকলে বলি মা কালও তোমার, অকালও তোমার, মহাকালও তোমার। আমরা তুচ্ছ মানব আমাদের সময়ের ধারণা করিয়া কাজ নাই। তোমার কাল তোমারই থাক তোমার ইচ্ছা হয় মা মার্কণ্ডকে প্রলয় দেখাইও। আমরা ও সব কিছু চাই না, মা চাই কেবল তোমার মহাকালী রূপ দেখিতে, চাই যে ঐরূপে তুমি আমাদিগকে কৃপা কর। সহস্র যুগ যুগান্তর গত হইলেও, আমরা তোমার কৃপা পাইলে মা, বিচলিত হইব না। আমরা জাঁতার কাটি হইয়া বসিয়া থাকিব। জাঁতা সহস্র বার ঘুরিলেও আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই হইবে না। সে কৃপা পাইলে মা আমাদের পূর্ণিমা থাকুক আর যাউক তাহাতে কিছু আসিবে যাইবে না। তবে আজ পূর্ণিমার জন্মদিনে আর বৎসরের আরম্ভ দিনে যে মা তোমাকে ভুলি নাই ইহাই গুরুদেবের যথেষ্ট কৃপা। পূর্ণিমার আজ দ্বাদশ বৎসর আরম্ভ হইল বলিয়া যে আনন্দ হইতেছে তাহারও মূল মা আনন্দময়ি তুমি। তোমাতে কর্ম্ম ফল সমর্পণ করিয়া মা আমাদিগকে আবার একবৎসরের জন্য পুরাদমে খাটিতে দাও।

আমরা ১৩০৬ সালের বর্ষারম্ভে বলিয়াছিলাম "পুরাতন লাট এল্‌গিন চলিয়া গিয়াছেন নূতন বড় লাট কর্জ্জন আসিয়াছেন ও সুখ্যাতির সহিত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। সিমলা শৈল বিহারাবসানে কেমন থাকিবেন তা মা তুমিই জান।" তখন আমাদের এই কথা শুনিয়া তুমি হাঁসিয়াছিলে না কাঁদিয়াছিলে; না কি করিয়াছিলে? আজ ১৩১১ সালের বৈশাখে কর্জ্জন বিলাত গমন করিলেন, পূর্ণ ৫॥ বৎসর কার্য্য করিয়া ছুটি লইয়া বিশ্রাম করিতে বিলাত গমন করিলেন। দেশের অধিকাংশ লোক চারিদিক হইতে কর্জ্জনকে গালাগালি দিতেছেন। বলিতেছেন—কর্জ্জন তুমি বেশ লোক তোমার মনে যে এত ছিল তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই যদি তোমার হৃদয়ে বিষই ছিল তবে প্রথমে মুখে একটু অমৃত উদ্গীরণ করিয়া আমাদের হৃদয় মরুভূমিতে একটু ভাল-হইবার-আশার-মেঘের সঞ্চার কেন করাইয়াছিলে? এমন করিয়া কোটী কোটী লোকের হৃদয় লইয়া খেলা করিতে নাই। না বাস্তবিকই তুমি আমাদিগকে ভাল বাসিয়াছিলে তবে নমম

ল্যান্সারদের লইয়া দিল্লীর দরবারের সময় যে ব্যাপার হয় তাহাতে তুমি টলিয়া গেলে। তোমার হৃদয় অচল অটল, টলিবার নয়। না তুমি প্রথম হইতেই আমাদের সর্ব্বনাশ কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলে। যে কয়খানি আইন পাশ করিলে—মন্ত্রগুপ্তি আইন, বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি—তাহাতেই আমাদের অস্থিবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তিব্বতীয়দের উপর যে ব্যবহারটা করিলে তাহা কেহ কখনও করে নাই। আবার বাঙ্গালা দেশকে লইয়া যে খেলাঘরের ভাগ বাঁটোয়ারা করিতে উদ্যত হইয়াছ তাহাতে আমাদের ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইতে হইবে। প্রতিযোগী পরীক্ষা তুলিয়া দিয়া চাকরী বণ্টনের জন্য যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছ। এখন দেশে যাইতেছ ভাল থাক। হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি।

লাট কর্জ্জনের কার্য্যাকার্য্যের প্রতিকূল সমালোচকগণ এইরূপে তাঁহার শাসন কালের তীব্র সমালোচন করিয়া থাকেন ও হৃদয়ের জ্বালা কতকটা নির্ব্বাণের পন্থা অনুসন্ধান করেন। আমাদের বিবেচনায়, মা তোমার দুঃখী সন্তানগুলাকে তুমি আর এরূপ করিয়া জ্বালাতন করিও না—তাদের সৎবুদ্ধি দাও। মা বুঝাইয়া দাও যে লাট কর্জ্জন কোন দোষে দোষী নন, যে তিনি তোমার নাচানিমত নাচিয়াছেন কর্জ্জন পুত্তলীকে তুমি যেমন নাচাইয়াছ তিনি সেইরূপ নাচিয়াছেন। মূলে তুমি তাই এই মহান্ সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেব রামপ্রসাদ এক দিন তার স্বরে গাহিয়াছিলেন!

মন গরিবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা যেমনি নাচাও তেমনি নাচে॥
যদি বল কর্ম্মসূত্র মা, সে সূতর কাট্‌না কে কেটেছে।
ওরে মায়া সূত্রে বেঁধে জীবে ক্ষেপা ক্ষেপি খেল খেলিছে॥

মা তোমার মর্ম্মপীড়িত দুর্ভাগ্য ভারত সন্তানকে একবার বুঝিতে দাও যে রাজপুরুষদের দোষ দেওয়া অন্যায়, সেই মহাশক্তির যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপেই সেই ভাবেই রাজশক্তি শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন; রাজার দোষ কি? সে সূতার কাট্‌না কে কেটেছে? সে যে তুই। তবে বুঝাইয়া দাও যে এই যে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইতেছে তাহার মূল তুমি, বুঝাইয়া দাও যে কোটী কোটী ভারত নর নারী যে দুর্ভিক্ষের করাল কবলে নিষ্পেষিত হইতেছে মা তাহার মূল তুমি। তুমি হয় ত ভারতের ভার হরণ কার্য্যে ব্রতী

হইয়াছ। ভারতের লোক যুদ্ধ করে না, যুদ্ধে মরে না তাহাদের ভার কমাইতে হইলে জর বিসূচিকা প্লেগ এই সবই ত চাই। এই যে দশ বৎসর ধরিয়া পূর্ণ প্রকোপে প্লেগ চলিতেছে ইহার ফল কি হইয়াছে? কোটী কোটী লোক শমন সদনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে। অপর দেশ হইলে দেশ উজোড় হইয়া যাইত সহর বন জঙ্গলে পরিণত হইত, কেবল জন্মক্ষেত্র বলিয়াই এখনও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। নহিলে এ কি কথা। সপ্তাহে সপ্তাহে ভারতে এখনও অর্দ্ধলক্ষ লোক মরিতেছে ইহা ভাবিলে কি আর হৃদয়ে কিছু থাকে?* প্লেগ ছিল না। কোথা হইতে আসিল—কেনই বা আসিল? এই বিশাল পৃথিবীর উভয় আমেরিকা য়ুরোপ আফ্রিকা এসিয়া মহাদেশ গুলি থাকিতে সব ছাড়িয়া ভারতে আসিয়া প্লেগ দেখা দিল কেন? মা তোমার কাতর সন্তানকে একবার বুঝাইয়া দাও যে সে প্লেগের ভিতর তোমারই সংহার মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। সময়ে জল হইলে ত আর দুর্ভিক্ষ হয় না? মা বুঝাইয়া দাও যে সে জল দিবার মালিক তুমি। মা একবার বুঝাইয়া দাও যে বিঘ্নবিপদ বাধা বিপত্তি বিড়ম্বনার; রোগ শোক তাপ মনকষ্ট হা হুতাশের, প্লেগ প্রভৃতি নিদারুণ ব্যাধির, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি শোচনীয় মহামারীর মূলে তুমি। তোমার ইচ্ছায় আজ দুর্ভাগ্য ভারত সন্তান অনেক বৎসর ধরিয়া দুঃখ পাইতেছে। শরীরের যদি রক্ত দূষিত হয় তাহা হইলে শরীরে নানা প্রকার ব্যাধি উপস্থিত হয়। বাহ্যিক ঔষধ লেপনে সে ব্যাধি দূর হয় না। ঔষধ সেবন দ্বারা শরীরের শোণিত শোধিত হইলে তবে ব্যাধির মূল উৎপাটিত হয়। ভারতের এই যে প্লেগ দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি নানা বিপত্তি ইহার কারণ শোণিত দূষিত হইয়াছে। ধর্ম্মই ভারতের শোণিত ভারতের প্রাণ সেই ধর্ম্ম হারাইয়া ভারত আজ নানা বিঘ্ন বিতাড়িত। ধর্ম্ম-প্রাণ ভারত যদি আবার ধর্ম্ম অবলম্বন করে তাহা হইলেই তাহার মঙ্গল হইবে নতুবা নহে। অকারণ রাজাকে দোষ দিলে চলিবে না। ইহা যে

* বৎসরের প্রথম সপ্তাহে অর্থাৎ যে সপ্তাহে আমাদের নূতন বৎসর আরম্ভ হইয়াছে সেই সপ্তাহে, সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, বঙ্গের ছোট লাটের অধিকৃত প্রদেশ সমূহে ২৫৮২ জনের উপর প্লেগের আক্রমণ হয় তাহাতে ২৪৪৩ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বোম্বাই প্রেসিঃ মার্চ্চ মাহার ৩ সপ্তাহে মোটামুটি ৩৫০০০ মৃত্যু।

আমাদের অদৃষ্টের দোষ। মা গো সেই কথা একবার তোমার সাধের ভারত সন্তানকে বুঝাইয়া দাও। সে একবার বুঝুক।

মা বৎসর বৎসর আমরা এইরূপে বৎসরের প্রথম দিনে কাঁদিয়া আসিতেছি। মা গো চারিদিকেই যে ঘোর অন্ধকার, গাঢ় তমিশ্রাময়ী নিশীথিনী রজনীর সূচীভেদ্য ঘোর অন্ধকার, তাহার উপর আবার দুর্ভাবনার মেঘকদম্ব। মা যাই কোথা করি কি আর যে আশার বিদ্যুতেরও চমক নাই। মা চাই না তোমার রাজনীতি—রাজার নীতি রাজারই থাক, আর রাজাও ত তুমি। আমরা যে দুঃখী দীন দরিদ্র অর্দ্ধাশনভোজী কঙ্কালসার প্রজা। মা আমাদের ক্ষুধার সময় খাইতে দাও পেট ভরিয়া খাইতে দাও, মা আমাদিগকে তৃষ্ণায় জল দাও, আর আমাদিগকে নিৰ্ব্বিরোধে ভগবানকে ডাকিতে দাও, আর রাজার নির্দ্ধারিত কর দিবার জন্য যতটুকু আর্থিক সচ্ছলতা প্রয়োজন ততটুকু মাত্র দাও। আর কিছুই চাই না। ঐ যে প্রশান্ত সাগরের বক্ষে সুদূর পূর্ব্বে রক্ত-লোহিত বরফের চাপগুলা ভাসিতেছে ও গুলা দেখিলে আমাদের ভয় হয়। কামানের শব্দ শুনিলে আমাদের হৃৎকম্প হয় চিনের পটকার শব্দেই মাথা ধরে। মা নর শোণিত সাগর সন্তরণ করিয়া যে জাতি বড় হয় তাহার মহত্ব আমরা বুঝিতে পারি না, নরহত্যা করিয়া ধরাধামে যে প্রাধান্য লাভ তাহাও বুঝিতে পারি না, বুঝিতে পারি না জাপানের গৌরব বুঝিতে পারি না রুষজাপান যুদ্ধের তাৎপর্য্য। আমরা দরিদ্র আমাদের কুটীরই ভাল আমরা খাইয়া পরিয়া তোমাকে ডাকিব এই মাত্র চাই। তুমি প্রশান্ত সাগর বক্ষে যে খেলা খেলিতেছ তাহা তুমি বুঝগে আর তোমার বীর সন্তানগণ বুঝুকগে; তুমি তিব্বতে আবার যে নাটকের অভিনয় আরম্ভ করিয়াছ তাহাতেও আমাদের স্থান নাই। এক দিন না জন্ ব্রাইটের মুখ দিয়া তুমি এই কথা বলিয়াছিলে—

I believe there is no permanent greatness to a nation except it be based upon morality. I do not care for military greatness or military renown. I care for the constitution of the people among whom I live. There is no man in England who is less likely to speak irreverently of the Crown and Monarchy of England, than

I am ; but crowns, coronets, mitres, military display ; the pomp of war, wide colonies, and a huge Empire are trifles light as air and not worth considering unless with them you can have a fair share of comfort, contentment and happiness among the great body of the people. Palaces, princely castles, great halls and showy mansions do not make a nation. The nation in every country dwells in the cottage, and unless the light of your constitution can shine there, unless the beauty of your legislation and the excellence of your statesmanship are printed in the feelings and condition of the people, rely upon it, you have yet to learn the duties of Government.

তাই বলি চাই না আমরা তোমার চাকচিক্যশালিনী সভ্যতা চাই না তোমার মিথ্যা কথার ডিপ্লোমেসি, চাই না তোমার প্রাণ সংহারক বন্ধুর আলিঙ্গন। আমরা কাঙ্গাল মা আমাদিগকে কাঙ্গালই থাকিতে দাও। আমরা এসব বুঝিতে পারি, কিন্তু বুঝি না কেমন করিয়া ব্রাইটের আসনে ব্রডরিক বসেন। যাক্, বুঝিয়াও কাজ নাই। দুর্গা দুর্গতিহরা মা রক্ষা করিও। দুঃখে সুখে দিন যাউক ক্ষতি নাই যেন ভারতবাসী তোমাকে ডাকিতে না ভুলে—এই করিও।

এখন পূর্ণিমা। যদি পূর্ণিমা না থাকিত তাহা হইলে বঙ্গের কি কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হইত? মনে করুন উঠিয়া গিয়াছে, নাই। কাহারও কি কিছু ক্ষতি হইবে? রাজা বিনা রাজ্য চলে পূর্ণিমা অভাবে বাঙ্গালা চলিবে না কেন? কিন্তু একবার কথাটা অপর ভাবে দেখুন বাঙ্গালা হেন দেশে বাঙ্গালির মাসিক পত্রিকা আজ একাদশ বৎসর রোগশোক দুঃখ ভোগ করিয়া বাঁচিয়া আছে—কেন? বলিব ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা। জগতে বালুকাকণার ও সৃষ্টি সামঞ্জস্য আছে—উপকারিতা ও উপযোগীতা আছে, পূর্ণিমার থাকিবে না কেন? তবে তুমি না ধরিতে পার তুমি না বুঝিতে পার কিন্তু আছে। যে দিন সে উপযোগীতা থাকিবে না সেদিন সম্রাটও চেষ্টা করিলে পূর্ণিমা রাখিতে পারিবেন না। তাই মা ইচ্ছাময়ি তোমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া

তোমার অভয় হস্তের দিকে চাহিয়া আবার কাল সাগরের কর্ত্তব্যের মোহানায় সন্তরণ আরম্ভ করিলাম। সকলই ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিতেছে। তাই ভক্ত বলিয়াছেন—

কাহং মন্দমতিঃ কেদং মথনং ক্ষীরবারিধেঃ।
কি তত্র পরমাণুর্বৈ যত্র মজ্জতি মন্দরঃ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥
ওঁ।

বসন্তে।

(১)

প্রবাসী বসন্ত পুনঃ আসিল ধরায়
এতদিন পর ;
আহ্বানিতে তারে আজ মেদিনী করেছে সাজ,
ঝরে নেত্রে আনন্দাশ্রু শিশিরের জল ;
চারু মরকত সাটী পীতাম্বরী পরিপাটী
জড়ায়েছে কলেবরে শ্যামল কোমল ;
আবেশেতে ঢলঢল নয়ন পল্লবদল,
পতি আশে বিরহিনী সজেছে বাসর।

(২)

আভরণ হীনা বালা ছিল এতকাল
দারুণ-বিরহে,
এখন আবেশভরে তুলিল শিরবোপরে
মার্জ্জিত চাঁচর কেশে শশী-কিরিটীনী ;
উরসে কনকহার তারকা বিমলধার
বরষিল উজলিয়া শত মুক্তামনি ;
পাশে নিশা সহচরী তাহার গলায় ধরি
বিবশা ঝিল্লির রোলে কত কথা কহে !

(৩)

বলয়, কনকলতা পরিল তুলিয়া
রিক্ত দুটী হাতে ;
তাহাতে হীরার শোভা   শ্বেতাভ কুসুম আভা
চিকন চপলপ্রভা করে বিকীরণ ;
সুতনু উথলে বাস,   নিশ্বাস মলয়-শ্বাস
নব জীবনের স্রোত বহিল কেমন !
ব্রীড়াময়ী নবদার   নম্রতা মাধুর্য্য তার ;
বিমল নয়ন জ্যোতি ভাসে নভোপাতে !

(৪)

কোকিল, কোমলকণ্ঠ উঠিল কুকারি
আশা প্রখরতা ;
হৃদয়ের স্রোত খর   তটিনীর তর তর
বহিল পরাণে নব প্রণয় উচ্ছ্বাস ;
চারু নির্ঝরিণী জলে   আশার কিরণ ঝলে
বহিল তরঙ্গ ভঙ্গে হৃদয় উল্লাস ;
আনন্দে উঠিল হাসি   অধর কোণায় ভাসি
সে হাসি ত্রিদিবজয়ী ঢালে মধুরতা !

(৫)

হায় এই মধুমাসে কেন পড়ে মনে
কৈশোর সময় ;
নবীন উৎসাহ পূর্ণ   হৃদয় বিষাদ শূন্য,
মূর্ত্তিমান বসন্তের ছ'টী চারুরাগ !
নদীর কল্লোল সাথে   নাচিতাম সুপ্রভাতে ;
মাখিতাম এই বক্ষে ফুলের পরাগ ;
সকলি নবীন রাগে   নয়নের পুরোভাগে
নাচিত, করিত মুগ্ধ নবীন হৃদয় !

(৬)

কুটিল সংসারজ্বালা না ছিল ভাবনা
দিবস রজনী ;
ধন মান অপমান   যশ জ্ঞান অবিরাম,
না ছিল আশার নেশা হৃদয় মাঝারে !
প্রমত্ত মধুপমত   ফুলে ফুলে অবিরত—
খেলিতাম গাহিতাম কোকিল ঝঙ্কারে !
এবে দেখি অনিবার   এ আশার নাহি পার ;
জীবন তরণী মোর আশা বৈতরণী !

(৭)

রসাল বকুল ফুলে বকুল মুকুলে
সোহাগের হাসি,
গরবিনী গোলাপের   সুধাহাসি অধরের,
মানিনী পদ্মিনী মুখে অরুণ আভাস,
সেঁউতি অশোক গন্ধ   সমীর সুরভি মন্দ,
টগর মল্লিকা জবা মালতীর বাস,
যুঁই যুথী সুধারাশি,   রজনীগন্ধার হাসি
আর না ত্রিদিব ছটা দেয় পরকাশি !

(৮)

এখন সে দিন গেছে আর ত হৃদয়
ভরে না তাহাতে !
ফুলের প্রেমের খেলা,   তটিনী লহরী লীলা,
রজত চাঁদিমা, পিক-জীবন্ত রাগিনী,
আর ত ভরেনা প্রাণ !   একরূপ (হে) ম্রিয়মান
থাকে হৃদি দুঃখভরে দিবস যামিনী !
বরষি অনল বারি   কেন বা বুঝিতে নারি
সদাই নিদাঘ জ্বালা হৃদি-নভোপাতে !

১লা চৈত্র।   শ্রীনিতাইচাঁদ শীল।

রুষ-জাপান-সমর উপলক্ষে।

ভগবান আবার ভূ-ভার হরণ উদ্দেশে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। রণচণ্ডী আবার ঘোর রণে নাচিয়াছেন, আবার শোণিত সাগরে সন্তরণ করিতেছেন, আবার শকুনি গৃধিনী শিবাদল ছিন্ন শির শবদেহ লইয়া বিকট চীৎকার সহকারে বীভৎস্য আনন্দে টানাটানি করিতেছে। আবার বীর রণজয় করিয়া খলখল হাসিতেছেন, আবার ভীরু উভরড়ে পলাইতেছে, আবার বিধবার উষ্ণশ্বাস স্বামী উদ্দেশে আবার মাতার উষ্ণশ্বাস পুত্রের আত্মার উদ্দেশে আবার ভ্রাতার উষ্ণশ্বাস ভ্রাতার আত্মার উদ্দেশে মহাকাশে ছুটাছুটি করিতেছে। আবার যুদ্ধ বাধিয়াছে, জলে স্থলে বাধিয়াছে, জাহাজে জাহাজে বাধিয়াছে, টর্পিডোয় টর্পিডোয়ে বাধিয়াছে সেনাপতিতে সেনাপতিতে বাধিয়াছে সেনায় সেনায় বাধিয়াছে। ভীমকায় কসাকের সঙ্গে বামনাবতার জাপান সেনার সঙ্গে, রুষে জাপানে, অসমানে অসমানে আবার ঘোর যুদ্ধ বাধিয়াছে। সহস্র সহস্র লোক শমন সদনে আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে,, সুদূর পূর্ব্বদিকভাগে প্রশান্ত সাগরের নীল জল আবার ঘোর লাল রঙ্গে রঞ্জিত হইয়াছে বরফের স্তুপ আর শ্বেত নাই রক্ত রঞ্জিত হইয়াছে, মাঞ্চুরিয়া কোরিয়ার মৃত্তিকাপুঞ্জ এখন শোণিত কর্দ্দমের রাগে রঞ্জিত। ঘোর যুদ্ধ আবার বাধিয়াছে।

যুদ্ধ আবার কেন বাধিল? আজ তিন মাসের উপর যুদ্ধ চলিতেছে। যুদ্ধ আবার কেন বাধিল ইহার কারণ জানিতে আর কাহারও বাকি নাই। তথাপি প্রবন্ধের সম্পূর্ণতা কল্পে দুই এক কথা বলিতে হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জাপানের সহিত চীনের সমর হইয়াছিল। চীনকে সেই যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হইয়াছিল আর জাপান জয়োল্লাসে মত্ত হইয়া পৃথিবীর সম্মুখে বিজয়বৈজয়ন্তী পত পত শব্দে উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন। যুদ্ধে হারিয়া চীনকে অনেক ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হয়—ক্ষতিপূরণ স্বরূপ জাপানকে অনেক টাকা জরিমানা দিতে হয়। পোর্ট আর্থার বন্দর জাপানীদের কামানের গোলার বেগ সহ্য করিতে পারে নাই। পোর্ট আর্থার বন্দর জাপানের দখলে আসিয়াছিল। এই যুদ্ধ অবসানে একটি সন্ধি হইয়াছিল। সেই সন্ধির মর্ম্মানুসারে সকল কাজ হইয়াছিল। অর্থাৎ এই হইয়াছিল যে জাপানের কর্দ্দম

মর্দ্দনই সার হইয়াছিল মৎস্য প্রাপ্ত হন নাই। য়ুরোপীয় জাতিরা সেই সময় প্রথম বুঝিতে পারেন যে জাপান কি ছিল ও কি হইয়াছে পঞ্চাশ বা ষাটি বৎসরে জাপান চুপে চুপে ভিতরে ভিতরে যে কতটা জাতীয় উন্নতি করিয়াছেন তাহা সেই যুদ্ধে বুঝিতে পারেন। য়ুরোপীয় রাজনীতির গতি বড় সর্প গতি। য়ুরোপ ও আমেরিকা আপনাদিগকে বড় বলিয়া জানেন ভূমণ্ডলে আপনাদিগকেই সভ্য বলিয়া জানেন। তাঁহাদের মতে ভূমণ্ডলে তাঁহাদের মত আর কেহই নাই হইতে পারে না ও হইবে না। তাঁহাদের বড় ভয় পাছে অসভ্য আসিয়ার লোক বড় হয় না তাঁহাদের সমকক্ষ হয়। চীন ও জাপানের লোককে তাঁহারা পীতবর্ণ বলিয়া বর্ণনা করেন ও তাহাদের বড় হইবার ভীতি বা বিপদ-জ্ঞানকে yellow peril "পীত-ভীতি" বলিয়া বর্ণনা করেন। য়ুরোপীয় জাতিরা চীন জাপান যুদ্ধ অবসানে যখন বুঝিতে পারিলেন যে জাপান আর অসভ্য নহে, জাপান আর ধাত্রীর অঞ্চল ধরিয়া বেড়ায় না জাপান কর্ম্মঠ স্বাধীনচেতা যুবক পদবী আরূঢ় হইয়াছেন তখন আপনা আপনাদের মধ্যে চোখ টিপাটিপি করিয়া জাপানকে ছলে ভুলাইলেন। বলিলেন জাপান হুস্ ঐ কাকে লইয়া গিয়াছে; আর্থার বন্দরই বা তুমি কি করিয়া পাইবে? কোরিয়াতেই বা তোমার কি অধিকার? ফরাশি জার্ম্মানী রুষ এক যোগ হইয়া জাপানকে যুদ্ধ জয়লাভের ফলভোগ করিতে দেন নাই। বড় সাধের আর্থার বন্দর জাপানকে দেন নাই। মনে করিলেন যে জাপানকে ভুলাইয়াছি। এইরূপে সকলে মিলিয়া জাপানের পরিশ্রম পণ্ড করিয়াছেন আর রুষ তাহাদের মধ্যে একজন বড় পাণ্ডা ছিলেন।

জাপান আর অসভ্য নহেন। জগদম্বার কৃপার পূর্ণ দৃষ্টি এখন জাপানের উপর পড়িয়াছে। জাপান মনে মনে সব বুঝিলেন কিন্তু বাহিরে মূর্খ সাজিলেন কিল খাইয়া কিল চুরি করিলেন। মনে মনে প্রাণের অন্তস্তল হইতে বুঝি ডাকিয়া বলিয়াছিলেন মা যদি দিন দেন তবে ইহার প্রতিশোধ একদিন লইব। যাহাহৌক সে ব্যাপার সিমনোসকির সন্ধিতে একরূপ চুকিল। য়ুরোপীয় জাতীরাও পীত-ভীতি হৃদয়ে চাপিয়া ফেলিলেন। আর একটা কথা আছে পরে বলিব।

রুষ মধ্য আসিয়া গ্রাস করিয়া শনৈ শনৈ চীনের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। চীনকে অংশ করিয়া লইবার জন্য যখন য়ুরোপীয় জাতীরা

মৎলব আঁটিতেছিলেন সেই সময় রুষ জোর করিয়া মাঞ্চুরিয়া প্রদেশে প্রবেশ করেন। চীনের মঙ্গোলিয়া তাহার করাল গ্রাসে অগ্রেই কবলিত হইয়াছিল এখন মানঞ্চুরিয়ার পালা পড়িল। কাহারও কথা না শুনিয়া রুষ ধীরে ধীরে মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন চীন কেবল চাহিয়া দেখিতেছে। এই সময়েই এই বন্দোবস্ত হয় যে নিউচাং প্রভৃতি বন্দরে সকল জাতিরাই বাণিজ্য করিতে পারিবেন। পোর্ট আর্থার রুষ পাইবেন। ইংরেজেরা উইহে উই পাইবেন ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে রুষকে মাঞ্চুরিয়া ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। তাহা সকল সভ্য জাতির অনুমোদিত হয়। পরে বলিব যে কথা বলিয়াছি তাহা এইখানে বলা আবশ্যক জাপান এমন একটা বন্দোবস্ত করিয়া লন যে ভবিষ্যতে যুদ্ধ হইলে একা একা লড়িতে হইবে—কোন দুইটি জাতি এক হইয়া একটি জাতিকে সংহার করিতে পারিবেন না বা যুদ্ধও করিতে পারিবেন না। আর এই সন্ধিসূত্রে এই হইল জাপানকে "সভ্য" বলা হইল, তাহার আসিয়াত্ব কাগজে ঘুচিল। এক কথায় জাপানকে যেন য়ুরোপীয় সমাজে তুলিয়া লওয়া হইল। পাঠক মহাশয় নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন যে আমরা কথাটা স্থূল ভাবে বুঝাইবার জন্য, নহিলে নয় এমন স্থূল স্থূল কথা গুলি মাত্র বলিতেছি। এইরূপে ১৮৯৬ সালের ব্যাপার একরূপ মিটিয়াছিল। কিন্তু ৯৬ সালের ধূমকেতুর পুচ্ছ অনেক দিন ও অনেক দূর হইতে দেখা দিয়াছিল। আর এখনও রুষ-জাপানে যে সমর চলিতেছে, অনেকের মতে, তাহার সেই পুচ্ছের অংশ বিশেষ।

দিন যায় মাস যায় বৎসর চলিয়া গেল—রুষ কিন্তু কাহারও কথা শুনেন না। দিন যায় মাস যায় রুষ কিন্তু ক্রমে ক্রমে ডাল্‌নী, পোর্ট আর্থার, ভালাডি ভস্‌টক প্রভৃতি সুদৃঢ় দুর্গবদ্ধ করিতে লাগিলেন। লোকে বলে সময় হইয়াছে আর কেন রুষ তুমি উঠ রুষ কিন্তু চক্ষু বুজিয়া আপনার শিকড় গাড়িতেছেন। হার্ব্বিণ মুকদেন প্রভৃতি দৃঢ়রূপে সংরক্ষিত করিতেছেন। যাহার যেখানে ব্যথা তাহারই সেইখানে হাত। অপর জাতিরা বুঝিয়াও বুঝিলেন না অথবা য়ুরোপীয় ডিপ্লোমেসি যদি ভাল জিনিষই হয়, মিছামিছি পরের কলহ কি জন্য ক্রয় করি বলিয়া কেহ আর রুষের অপহরণ কার্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। কেহ বা দেখিয়াও দেখিলেন না।

কিন্তু ব্যথার ব্যথী জাপান লিঙ্কস্ দৃষ্টিযোগে রুষের প্রতি কার্য্যে তীক্ষ্ণ সমালোচন করিতে লাগিলেন। বুঝিলেন রুষ কিছুতেই মাঞ্চুরিয়া ছাড়িবেন না কাহার কথা শুনিবেন না। আর প্রতিবাদী ত কেহই হইবে না। ইংরেজ চীন জাপানের মঙ্গলের জন্য রুষের সহিত কখনও যুদ্ধ করিবেন না। ফরাশি জর্ম্মানি, তাহারা ত রুষের বন্ধু, হাই তুলিয়া চক্ষু টিপিয়া সরিয়া যাইবেন। আমেরিকা? তিনি বড় যুদ্ধ বিগ্রহ ভাল বাসেন না। স্পেন ও ফিলিপাইন দ্বীপ পুঞ্জে সমর করিয়া তিনি জর্জ্জরিত তিনি আর খাল কেটে কুমীর আনিবেন না। পরের কলহ তিনি আর নিজের করিবেন না। বাকি রহিল চীন ও জাপান ও ইংরেজ। ইংরেজ সহসা রুষের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইবেন না ইহা রুষ বিলক্ষণ জানিতেন। এই সকল কথা রুষ যেমন জানিতেন তেমনি জাপানও জানিতেন। জাপান আরও জানিতেন যে চীন-হস্তী আপনার দেহ দেখিতে পায় না আপনার বল জানে না ভয়ে মরিয়া আছে। জাপান জানিতেন যে কোরিয়া তাহার দ্বার স্বরূপ সে দ্বারে একজন প্রবল শত্রু বসিয়া থাকিলে, বা মাঞ্চুরিয়ার সমুদ্র কূলে আসিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সেই সবল শত্রু বসিয়া থাকিলে জাপানে বাস করা ভার হইবে। আপনার গৃহে একরূপ বন্দী হইতে হইবে। আর জাতীয় উন্নতি কল্পে যে সকল অভিসন্ধি করিয়াছিলেন, সে সমস্তই দরিদ্রের আশার ন্যায় উঠিয়াই হৃদয়ে লয় হইয়া যাইবে। জাপান দেখিল যে রুষ তাহাকে নাগপাশ বন্ধনে বাঁধিতেছে। জাপানকে না মারিলে চীনের ভূখণ্ডটা ভাগ বাটোয়ারা হয় না সুতরাং রুষ জাপানের চারিদিকে ঊর্ণনাভের ন্যায় জাল বিস্তার করিতে লাগিল। অপরাপর জাতীরা দেখিয়াও চক্ষু মুদিয়া রহিলেন। জাপানকে সুতরাং বুঝিতে হইল যে যদি বাঁচিতে হয় তাহা হইলে আজি হোক কালি হোক রুষের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে। নহিলে তাহাকে আত্মহত্যা করিতে হইবে—জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হইবে। তাই কি থাকিতে দিবে? বাণিজ্য প্রিয় জাতিরা সুন্দর সুন্দর বন্দরের জন্য জাপানটাও অংশ অংশ করিয়া লইবে।

এই সমস্ত কথা জাপানী মস্তিষ্ক স্থিরচিত্তে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছিল। সে চিন্তায় ভুল নাই—ভুল হয় না, কেন না তাহা জগদম্বাকে স্মরণ করিয়া সকল সমর্পণ করিয়া। দুর্বলের সহায় কে? হরি। সে আর কাহাকে

ডাকিবে? তাই নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য দেহ রক্ষার জন্য জাপান অসাধ্য সাধনে উদ্যত হইল। সাগর ছেঁচিয়া মাণিক আহরণ করিতে উদ্যত হইল ঔষধির জন্য সুধার জন্য সমুদ্র মন্থন করিতে নিযুক্ত হইল। ধীর ভাবে স্থির চিত্তে দৃঢ় কোমর বাঁধিয়া জাপান আপন নৌবল ও সেনাদল বৃদ্ধি করিতে ও কার্য্যের কুশল দেখিতে প্রয়াসী হইল এবং অল্প দিনের মধ্যে সে কার্য্য সুসম্পন্ন করিল। রুষও দেখাদেখি ভয়ে ভয়ে করিতেছিলেন বটে, তবে আহারের চেষ্টায় দৌড়ান ও প্রাণভয়ে দৌড়ান। ফলত রুষের কার্য্য দেখিয়াই জাপানের সন্দেহ হয়। আর একটা সুবিধা ছিল সিমোনসকির সন্ধিপত্রের সর্ত্তানুসারে জাপান জানিয়াছিল যে যদি রুষের সহিত তাহাদের যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে সে যুদ্ধে আর কোন জাতি যোগ দান করিতে পারিবেন না। জাপান যখন দেখিলেন যে একক দুই জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে সমকক্ষ তখন সাজসজ্জা সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া মুখস খুলিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন যে রুষ তুমি কাহারও কথা শুনিতেছ না তাহাতে কেহ কিছু করিবে না কিন্তু আমরা করিব যদি অমুক তারিখের মধ্যে মাঞ্চুরিয়া হইতে সৈন্য উঠাইয়া না লও এবং দেশে ফিরিয়া না যাও তাহা হইলে আমরা যুদ্ধ করিব জোর করিয়া মাঞ্চুরিয়া হইতে তোমাকে তাড়াইব। সাবধান। আমরা ব্যঙ্গ করিতেছি না।

রুষ এই সদর্প বাক্য শুনিয়া একে বারে স্তম্ভিত হইলেন। মনে করিয়াছিলেন যেমন বার বার ফ্যা ফ্যা করিতেছে এবার সেইরূপই হইবে কিন্তু দেখিলেন যে তাহা নয় ব্যাপার গুরুতর। মনে করিলেন বেশ সুযোগ হইয়াছে—আয় বেটারা চিরকালের মত তোদের সমর সাধ ঘুচাই—বামন হইয়া চাঁদে হাত। তুচ্ছ একটা চীন সমর জিতিয়া এত দর্প! সে যে মরাকে মারিয়াছিল সে যে মড়ার উপর খাড়ার ঘা দিয়াছিল। কিন্তু তবুও হঠাৎ যুদ্ধ ঘোষণা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়—তখন সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন হয় নাই। ভীষ্ম পর্ব্বের পূর্ব্বে ত উদ্যোগ পর্ব্ব চাই। তাই মুখে সুমিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন "সে কি ভাই জাপান, এ কি কথা শুনি তোমার মুখে তুমি পাগল হইয়াছ। মাঞ্চুরিয়া ছাড়িব তবে দিন স্থির হয় নাই এক মাস সাবকাশ দাও, জিজ্ঞাসা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের মত জানি কবে ছাড়িতে হইবে।" চাণক্যে চাণক্যে বুদ্ধির খেলা। জাপানও হাসিয়া বলিলেন "বটে বটে ভুল হইয়াছে কথাটা না বলিলেই হইত, ভাল উঠিয়া ত যাইবে না হয় বলিয়াছি, ভাই বন্ধু কবে উঠিবে? সময় এক মাস দিলাম যাহা ইতিকর্ত্তব্য হয় ইহার মধ্যে সারিয়া লও।" এই রূপ চলিল। বার বার সময় লওয়া হইতে লাগিল অথচ রুষ ভিতরে ভিতরে গোপনে গোপনে সুদূর পূর্ব্ব দেশে গাড়ি গাড়ি সৈন্য পাঠাইতে লাগিলেন। সাইবিরিয়া রেল পথে পঙ্গপালের ন্যায় সৈন্য ছুটিল; সাজ সাজ শব্দ পড়িয়া গেল। দুর্গ সংস্কার আরম্ভ হইল অসির মাজাঘষা আরম্ভ হইল বন্দুকের ময়লা সাফ হইতে লাগিল। জাপান দেখিলেন বুঝিলেন জগতের লোককে ডাকিয়া বলিলেন একবার রুষ রঙ্গ ভঙ্গ অপাঙ্গে দেখিয়া লও। তাই হে এমন সুযোগ আর হবে না। শেষ রুষ তিন সপ্তাহের সময় চাহিলেন এদিকে ভিতরে ভিতরে সমস্ত যোগাড় করিয়া মার্চ্চ মাহার প্রথমেই একটি "ডিবসন" অর্থাৎ বহুসহস্র সৈন্যকে চুপে চুপে জাহাজ হইতে যুদ্ধ করিবার জন্য ভূমে নামাইলেন। ভালডিভসটক হইতে রণতরী আসিয়া আর্থার বন্দরে যোগ দিল।

জাপান বুঝিলেন আর না আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে ঘরে বাশ মড়া হইতে হইবে। যেমন সময় ফুরাইল আর অমনি দুই দিক হইতে আর্থার বন্দরে ও সিমুলকো বন্দরে রুষ রণতরীকে আক্রমণ করিল। রুষের চমক ভাঙ্গিল জগৎ শিহরিল। নীল সুনীল নভোমণ্ডল হইতে দিবা দ্বিপ্রহরে সহসা বজ্রাঘাত হইল। জগৎ কম্পিত হইল। সভ্য জাতিরা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে হাঁ করিয়া প্রশান্ত সাগরবক্ষাভিমুখে মনঃসংযোগে চাহিয়া দেখিল।

গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম তোপ চলিল ঘোরতর নৌযুদ্ধ হইল অনেক দিন ধরিয়া হইল। রুষ পদে পদে হারিতে লাগিলেন জাপান ধীরে ধীরে জয়লাভ করিতে লাগিলেন। শেষে যুদ্ধের পর যুদ্ধ দেখিয়া জাপানের কার্য্যকুশলতা আত্ম নির্ভরতা নৈপুণ্য ক্ষিপ্রহস্ততা অদম্য উৎসাহ, অকুতো সাহস দেখিয়া য়ুরোপীয় জাতির জগৎ স্তম্ভিত হইল। আজ জাপান সহ নৌযুদ্ধে বল গর্ব্বিত রুষ রণতরী জলশায়ী। আজ নগণ্য জাপানের হস্তে মহাবীর কসাকের লাঞ্ছনা। আজি জোনাকীর হস্তে সূর্য্যের অপমান। রুষ বলিলেন অন্যায় যুদ্ধ করিয়াছে, সময় হয় নাই, না বলিয়া যুদ্ধ করিল। পৃথিবী শুদ্ধ লোক বলিল না ইহা জাপানের পক্ষে ধর্ম্ম যুদ্ধ ঠিক করিয়াছে নহিলে

জাপনাকে বোকা বলিতাম। নৌযুদ্ধে জাপান বিজয়ী রুষ একেবারে পরাভূত হইয়া গেলেন।

কোন্ দিন সমরে কি হইল, কোন্ জাহাজ ডুবিল, কোন্ সেনাপতি মরিলেন, কে বিজয়ী হইলেন, কোথা কোন্ ছোট যুদ্ধ হইল এইরূপ দিনে দিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ক্রমে ক্রমে, যাহা-হৌক, রুষ অনেক গুলি জাহাজ নষ্ট করিলেন এবং তাঁহার নৌসেনাপতি, মেকারফ্ প্রধান জাহাজ ও ৭ শত সৈন্য সহ জলমগ্ন হইলেন ও নৌযুদ্ধে জাপান সম্পূর্ণরূপে জয় লাভ করিলেন ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। এরূপ কেন হইল ? পুনরায় বলি, দুর্ব্বলের বল সেই হরিকে ডাকিয়াছিল। প্রাণের ভিতর হইতে বিপদকালে সেই মধুসূদনকে ডাকিয়াছিল বলিয়াই জাপানের এই জয়লাভ, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। দুর্গতি হারিণী দুর্গার পদ-ছায়া না পাইলে কি কখনও এমন অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, বামনাকৃতি ভেতো জাপানী রণদুর্ম্মদ ভীম আমমাংসভোজী কসাক সৈন্যকে সমরে চূর্ণ বিচূর্ণ বিধ্বস্ত করিতে পারে ?

তবে কি হইয়াছে শ্রবণ করুন। জলযুদ্ধের পর স্থলযুদ্ধ জলযুদ্ধের শেষ ফল যাহা প্রথম প্রধান স্থলযুদ্ধের ও সেই ফল হইয়াছে। আর ভূমণ্ডলে জাপান যেরূপ কীর্ত্তি রাখিলে এরূপ কীর্ত্তি এপর্য্যন্ত কেহ রাখিতে পারেন নাই। য়ালু নদী পার হইয়া জাপান বাহিনী চলিয়াছে রুষকে আক্রমণ করিতে। রুষ কোথা ? য়ালু নদীর তীরবর্ত্তী পর্ব্বত সমূহের উচ্চ আল ভূমিতে রুষ বাহিনী সুদৃঢ়রূপে সজ্জিত ও রক্ষিত। একজন পর্ব্বতের উপর দৃঢ় সংস্থিত আর একজন নিম্নে প্রায় আকণ্ঠ জলমগ্ন য়ালু নদীর জলে দাঁড়াইয়া। উপর হইতে গোলা গুলি ক্রমাগত বর্ষণ হইতেছে পঙ্গপালের ন্যায় জাপানী সমরে পড়িতেছে, বাদলের দিনে বাদল পোকা যেরূপ মরে সেইরূপ মরিল তবুও ভ্রুক্ষেপ নাই। এমন অসম সমর কেহ কখনও করে নাই দেখে নাই। পৃথিবীর কোন জাতির এমন সমর মনে পড়ে না। ইহা আমাদের কথা নহে রণকৌশলী পৃথিবীর বর্ত্তমান কালের শীর্ষস্থানীয় জাতিরাই এই কথা ঘোষণা করিতেছেন। যাহাহৌক এইরূপ অসম্ভব সমর করিতে করিতেই জাপ-সেনা অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে তাহারা পর্ব্বতে আরোহণ করিল ক্রমে একস্থান হইতে রুষ বিতাড়িত হইল ক্রমে অন্য স্থান হইতে রুষ বিতাড়িত হইল। ক্রমে অপর স্থান হইতে রুষ বিতাড়িত হইল। ক্রমে ক্রমে রুষ সেনা উভরড়ে পলাইতে লাগিল রণে ভঙ্গ দিয়া যুদ্ধের উপকরণ ফেলিয়া দিয়া ২৮টা কামান ফেলিয়া দিয়া প্রাণ লইয়া রুষ পলাইল। প্রায় অর্দ্ধেক জাপানী সৈন্য দ্বিগুণ রুষ সেনাকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিল। ৪।৫ দিন ধরিয়া এই ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। সৈন্যদের আহার করিবারও অবসর ছিল না। রুষ নিজমুখে আপনার পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন জাপানীর গোলন্দাজ সৈন্য সাক্ষাৎ যমের অবতার এরূপ অগ্নিবৃষ্টি কেহ কখনও দেখেন নাই কাহার সাধ্য সেই অগ্নিবৃষ্টিতে স্থির হইয়া থাকে। সভ্য জগৎ চকিত ও স্তম্ভিত হইয়াছেন।

ইহার পরেই কতকগুলি ছোট ছোট যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করিয়াছেন রুষ সেনাপতি করুকাটকিন একরূপ জাপানী সৈন্য দ্বারা বন্দী হইয়া রহিয়াছেন। তিন দল সেনা তিন দিক হইতে তাহারে ঘেরিয়া রাখিয়াছে এদিকে পোর্ট আর্থার বন্দরও অবরুদ্ধ হইয়াছে। জাপানী সৈন্য ঊর্ণনাভের ন্যায় চারিদিকে সৈন্য জাল বিস্তার করিয়া পোর্ট আর্থার বন্দর অবরোধ করিয়াছেন। রেলওয়ে জাপানের দখলে আসিয়াছে। ও দিকে সমুদ্র পথও বন্দ। জাহাজ ডুবাইয়া ডুবাইয়া সমুদ্র পথ জাপানী বন্দ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে এই স্থলে একটি কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইতেছে। নৌ-সেনাপতি টোঙ্গো বলেন যে "আমরা পুরাতন জাহাজ ডুবাইয়া পোর্ট আর্থার হইতে রুষের বাহির হইবার পথ বন্দ করিব, যাহাতে কোন জাহাজ আর বাহির সমূদ্রে আসিতে না পারে এমন করিব কিন্তু জাহাজ ডুবাইতে গেলে মৃত্যু নিশ্চয়—হয় জাহাজের সঙ্গে ডুবিয়া মরিতে হইবে নহিলে রুষের গোলায় মরিতে হইবে। স্বদেশ প্রেমী এমন কে আছ যে এই কার্য্যে ব্রতী হইবে—আইস। জানিও প্রাণ দিতে হইবে। নিশ্চয় মৃত্যু। আমার তিন শত লোক চাই। যে যাইতে ইচ্ছুক সে যেন আমাকে আবেদন করে।" টোঙ্গোর এই আবেদন শুনিয়া ২০০০ লোক মরিবার জন্য আবেদন করিয়া-ছিল। তাহারা নিজের রক্ত বাহির করিয়া সেই রক্তের মসী করিয়া দরখাস্ত লিখিয়াছিল। বুঝুন ব্যাপারটা কি হইতেছে। স্বদেশ প্রেমে জাপান কিরূপ তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। শরীরের অবসন্নতার জন্য বা অঙ্গের বিকলতায়

যাহারা যুদ্ধে যাইতে পায় নাই তাহারা মনোদুঃখে আত্মহত্যা করিতেছে। স্বামীবৎসলা স্ত্রী আপন রুষ স্বামীকে বিশ্বাস ঘাতক বলিয়া ধরাইয়া দিয়া চির বৈধব্য আনন্দে আলিঙ্গন করিতেছে। মাথার চুল কাটিয়া দিয়া সেই চুল বিক্রয় করিয়া তাহাতে উপার্জ্জিত অর্থ জাপ-রমণীরা রণ ভাণ্ডারে দিতেছে। বাটির চাকর তাড়াইয়া দিয়া দাসী তাড়াইয়া উদ্বৃত্ত অর্থ রণ-ভাণ্ডারে দিয়া ভদ্র মহিলারা চাকর চাকরাণীর কার্য্য করিতেছে। দেশ একেবারে জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিজয় লাভে জাপান উন্মত্ত হয় নাই ধীর স্থির ঠিক আছে। কথায় কথায় অন্য কথা আসিয়া পড়িয়াছে। যাহাহৌক এদিকে পোর্ট আর্থার অবরুদ্ধ। আর ওদিকে ভালাডিভষ্টক বন্দরও অবরুদ্ধ এখন এই ভাবেই নব আছে। করুপাটকিন বলিতেছেন মে মাসের শেষে আমি জাপানকে একেবারে ধ্বংস পুরীতে পাঠাইব।

য়ালু নদীর লক্ষে, নদী সৈকতে তীরে ও তীরস্থিত শৈলমালার উপর যে অদ্ভুত বীরত্ব জাপান জগৎকে প্রদর্শন করিলেন, তাহা যতকাল মানবের ইতিহাস থাকিবে ততদিন প্রস্তর গাত্রে শোদিত হইয়া থাকিবে। যে রণ-ক্ষেত্রে এই জাপান বিজয় কাহিনী বক্ষে ধারণ করিয়া ভূমণ্ডলকে চিরকাল প্রদর্শন করিবে তাহার নাম কিউলেন চেঙ্গ।

এই যুদ্ধের পর, জাপানের বন্ধুগণের জাপানের স্থলযুদ্ধের কৃতিত্ব সম্বন্ধে যে চিত্তবিক্ষেপ ছিল তাহা একেবারে তিরোহিত হইল। তাহারা বুঝিল জাপান আজ জন্মভূমির প্রেমের ইন্দ্রজালে মোহিত, তাহারা সেই মোহিত অবস্থায় সেই স্বর্গীয় প্রেমের হিপনটিক নিদ্রাবস্থায়, না করিতে পারে এমন কার্য্যই নাই। কিন্তু জাপানের শত্রু তথা ইংলণ্ডের শত্রুরা শিরশ্চালনে ধীর গম্ভীরে বলিল "য়ালু তীরে রুষ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল না—তবে এত কিসের বড়াই।" যাহাহৌক জাপান মস্তিষ্ক গরম করিল না—এমন কি বিজয় বার্ত্তা ঘোষণাও করিল না যখন শত্রু মুখে কথা রাষ্ট্র হইল তখন বলিল হাঁ জিতি-য়াছি বটে। এই সুযোগে জাপান, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রচুর অর্থ কর্জ্জ করিল। চাহিল পাঁচগুণ, লোকে বলিল দশগুণ লও এতই লোকের বিশ্বাস। এই য়ালু—ঝটিকার পর আবার শান্তিভাব আসিল। উভয় দল বিশ্রাম করিতে লাগিল ও আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ছোট ছোট

খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল বটে কিন্তু তহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। তবে জাপানের এক খানা বড় রণতরী রুষের জাহাজ মারা কলে পড়িয়া মারা যায়—তাহার নাম "হাট্‌র্স" ৯০০ শত লোক জলমগ্ন হয়। জাপানের কেহ কেহ বলেন এইটা বিষম ভুল হইয়াছিল। ওরূপ রণতরী ওখানে পাঠাইতে নাই। যাহাহৌক আমারা আদ্রকের ব্যাপারী অর্ণব যানের সংবাদে আমাদের প্রয়োজন কি? আমরা উহার ভাল মন্দ কি বুঝির, কেন জাপান ওরূপ করিয়াছিল? জাপানের আরও কয়েক খানি তরী ডুবিয়া যায়। দারুণ কুজ্‌ঝটিকায় পথ দেখিতে না পাইয়া দুইখানা জাপানী জাহাজ মেড়ার লড়াই করিয়া মরিয়াছে তাহাতেও প্রাণী ক্ষয় হইয়াছ। এই সব দেখিয়া লোকে বলিতে লাগিল এ যে দেখিতেছি ভগবানের মার, সমুদ্র পার হইয়া গোষ্পদে জলমগ্ন, বুঝি বা জাপানের অহঙ্কার হইয়াছিল দর্পহারী মধুসূদন তাই সুসময়ে জাপানের দর্পচুর্ণ করিয়া দিয়া তাহার চৈতন্য করিয়া দিলেন। ভগবানের কার্য্যে মন্দ হইতেই মঙ্গল হয়। কে বুঝিবে তাঁহার মন্ত্রণা?

ওদিকে য়ুরোপখণ্ডে তুমুল ব্যাপার পড়িয়া গেল। রুষের বন্ধুগণ রুষের গুণগান ও জাপানের নিন্দা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন আর ভয় নাই এই বলটিক রণপোতাবলী আর এই কৃষ্ণসাগরের রণপোতাবলী আবার প্রশান্ত সাগর বক্ষে চলিয়াছে, ভয় নাই। একটু পরে মজা দেখিবে আবার। দেখি-তেছ না হামবার্গ লাইনের নিকট, ইংলণ্ডে, দক্ষিণ আমেরিকায়, রুষ কত জাহাজ খরিদ করিয়াছেন ও করিতেছেন? এই সকল জাহাজ অতি শীঘ্রই জাপান সমুদ্রে যাইবে তখন আবার নূতন করিয়া নৌসমর আরম্ভ হইবে। তখন জাপানের ভূমণ্ডলে অস্তিত্বও থাকিবে না যেখানে জাপান ছিল সেইখান দিয়া উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা রঙ্গে ভঙ্গে ক্রীড়া করিবে। আবার দেখিতেছ না স্থলের সেনারা কত উৎসাহে সম্মুখ সমরে চলিয়াছে?

রুষের শত্রুগণ বা জাপানের বন্ধুগণ বলিলেন "জানি জানি সব জানি কথার কন্দলে কাজ কি? কার্য্যে দেখিয়া লও। বলিতেছ বলটিক পোতা-বলী যাইবে—তাহা হইবে না; ডেনমার্ক, সুইডেন প্রভৃতি তাহাদের হকৃ-শোভা জলস্থান দিয়া রণপোত যাইতে দিবে না ঘোষণা করিয়াছে। আর যাইবার পথ নাই। জান না কি রুষজার বলটিক পোত লইয়া যাইবার বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন। বলিতেছ কৃষ্ণসাগরের রণপোত যাইবে? তাহাও

হইবার নয়। রুষজার তুরস্কের সুলতানকে, ডার্ডনেলিস্ প্রণালী দিয়া কৃষ্ণসাগর হইতে পোত লইয়া যাইবার অনুমতি ভিক্ষা করিয়া, চির শত্রুকে পত্র লিখিয়াছিলেন অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে তিনি একরূপ জীবন্মৃত, স্বীয় সহধর্ম্মিনী ব্যতীত কাহাকেও বিশ্বাস করেন না। ভয় পাছে বিষ দিয়া প্রাণে মারে, পাছে খুন করে। তিনি ইচ্ছা করিয়া যুদ্ধ করেন নাই জাপ অন্যায় সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনলক্ষ সৈন্য পাইলে তিনি তাহাদিগকে, গৃহরক্ষার জন্য রাখিয়া অপর সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে পারেন। তুরস্কদত্ত সৈন্য তিনি কখনও সমরে নিয়োজিত করিবেন না। জাপ ইংলণ্ড আমেরিকা তাঁহার পরম শত্রু তিন জনে মিলিয়া তাঁহাকে কষ্ট দিতেছে। ইহার শোধ তিনি লইবেন ভারত আক্রমণ করিবেন আর তুরস্ক সুলতানের সাহায্য পাইলে সে কৃতজ্ঞতা কখনও ভুলিবেন না আর জাপ নাম ভূমণ্ডল হইতে লোপ করাইবেন। এত করিয়া পত্র লিখিলেন তবুও তুরস্ক সুলতানের পাষাণ-প্রাণ গলিল না শরণাগতকেও তিনি রক্ষা করিলেন না। বলিলেন সন্ধিসর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া তিনি ডার্ডনেলিস্ প্রণালী দিয়া পোত লইয়া যাইবার অনুমতি দিতে পারেন না। সৈন্য দিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই। তবে তিনি জারের মঙ্গল কামনা করিতেছেন এবং সেই জন্য প্রবল ইংরাজ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বা ভারত আক্রমণ করিতে নিষেধ করিতেছেন। কৃষ্ণসাগরের রণতরীর সুতরাং আর যাওয়া হইল না। সাজা গোজাই সার হইল। এই ত দুইটি পোত বলের যাওয়া বন্দ হইল। তবে আর নৌযুদ্ধ হইবে কি করিয়া? আর ভালাডিভস্টক পোত? সেত্ত জাপ জাহাজ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া আছে।

বলিতেছ সখের সৈনিক চলিয়াছে—ভ্রম, তাহাতে কি হইবে? যেখানে লক্ষ লক্ষ পেসাদার সৈন্য উড়িয়া যাইতেছে—সেখানে দেড় শত বা দুই শত কি না হয় দুই হাজার সখের প্রাণে আর কি হইবে? রুষের আভ্যন্তরিণ অবস্থা বড় ভয়ঙ্কর, প্রজারা অসন্তুষ্ট, দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, পোলাণ্ড ফিণলাণ্ড বিদ্রোহী হইবার লক্ষণ প্রদর্শন করিতেছে, ওয়ারস, ক্রণষ্টাড সহরে রাজায় প্রজায় দাঙ্গা হইতেছে ইত্যাদি। সখের সৈনিক কি আর মিলিবে? সত্য সত্যই রুষের বড় বিপদ।

ওদিকে কথা কাটাকাটি চলিতেছে এদিকে আবার জাপান বটিকা

টিপিল। রুষও টিপিল ক্রমে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। ২৬শে মে হইতে পাঁচ দিন ঘোরতর সমর হইয়াছে—ষোল ঘণ্টাকাল ক্রমাগত অগ্নিবৃষ্টি সহ্য করিয়াও জাপ সৈন্য বিজয় লক্ষ্মীকে অঙ্কশায়িনী করাইয়াছেন। রুষ অনেক যোগাড় করিয়াছিল। বড় বড় গর্ত্ত কাটিয়া উপরে সামান্য কাটির ছাউনী করিয়া ঘাস চাপা দিয়া রাখিয়াছিল—তাহাতে আবার মানুষ মারা কল সব ছিল, যেমন সমতল ভূমি জ্ঞানে পা দিবে আর অমনি পড়িয়া যাইবে, আর সেই ভারে মানুষ মারা কলগুলি ফুটিয়া উঠিবে আর জাপ সৈন্য খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে। প্রাচীর করিয়া গর্ত্তে গর্ত্তে বহু বন্দুক মুখ একত্রে রাখা হইয়াছিল—অজস্র গুলিবৃষ্টি হইবে বলিয়া। বিষাক্ত তারের মানুষ সমান উচু বেড়া দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে বড় বড় তারের কাঁটা, যেমন ছুটিয়া আসিবে আর অমনি গাত্রে ফুটিয়া মরিবে। এই গেল সমতল ভূমে। উপরে উচ্চে পাহাড়ের গায়ে, শৃঙ্গে শৃঙ্গে বড় বড় কামান সাজান, বড় কামান মাঝারি কামান, কলের কামান. (মেসিন গণ্) তার উপর ব্যূহ তার উপর প্রবল পরাক্রান্ত কসাক বাহিনী—যাহারা সাক্ষাৎ যমের অবতার আকারে জাপের দ্বিগুণ, ত্রিগুণ চতুগুণ। ব্যূহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কামান আবার সমুদ্র হইতে রণতরী আক্রমণকারী জাপ সেনার উপর গোলা বর্ষণ করিবে তাহার ব্যবস্থা। রুষ নিশ্চিন্ত এবার আর কিছু করিতে হইবে না। সৈন্য সে ত অসংখ্য এবার কি করে জাপ একবার দেখিব। জাপান সেনাপতি অকু সৈন্য লইয়া শত্রুর সম্মুখীন। রুষ বার বার চেষ্টা করিতেছে লোভ দেখাইতেছে তবুও জাপ নড়ে না। জাপ সেনাপতি সত্যসত্যই চিন্তিত। য়ালু নদী অপেক্ষা এখানে ভয়ঙ্কর ব্যাপার সমতল ভূমি দিয়া অনেকক্ষণ গমন করিয়া তবে পর্ব্বতের উপর উঠিতে হইবে ও পরে আক্রমণ করিতে হইবে ও তারপর যুদ্ধে জিতিয়া রুষকে তাড়াইতে হইবে। ভাবনার কথা বটে। জাপ জানে না কত সৈন্য আসিয়াছে, জাপ জানে না কত কামান আসিয়াছে ও কত বড় বড় কামান আসিয়াছে। এ সব না জানিয়া কি করিয়া কি করা যায় সুতরাং ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া রহিলেন, আর দুর্ব্বলের বল বিপদের সেই মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন। শুধু জাপ তাঁহাকে ডাকে এমন নহে রুষও তাঁহাকে ডাকে—যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রাণ ভরিয়া ভগবানকে ডাকিয়া তবে রুষ যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়। কার ডাক পঁহুছায় তা তিনিই জানেন।

যাহাহৌক জাপ সেনাপতি এক বুদ্ধি করিলেন। রুষ সেনার অতি নিকট বেড়াইতে গেলেন। অমনি রুষ কামানগুলি গোলা বমন করিল। সেনাপতির দল অমনি কামানের গোলার অংশ গুলি কুড়াইয়া লইলেন, ওজন করিলেন আকৃতি দেখিলেন বিজ্ঞান সাহায্যে বুঝিয়া লইলেন কত বড় গোলা তাহাতে কি আছে কামান কত বড়। ওদিক হইতে বিশ্বাসী আগাড়ী অন্বেষণ কারী সৈন্যগণ আসিয়া বলিল রুষ শিবিরের কি রূপ অবস্থা। এদিকে নৌ-সেনাপতি টোঙ্গো আসিয়া রণতরী লইয়া সমুদ্রতীরে রহিলেন। যুদ্ধ করিলে সাহায্য করিবেন এই মতলব। যেমন সব ঠিকঠাক হইল আর "জয় কালী মায়ী কি জয়" এরূপ একটা কিছু বলিয়া জাপ সৈন্য অগ্নি সাগরে ঝাঁপ দিল। জাপ ব্যূহ হইল একটি সমকোণ—তুই ধারে তুইটি সৈন্য শ্রেণী, উভয় শ্রেণীতে একটি জ্যামিতির সমকোণ করিয়াছে জাপ সৈন্য যেমন অগ্রসর হইল অমনি তাহাদের মস্তকে গোলা গুলি বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সে এমন বৃষ্টি যে আক্রমণ-কারী সৈন্য দলের একটী প্রাণীও বাঁচিল না। যেমন অগ্রসর অমনি পপাত চ মমার চ। আবার একদল আসিল, জাপ শবদেহের উপর দিয়া চলিল আর ক্ষণকাল মধ্যে তাহারাও শব হইয়া ধরণী বক্ষ আলিঙ্গন করিল। এই রূপ বার বার হইতে লাগিল। তখন কপালের ঘর্ম্ম মুছিয়া সেনাপতি এক-বার সমুদ্র দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন যে টোঙ্গো রুষ সৈনের উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, আর রুষের রণতরী পলাইতেছে, এই ত সময়। এমন সময় ভগবান দেখাইয়া দিলেন সম্মুখে একটা মানুষ মারা কলের তাড়িৎ তার। একবার স্পর্শ করিলে সমস্ত সৈন্যকে যমালয়ে যাইতে হইবে। ধীর মস্তিষ্ক সেনাপতি সেই তার কাটিয়া দিলেন। তারস্বরে বলি-লেন সকলে একেবারে এক সঙ্গে মরিতে আইস। আসিল জাপ, আসিল মরিতেই, আসিল বটে, কিন্তু মরিয়াও মরিল না। হু হু শব্দে পীপীলিকার মত জাপ সৈন্য পর্ব্বত গাত্রে উঠিতে লাগিল, গেল গেল ধর ধর। আর ধর? সিংহ বিক্রমে জাপ পড়িয়াছে, নীচে হইতে উঠিয়াছে সমতল ভূমির ফাঁদ এড়াইয়া বেড়া ছিঁড়িয়া মানুষ মারা কলকে পাশে রাখিয়া তুর্দ্দম জাপ সেনা পর্ব্বত গাত্রে উঠিল। রুষ যায় যায় যায় না ফিরিয়া দংশন করে। পাঁচ দিন ঘোরতর সমরের পর জাপ সৈন্য বিজয় লাভ করিল। রুষ সৈন্য রণেভঙ্গ দিয়া পলাইল রুষ রণতরী আবার ফিরিয়াছিল আবার পলাইল। রুষের

৬৮টা বড় কামান, ১০টা মেসিন কলের কামান আর বারুদ গুলি গোলা প্রভৃতি পর্ব্বতাকার যুদ্ধের সরঞ্জাম জাপানের হস্তগত হইয়াছে। রুষ যেমন হারিয়াছেন এমন হার কেহ কখনও হারে না। জাপান যেমন জিতিয়াছেন এমন জিত কেহ কখনও ভূমণ্ডলে দেখে নাই। এই রূপে নানশানের যুদ্ধে জাপানের জয় হইল। ভূমণ্ডলে সভ্য জগতে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। বামন অবতার করে কি? জাপানের ৩৫০০ জন মরিল রুষের স্বীকার মতে ৫০০ জন রণভূমে শায়িত হইল তবুও জাপানের জিত!

পরে সংবাদ আসিয়াছে—জাপান তুই সহস্র রুষ অশ্বারোহী সৈন্যকে পরাভূত করিয়াছেন। জেনারেল অকু হেলিয়াং চেঙ্গ স্থানে এই যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন। তিনি তারপর আবার আর একদল রুষ অশ্বসাদী সৈন্যকে রণে পরাভূত করিয়া লিউস্থতন দখল করিয়াছেন ও শত্রুর চারিটা কামান কাড়িয়া লইয়াছেন। লিউস্থতনের নামান্তর টেলিয়ানওয়ান। তবেই এই যুদ্ধের ফল কি পাঠক বুঝিবেন। ডালনী বন্দরও জাপান দখল করিয়াছেন আর ডালনীর সেনা সকল আর্থার বন্দরে প্রবেশ করিয়াছে। এইরূপে জাপান রুষকে বিধ্বস্ত করিয়া বিজয় বৈজয়ন্তী পতপত শব্দে উডীয়-মান করিতেছেন। জগদম্বা মা কিন্তু শেষ বেশ, দেখিও, একবার অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিও। মা জাপানকে ভক্তি দাও।

যুদ্ধ যতদূর হইয়াছে ততদূরই সংবাদ দিলাম। পাঠক মহাশয় অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন জাপানের এই বিজয় লাভে শ্বেতাঙ্গ জাতিরা সুখী নহেন। পীতভীতি তাঁহাদের শতগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। তার পর আসিয়াবাসীর নিকট য়ুরোপ বাসী পরাজিত হইতেছে ইহাও তাহাদের অসহ্য। জাপানের প্রতি অনেকেই মনে মনে বিরূপ তবে মুখে মায়ার হাসি হাসিতেছেন। জাপানের মন্দ হইলে মনে একটু তুঃখ নিশ্চয়ই হইবে—সে তুঃখ স্বাভাবিক একজন উন্নতির প্রথম মুখে ধ্বংস হইতেছে দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তি কাহার না তুঃখ হয়? ইহা ব্যতীত জাপানের সহিত আমাদের আর কি সংশ্রব আছে? হাঁ একটু আছে—সে আমাদের রাজার বন্ধু। যাহাহৌক নিজ অপেক্ষা ত আর সাধারণ লোকের পক্ষে কেহই ত প্রিয়তর নহে। আমরা আপনার তুঃখেই ডুবিয়া রহিয়াছি পরের তুঃখ ভাবিয়া আর কি করিব।

সে যাহাহৌক আমরা জাপানের ভাল মন্দ বা ভবিষ্যৎ ফলাফল নির্দ্দেশ

করিবার জন্য অদ্য লেখনী ধারণ করি নাই আমরা যুদ্ধ বিগ্রহ দেখিয়া কাতর হইয়াছি তাই লেখনী ধারণ করিয়াছি। তবে যুদ্ধের বিষয় এত করিয়া লিখিলেন কেন? কথাটা সম্পূর্ণ না বলিলে রসভঙ্গ হয় এই জন্য। এ সব কি? এই যে বসুন্ধরা নরশোণিতে পরিপ্লাবিত হইতেছে ইহা কাহার কার্য্য? অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিব কৃশ্চান জাতির কার্য্য, নিঃসন্দেহে বলিব সভ্য য়ুরোপবাসীর কার্য্য। আমাদের বিশ্বাস রুষ যদি শঠতা না করিতেন, সময়ে জাপান ও অপরাপর জাতির কথামত যদি মাঞ্চুরিয়া ত্যাগ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে এ সব রক্তপাত হইত না। এ সব রক্তারক্তি দেখিলে আমরা বড়ই কাতর হই। যদি বলেন তুচ্ছানুতুচ্ছ তুমি কোথা আর প্রবল প্রতাপ রুষজার বা তাহার মন্ত্রী কোথা, কেন অরণ্যে রোদন করিতেছ, তাহার উত্তর এই যে এরোগ সকল সাহিত্যসেবীর। ব্রেজিলের উপত্যকায় বসিয়াস ম্পাদক রুষজারকে উপদেশ দিতেছেন নিউ-ইয়র্ক লণ্ডন সহরে বড় বড় কাগজের বড় বড় সম্পাদক পরামর্শ বা উপদেশ দিতেছেন, আবার কলিকাতার বঙ্গবাসী এবং মফস্বলের সংবাদ পত্র গুলিও উপদেশ দিতেছেন। কেহ পড়ুক আর নাই পড়ুক পাঠকগণ ত পড়িবেন। আমাদের পাঠক লইয়াই কারবার রুষজার শুনুন আর নাই শুনুন তাহাতে কিছু আসে যায় না। তবে একথা স্বতঃসিদ্ধ যে আমাদের রাজা আমাদের এ সম্বন্ধে মতামত কি তাহা জানিয়া রাখিতেছেন।

বাইবেল কৃশ্চনের ধর্ম্মগ্রন্থ। য়ুরোপ আমেরিকায় অধিকাংশ সভ্য জাতির ধর্ম্ম হইতেছে কৃশ্চান ধর্ম্ম। সেই বাইবেলে লেখা আছে এমন এক দিন আসিবে যথন তরবারির লৌহে লাঙ্গলের ফাল প্রস্তুত হইবে আর বর্ষা ফলকে বেড়া ছাঁটা কাঁচি প্রস্তুত হইবে। বাস্তবিকই মনে মনে একটা আশা ছিল। যে ভূমণ্ডলে আর যুদ্ধ বিগ্রহ আর মনুষ্য রক্ত ছড়াছড়ি হইবে না, শকুনি গৃধিনী আর শবদেহ লইয়া টানাটানি আর করিবে না। এ আশা হইবার কারণ কি? কারণ রুষজারের শান্তিবাদ। রুষজার সমস্ত সভ্য জাতিকে আহ্বান করিরা বলেন, আইস এই ঘোষণা পত্র দ্বারা আমরা জগতে ঘোষণা করি যে ভূমণ্ডলে আর যুদ্ধ বিগ্রহ হইবে না। যদি বিষয় লইয়া কোন দুইটি জাতির মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে তবে আমরা সালিষীতে সেই বিষয় বিচার করিয়া লইব, যুদ্ধ করিব না। রুষজারের এই কথায় জগতে ধন্য ধন্য

পড়িয়া গেল। সকল সভ্য জাতি বা অধিকাংশ সভ্য জাতি রুষজারের এই ঘোষণা পত্র সাদরে গ্রহণ করিলেন ও জাতি সমিতিতে যোগ দান করিলেন। হেগ সহরে সেই সালিষী আদালত স্থাপিত হইল। এ জাতির চীফ্ জষ্টিস্ বা সর্ব্বপ্রধান জজ, ও জাতির সর্ব্বপ্রধান লোক, সে জাতির সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী এই রূপ অতি সম্ভ্রান্ত অতি মহৎ বড় বড় লোক বাছিয়া শান্তি-সালিষী আদালত বা সমিতি গঠিত হইল। ক্রমে দেখিলাম এই সালিষী অনেক গুলি বিচারও করিলেন। এমন একদিন হইয়াছিল যে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যুদ্ধ বাধে বাধে কিন্তু সুবুদ্ধি একজন মন্ত্রী বলেন এই ব্যাপারের অর্থাৎ বেয়ারিং প্রণালীতে কোন্ জাতি (ইংলণ্ড বা আমেরিকা) শীল মৎস্য ধরিবেন—সালিষী বিচার হৌক। তাহাই হইয়াছিল। ইংলণ্ড ও ফরাসিতেও এইরূপ যুদ্ধ সম্ভাবনা হইয়াছিল। তাহাও সালিষী সাহায্যে দমিত হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম রুষজারের মঙ্গল হৌক তাঁরই চেষ্টায় আজ ধরাধামে বর্ষা ফলকে সত্যসত্যই বেড়া ছাঁটা কাঁচি ও তরবারির লৌহে লাঙ্গলের ফাল হইতে চলিল; তাঁহারই অদম্য পরিশ্রমে আজ ধরাধামে বাইবেল বাক্য ফলিতে চলিল।

কিন্তু হায় মানবের আশা, মানবের ভরষা সকলই অনিশ্চিতের উপর স্থাপিত। ঐ নীল সুনীল আকাশ হইতে সহসা নিদারুণ বজ্রপাত হইবে ইহা কি কেহ মনের কোণেও ধারণা করিতে পারে। মেঘ নাই রৌদ্রে কাষ্ঠ বিদীর্ণ হইতেছে এমন সময় ঝমাঝম বৃষ্টি হইবে এ কে কল্পনায় আনিতে পারে? কিন্তু গূঢ় গুপ্ত দুর্ভেদ্য য়ুরোপীয় রাজনীতি আকাশে এ সকলই সম্ভব। যে মহর্ষি নৈমিষারণ্যে উপবেশন করত কেবল ভগবানের কথায় প্রাণ ভিজাইতেছিলেন ও দর বিগলিত ধারায় প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন তিনি একদিন অতি সত্বর, নিশীথিনীর তমিস্রাময়ী রজনীতে নহে মার্ত্তণ্ডময় খময় দিবা দ্বিপ্রহরে তস্করের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রুষজার, শান্তির কথা, হেগ সহরের শান্তি সমিতির কথা, শান্তি সালিষীর কথা সমস্ত ভুলিয়া, লজ্জা ভয় ঘৃণা বিসর্জ্জন দিয়া, চুপে চুপে তস্করের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, চীনের মাটী চুরি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তবেই দেখত মানুষের সভ্যতা মিথ্যা, মানুষের মনুষ্যত্ব য়ুরোপ খণ্ডে নাই, সেখানে দেখিতেছি মিথ্যা কথার নাম ডিপ্লোমেসি। রুষজারের এই তস্করের কার্য্য অপর সভ্য য়ুরোপীয় জাতিরা কেন সহ্য করিলেন বলিতে পারেন? তাঁহারা যদি সকলে

সমবেত হইয়া রুষজারের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতেন তাহা হইলে রুষজারকে মাথা নোয়াইতে হইত। তাঁহারা যদি সকলে বলিতেন যে কথা না শুনিলে আমরা যুদ্ধ করিয়া তোমার রাজত্ব কাড়িয়া লইব ও তোমার প্রাণদণ্ড করিব তাহা হইলে রুষজার কি কখনও এতটা করিতে সাহস পাইতেন? কিন্তু কেহ কিছু বলিল না, কেহ কিছু করিল না, কেহ একবার অপাঙ্গে চাহিয়াও দেখিল না রুষ আপনার ইচ্ছামত কার্য্য করিব পূর্ব্ব হইতেই মনস্থ করিয়াছিলেন এখন আবার য়ুরোপীয় জাতিগণের শৈথিল্য দেখিয়া দ্বিগুণ উৎসাহিত হইলেন, শতের উপর সহস্র মিথ্যা কথা বলিয়া আপনার মনোভীষ্ট সফল করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন—বলিবার কেহই নাই, কিছু করিবার কেহ নাই, ভয় কি? জাপান বলিবে? তুচ্ছ বামন পীতকায়, তাহাকে আবার কে গ্রাহ্য করিবে?

কেন য়ুরোপীয় জাতিরা রুষজারকে তস্করের কার্য্য করিতে দেখিয়াও কিছু বলিলেন না? আমাদের মনে হয় ইহার প্রকৃত মর্ম্ম আর কিছুই নহে কেবল এই মাত্র যে আমি যখন আবার এইরূপ তস্করের কার্য্য করিব তখন অপরে আমার মত চুপ করিয়া থাকিবে—কিছু বলিবে না। ইহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

বাল্যকালে কেতাবে পড়িয়াছিলাম আলেকজাণ্ডার ও দস্যুর গল্প। পাঠক মহাশয়ও বোধ হয় জানেন। দস্যুকে আলেকজাণ্ডার বলিলেন থ্রেসীয় দস্যু তুমিই কি সেই—যাহার অনেক দুষ্কৃতের কার্য্য আমি ভুয়োভুয় শ্রবণ করিয়াছি? দস্যু বলিল হাঁ আমিই সেই। তখন আলেকজাণ্ডার বলিলেন যে জান আমি রাজা ও তুমি দস্যু তোমাকে আমি দণ্ড দিতে পারি। দস্যু হাসিয়া বলিয়াছিল যে দস্যুতে ও রাজাতে, আলেকজণ্ডারে ও দস্যুতে কোন ভেদ নাই। দস্যু একটা লোটা চুরি করে, রাজা রাজ্য চুরি করেন, দস্যু একটা প্রাণীকে মারে রাজা সেই চুরির কার্য্য জন্য শত সহস্র ব্যক্তির প্রাণ হানি করেন, দস্যু একলা গিয়া লড়াই করে মারামারি করে, রাজা সহস্র লোক লইয়া গিয়া কাটাকাটি করেন, তাহার নাম যুদ্ধ। সেই দস্যুর কথা শুনিয়া বুদ্ধিমান সদ্বিবেচক সম্রাট আলেকজণ্ডার প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন যে দস্যুর কথা ঠিক সত্য দস্যুতে ও রাজাতে কোন প্রভেদ নাই। কবে দস্যু আলেকজণ্ডারকে কথা বলিয়া গিয়াছেন, তারপর কত শত সহস্র বৎসর

গত হইয়াছে কিন্তু ভূমণ্ডলের কিছু মাত্র উন্নতি হয় নাই। তখনও যাহা ছিল এখনও তাহা আছে। তখনও নরকের দ্বার স্বরূপ সেই লোভ। এখনও নরকের দ্বার স্বরূপ সেই লোভ। তখনও চুরি এখনও চুরি। তখনও ছলনার পর যুদ্ধ এখন তাই। সভ্যতাকে সমুদ্রের অতল জলে ডুবাইয়া দাও আর কাজ নাই, যথেষ্ট হইয়াছে তোমাদের যাহা ইচ্ছা তাহা কর। তোমরা ভূমণ্ডলে মুখ তুলিয়া আর কোন কথা কহিও না। হে য়ুরোপীয় জাতিগণ তোমরা এখন পশু বলে বলী তোমরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিবে, না বলিবার কাহারও অধিকার নাই, বলিলে অস্থিচূর্ণ করিয়া দিবে।

তবে মনের দুঃখে যাই কোথা করি কি? এ যে অসহ্য। ভ্রান্ত মানব তুমি কতটুকু তোমার আবার অহঙ্কার, তোমার আবার সহ্য অসহ্য। তুমি কি বুঝিবে ইহা কাহার চক্র? সেই মহামায়া আদ্যাশক্তির এই জগৎ লীলাক্ষেত্র। সেই মহামায়া এক দিন ইচ্ছা করিয়া নিজ সন্তান সুপ্ত শিশুর মস্তক কাটিয়াছিলেন, এক দিন ছিন্নমস্তা রূপে নিজের মস্তক নিজে কাটিয়া নিজের রুধির নিজে পান করিয়াছিলেন। সেই লীলাময়ীর লীলাক্ষেত্রে ভূমণ্ডল আজ যে লীলা দেখিতেছ তাহা সেই বিশ্বজননীর অপাঙ্গ প্রনোদিত। যিনি জগৎ জননী জগদম্বা হইয়াও আজ নিজ সন্তানগণের মৃত্যু সংঘটন করাইতেছেন। ইহা বুঝিবার চেষ্টা করা আর বাতুলতা একই। ভগবানের কার্য্য যদি তুমি বুঝিবে তাহা হইলে ত ভগবান সীমাবিশিষ্ট জীব হইলেন সুধী ব্যক্তি বলিয়াছেন যে (A God understood is no God)। তাই বলি বৃথা মাথা না ঘামাইয়া শীতল হইয়া বসিয়া বসিয়া জগদম্বার লীলারহস্য দেখ। আর আসল কার্য্য ত্যাগ করিও না, মা বলিয়া ভক্তিভরে দিবানিশি ডাকিতে ভুলিও না। যদি এইরূপে ডাকিতে পার তাহা হইলে য়ুরোপীয় জাতিগণের কার্য্য দেখিয়া আর তোমার দুঃখ হইবে না জাপান হারিলেও আর তোমার দুঃখ হইবে না। আসুন প্রাণ ভরিয়া একবার মাকে ডাকি রামপ্রসাদ দিবানিশি ডাকিতেন—

ঝিঁঝিট। একতালা।

দিবানিশি ভাবরে মন অন্তরে করালবদনা
নীলকাদম্বিনী রূপ মায়ের, এলোকেশী দিক্ বসনা॥
মূলাধারে সহস্রারে, বিহরে সে মন জাননা

সদা পদ্মবনে হংসীরূপে, আনন্দরসে মগনা
আনন্দে আনন্দময়ী হৃদয়ে কর স্থাপনা
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন, ব্রহ্মময়ী রূপ দেখনা
প্রসাদ বলে ভক্তের আশা, পুরাইতে অধিক বাসনা
সাকারে সাযুজ্য হবে, নির্ব্বাণে কি ফল বলনা॥

জাগো।

বিদ্বেষ বাসনা ভুলে প্রাণের কবাট খুলে
এস সখা! স্মিত মুখে—নয়নরঞ্জন,
দৃঢ় বদ্ধ আলিঙ্গনে মরমে সরমে ক্ষণে
টুটে যাবে চিরদ্বন্দ্ব আপন আপন ;
চারিধারে ফিরে ঘুরে নিভৃত হৃদয়-পুরে
উল্লাসে নাচিবে ধীরে সুখ সম্মিলন,
করিব না হাহাকার, নেমে যাবে গুরুভার,
উৎসাহ-মিলনে হবে সঙ্কল্প-সাধন।
দেখি'ছনা অশ্রুজলে— কত বর্ষ গেছে চ'লে,
সহিতেছ অবহেলে অশেষ লাঞ্ছনা,
তবু কি ঘুমাতে সাধ, ঘুচাবেনা অপবাদ?
সুধুকি নিয়তি ভাগী মোদের গঞ্জনা ?
বিষাদ মলিন ক্ষীণ লয়ে ও বাসনা দীন
সুধু কি কাটিবে দিন পর-স্তুতি-গানে ?
অবরুদ্ধ প্রীতি-স্নেহ, ফিরে কি চাবে না কেহ—
অনাহারে অর্দ্ধমৃত মুমূর্ষুর পানে ?
দীর্ঘকাল যাবে ব'য়ে বিলাস বাসনা লয়ে,
সুধুকি থাকিবে ব্যস্ত আপনার সুখে ?
এত দুঃখ নিরখিয়া পাষাণ মূরতি দিয়া
ঝরিবে না এক বিন্দু অশ্রু পর-দুঃখে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

হুগলী কথা।

রাধানাথ।

যাঁহারা সরকারী কাগজ পত্রের সন্ধান রাখেন তাঁহারা জানেন রাধানাথের নাম একদিন বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বনিতা ও রাজাকেও জানিতে হইত। রাধানাথের নাম লোকে আজিও জানিয়া থাকে বটে কিন্তু আমরা যে রাধানাথের কথা বলিতেছি সে এ রাধানাথ নহে, তবে সে রাধানাথের নাম হইলেই লোকে এ রাধানাথের মধুসূদন নামটী জপ করিত, ইচ্ছা না থাকিলেও জপ করিত। দেখা যাক্ এ হেন রাধানাথ কে ?

রাধানাথ জাতিতে চণ্ডাল, তবে অতি সুন্দর ও সুঠাম পুরুষ ; দেহ যষ্টি যেন চাবুক, তাহার উপর যৌবন সুলভ সৌন্দর্য্য ও চাঞ্চল্য ক্রীড়া করিতেছে। রাধানাথের বাড়ী মস্থুরে নপাড়া, থানা পাণ্ডুয়া চৌকী পাণ্ডুয়া জেলা হুগলি। রাধানাথ যৌবনে নানাজাতি অস্ত্র খেলা দখল করিয়াছিল ; লাঠি, সড়্কি, তরবারি,রায়বাঁশ,ঢেঁকি ঘুরাণ। এক নিশ্বাসে অতিতেজে অনেক পথ দৌড়িয়া যাইতেও পারিত। জলে দুই দিন ধরিয়া পড়িয়া থাকিতে পারিত। ডুব দিয়া অনেকক্ষণ জল মধ্যে থাকিতে পারিত, অনেকক্ষণ ধরিয়া সন্তরণ করিতে পারিত, রাধা সাঁতার দিয়া অনেকবার গঙ্গা পার হইয়াছিল। ফলত গ্রামের লোকে জানিত রাধানাথের অসাধ্য কোন কার্য্যই নাই। গরুর গাড়ীর চাকা পাঁকে পুঁতিয়া গিয়াছে রাধানাথকে ডাকিলেই হইল, দুরারোহ নারিকেল বৃক্ষে উঠিতে হইবে ডাক রাধানাথকে। অমুকের ভারি ব্যারাম হইয়াছে এক ক্রোশ গিয়া অমুককে সংবাদ দিয়া আসিতে হইবে, এ কার্য্য করিতে আর কেহই নাই—কেবল রাধানাথ। ইহার উপর রাধানাথ অনেক ঔষধ ও মন্ত্র তন্ত্র জানিত তোমার পা কাটিয়া গিয়াছে রাধানাথের কাছে যাও এখনই রক্তবন্ধ হইবে এখনি দুই ঘণ্টায় ক্ষত সারিয়া যাইবে। রাধানাথ যে ঔষধ দিল তাহার নাম ডাকাতে ঔষধ। ছেলেদের কোন পীড়া হইলে রাধানাথ আরাম করিবে, কাহারও উপর কোন রকম নজর হইলে সেও রাধানাথ আরাম করিবে। সাপে কামড়াইয়াছে যাও রাধানাথের কাছে সে ভিন্ন গ্রামবাসীদের আর কি গতি আছে ? রাধানাথ এই সকল ঔষধ ও মন্ত্রাদি তাহার মাতার নিকট শিক্ষা করিয়াছিল। লোকে তাহার মাতাকে

ডাকিনী বলিত—সে যে বড় গুণীন ছিল। উত্তর কালে সে বলিত যদি রাধানাথের একখানা হাড় পাই তবে আবার যেমন রাধানাথ তেমনি করিব। যাহাহৌক সে কথা পরে হইবে।

রাধানাথ প্রথমে নির্ব্বিরোধী বাঙ্গালী কৃষক ছিল সাতেও নাই পাঁচেও নাই। তবে সেই সময়ে প্রজার উপর কোম্পানির লোকের অত্যাচার মধ্যে মধ্যে হইত সে দেখিতে পাইত, তাহাতে তাহার ভারি রাগ হইত। কি দেওয়ানী কি ফৌজদারী যে কোন আদালতের লোকই হউক না রাধানাথ সকলের উপর অত্যন্ত চটা ছিল। তাহারা গ্রামে সরকারী কার্য্য করিতে গেলে রাধানাথ বাধা দিত। দুই একজনের বাড়ী ক্রোক করিতে আসিলে রাধানাথ মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। পেয়াদা নাজির নালিস করিয়াছিল কিন্তু সাক্ষী অভাবে কিছু হইল না। আবার ফৌজদারীর আসামী গ্রেপ্তার করিতে সরকারী লোক আসিল রাধানাথ মারিয়া তাড়াইয়া দিল। এই সমস্ত কারণে গ্রামের এবং পড়স গ্রামের লোকেরা রাধানাথের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইল। অনেক যুবক রাধানাথের নিকট খেলা শিখিত—তাহারা ওস্তাদ (গুরু) বলিয়া তাহাকে মানিত। রাধানাথের শিষ্য দলের মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ সন্তান ছিলেন। শিষ্যেরা ত তাহাকে গুরু বলিয়া মানিবে সম্মান করিবে কিন্তু এখন গ্রাম শুদ্ধ লোক আবাল বৃদ্ধ বনিতা রাধানাথকে মানিতে লাগিল। যাহার যাহা আবশ্যক সে রাধানাথকে গিয়া বলিতে পারিলে রাধানাথকে বলাও যা আর কার্য্য সম্পন্ন হওয়াও তা। সুতরাং গ্রামের লোক একেবারে তাহার বশতাপন্ন হইয়া পড়িল। কেনই বা না হইবে, বাড়ীতে ব্যারাম হইয়াছে রাধানাথকে খবর দাও সে আসিয়া সব করিবে রাত্রি জাগিবে ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

গ্রামের মাথা ছিলেন শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়। কেবল যে মস্থরেনপাড়া গ্রামের তিনি মাথা ছিলেন তাহা নহে পড়স গ্রামেরও মাথা ছিলেন। সকল লোকেই তাঁহাকে মান্য করিত, তিনিও প্রাণপণে সকলের উপকার করিতেন। কাহারও গাই বিয়ান হইলে সে মুখুয্যে মহাশয়কে আগে ঠাকুরদের পর দুধ দিবে। গাছের কলা কাঁদিটে উলিলে মুখুয্যে মহাশয় আগে ছড়া কত পাইবেন ইত্যাদি। এইরূপ সম্মান মুখুয্যে মহাশয়ের ছিল। কিন্তু এখন রাধানাথের পসারে সে সম্মান লোপ পাইতে চলিল। এখন কলা কাঁদিটা তেলি বউ রাধানাথকে দেয়—বলে মুখুয্যেকে দিলে আমার কি হইবে? রাধা যে চারি দিনের পর আমার বুধী গাইকে খুঁজিয়া আনিয়া দেয়—শুনেছি গোচোরে নিয়ে গিছল রাধা সন্ধান করে তাহাকে মেরে গাই কেড়ে আনে। প্রাণকৃষ্ণ চট্টোর গাই বিয়াইলে সে এবার দুধ রাধানাথকে দিয়াছিল, মুখুয্যে মহাশয়কে দেয় নাই। সে দিন বিশ্বাসদের চাঁড়াল গেঁড়ে পুকুরে মাছধরা হইয়াছিল। মাছধরার সময় শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেই সময় সেই খান দিয়া একতারপুরে খাজনা আদায় করিয়া বাটী ফিরিয়া আসেন; বিশ্বাসরা তাহা দেখিয়াছিল তবুও মুখুয্যে মহাশয়কে কোন মাছ না পাঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে রাধানাথকে মাছ পাঠাইয়া দিয়াছিল। সে দিন আর একটি ঘটনা হইয়াছিল। বড় একটি কালবশ উঠিলে বিশ্বাসদের নবাবু বলেন যে ওটা মুখুয্যে মহাশয়কে দেওয়া যাইবে। ইহার পরও সেই মাছ রাধানাথকে দেওয়া হইয়াছিল। যে ব্যক্তি মাছ লইয়া রাধানাথকে দিতে আসে সে ঐ কথা রাধাকে তাহাকে বাড়াইবার জন্য বলিয়াছিল। রাধানাথ যেমন শুনিল অমনি সেই মাছ লইল না বলিল ইহা মুখুয্যে মহাশয়কে দাও গে। মুখুয্যে যখন শুনিল রাধানাথ মাছ লয় নাই পাঠাইয়া দিয়াছে তখন তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। এতদিন যে রাধানাথ—হিংসা তাঁহার হৃদয়কে স্তরে স্তরে তুষের আগুণের ন্যায় দগ্ধ করিতেছিল তাহা আজ সহসা দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিল। "চাঁড়াল বেটা হলো কি—এঁ্যা শ্রীনাথ মুখুয্যেরও মুরুব্বি, দয়া করে মাছ পাঠাইয়া দিয়াছেন। শালাকে এই আস্পর্দ্ধার প্রতিফল দিব, বাঁধাব শালাকে জেলে পচাব। বামন হয়ে চাঁদে হাত।"

মুখুয্যে মহাশয়ের সহিত স্থানীয় থানার দারগা বাবুর সহিত বিশেষ প্রণয় ও ঘনিষ্টতা ছিল। সুতরাং বলাই বাহুল্য রাধানাথের আজি হইতে নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। কোথাও চুরি হইয়াছে রাধানাথের ঘর খানাতলাসী আরম্ভ হইল। কোথাও ডাকাতি হইয়াছে রাধানাথ চালান যাইল। লোকে একেবারে অবাক্। রাধানাথ অনেক কষ্টে অব্যাহতি পাইত গ্রামস্থ অপরাপর লোক চেষ্টা করিয়া তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিত। ক্রমে রাধানাথ ও গ্রামস্থ লোক বুঝিতে পারিল যে এই সকল কার্য্যের মূলে

আছেন শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। একদিন রাধানাথ সন্ধ্যার পর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে গিয়াছিল। তিনি শিবের ঘরের দ্বারে বসিয়া সন্ধ্যা করিতেছিলেন। সন্ধ্যা শেষ হইলে রাধানাথ মাটীতে নাকেখত দিয়া বলিল "ঠাকুর মহাশয় জানবিৎ কোন পাপই ত করিনি—কেন আপনার কোপে পড়িলাম। ভাল আমার অদৃষ্টের দোষে যাহা হবার তাহা হয়েছে এখন আমায় মাপ করুন নহিলে হয় আমাকে গলায় দড়ী দিতে হবে না হয় দেশত্যাগী হতে হবে। অপরাধ যদি হয়ে থাকে মাপ করুন।" মুখুয্যে মহাশয় রাধানাথকে দেখে একেবারে তেলে বেগুনে জলে উঠে ছিলেন। কোন ক্রমে ক্রোধ সংবরণ করিয়া তাহার কথা শুনিতেছিলেন, কথা শেষ হইলে বলিলেন, গলায় দড়ী তোমার হবে, তবে এদড়ী নয় ফাঁসি, হয় জেলে পচাব নহিলে ফাঁসিতে ঝোলাব। অপরাধ, অপরাধ! বেটা আমার কুন্তী সুত যুধিষ্টির, ঘোর অপরাধ! দেবতা ব্রাহ্মণের আগ ভাগ খাওয়া, শ্রীনাথ মুখুয্যে তোমার সমযোগ্য নয়, উনি আজ গ্রামের কর্ত্তা। হায় ধর্ম্ম, চাঁড়াল ব্যাটা বামুনের মাথায়, দেবতার মাথায়; ঘোর কলি ঘোর কলি দূর হ বেরো বেটা সুমুখ থেকে দূর হ। কৈ হ্যায় রে পাকড়ো ডাকু শালাকো পাকড়ো।" এক নিশ্বাসে হুড় হুড় করিয়া কথা কটা শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়া ফেলিলেন। কথা যত শুনিতেছে রাধানাথ ততই চমৎকৃত হইতেছে। তারপর সে দেখিল যেমন কৈ হ্যায় রে বলা আর অমনি মুখুয্যের বাটী হইতে দুই জন বরকন্দাজ ছুটিয়া তাহাকে ধরিতে আসিল। রাধানাথ এক লম্ফে ১৫ হাত পিছাইয়া পড়িল। লাফ দেখিয়া বরকন্দাজ দুইজন অবাক্। মূহুর্ত্ত মাত্র সেই খানে দাঁড়াইয়া রাধানাথ তারস্বরে বলিল "দেবতা ব্রাহ্মণ সাক্ষী রাধানাথ কোন অপরাধে অপরাধী নয়। তবে মুখুয্যে মহাশয়ের ব্যবহার পাষানেরও অসহ্য। কপালের ভোগ বার মাস। রাধানাথ আজ থেকে ডাকাৎ। সাবধান, আমার যদি গলায় দড়ী হয় তোমারও হবে। কালীর ইচ্ছা।" মুখোপাধ্যায় ও বরকন্দাজ দুই জন আর পূর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন সকলে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিলেন—রাধানাথ নিমেষে কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

সেই দিন রজনীযোগে মস্থুরে নপাড়া হইতে ৪ জন লোক গভীর নিশীথে

কোথা চলিয়া গেল। সে চারি জনের মধ্যে শ্রীনাথ মুখো ও বরকন্দাজ ২ জন আর আমাদের রাধানাথ।

* * * * * *

অল্পদিন মধ্যেই রাধানাথের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। রাধানাথ পত্র লিখিয়া টাকা চায়, যদি পাইল, উত্তম, নহিলে টাকা দিতে অস্বীকারকারীর বাড়ী ডাকাতী হইবে। রাধানাথের ডাকাতির টাকার কিরূপ গতি শুনিবেন? কন্যাদায়, পিতৃদায়, মাতৃদায়, ঋণদায়, ব্যাধিদায়—এই সকল দায়ে পড়িয়া যদি কেহ রাধানাথের শরণাগত হইত সে তৎক্ষণাৎ ইচ্ছামত টাকা পাইত। মিথ্যা কথা বলিয়া কেহ টাকা চাহিত না, চাহিতে ভরষা করিত না। রাধানাথের গতি বিধি কোথা নাই—সে যে সব জানে মিথ্যা কথা টিকিবে না, ধরা পড়িয়া যাইবে। কেহ তোমার বিষয় জোর করিয়া কাড়িয়া লইতেছে ভয় কি রাধানাথ আছে। কেহ ফৌজদারীর দায়ে পড়িয়াছে—সেও রাধানাথের সাহায্য পাইবে। রাধানাথ গ্রামে বা পড়স গ্রামে ডাকাতী করিত না দূর দূরান্তরে ১০।২০।৩০ ক্রোশ দূরে গিয়া ডাকাতী করিত। রাধানাথের দল কখন কোথায় থাকিত তাহা কেহ বলিতে পারিত না। গোয়েন্দারাও কিছু করিয়া উঠিতে পারিত না। রাধানাথ গ্রামের লোকের কণ্ঠহারের মধ্যমণি, যেমন ছিল তেমনই আছে। গ্রামের সমস্ত লোক শ্রীনাথ মুখোর উপর চটিয়া গিয়াছে। মুখোপাধ্যায় এক ঘরে হইয়াছেন।

রাধানাথ কখনও কখনও নিজে একেলা ডাকাতী করিত। কাহারও সাহায্য লইত না। রাধানাথের ও তাহার দলের অনেক লোকের বাঁশের পা ছিল। লম্বা লম্বা বাঁশের গিটে পা রাখিয়া হু হু করিয়া চলিয়া যাইত। দলপতি বিধায় রাধানাথ সর্ব্ব বিষয়ে সকলের শ্রেষ্ঠ ছিল। গ্রামে ৫ জন ভদ্রলোকের নিকট বসিয়া রাধানাথ গল্প করিতেছে রাত্রি ১০টা হইয়াছে। শৌচ হইতে আসি বলিয়া উঠিয়া গিয়া রাধানাথ ৪ক্রোশ দূরে একজন দুষ্ট বণিকের বাটিতে ডাকাতি করিয়া আবার ঘণ্টা খানেক মধ্যে ভদ্রলোকদিগের নিকট ফিরিয়া আসিল। রাধানাথ নানা ঔষধ জানিত। হাত পা কাটিয়া গেলে বা হাড় ভাঙ্গিয়া গেল সেই সকল ঔষধ একদিনে আরাম করিত। ঐসকল ঔষধের নাম "ডাকাতে ঔষধ।" রাধানাথের মাতার নাম ছিল ডাকিনী। সে বলিত যে যদি রাধানাথ আমার মরে আর তার এক খানা হাড় আমি

পাই তাহা হইলে আবার একটা রাধানাথ সৃষ্টি করিতে পারি। লোকে বলিত সে ভারি ওস্তাদ।

বলাই বাহুল্য রাধানাথের নামে সহস্রটা কৃত অপরাধের জন্য সহস্রটা ওয়ারীণ জারি ছিল। তাহাকে ধরিবার জন্য সর্ব্বদা লোক ফিরিত। কিন্তু রাধানাথ গ্রামে থাকিত না বলিয়া তাহাকে হেতা হোতাই খুঁজিত—গ্রামে বড় একটা খুঁজিত না। এজন্য রাধানাথ লুকাইয়া লুকাইয়া প্রায়ই গ্রামে আসিত আবার রাতারাতি চলিয়া যাইত। কিছু কাল ডাকাতী করার পর রাধানাথের একটি অবিদ্যা জুটিয়াছিল সে গ্রামে বাস করিত। রাধানাথকে ধরিবার জন্য শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না তখন এই অবিদ্যার শরণাপন্ন হইলেন। অবিদ্যা কিন্তু কিছুতেই রাধানাথকে ধরাইতে রাজি হইল না। রাধানাথও এসব সংবাদ রাখিত। শেষে মুখোপাধ্যায় এত রাগান্বিত হইলেন যে নিজে পুলিষের লোক সঙ্গে লইয়া এদেশ ওদেশ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রাধানাথও প্রকাশ করিল যে সে অনেক সহ্য করিয়াছে আর সহ্য করিবে না সে এবার শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুণ্ডটা শ্রীশ্রীকালী মাতাকে উপহার দিবে। সুতরাং মুখোপাধ্যায় ও রাধানাথ উভয়েরই গ্রামে আসা একরূপ ভার হইল। মুখোপাধ্যায়ের চক্রান্তে পুলিস প্রহরী গ্রামে সর্ব্বদা বসিয়া রহিল। কাজেই এই সকল পুলিস প্রহরীকে রাধানাথের লোকের ও গ্রাম্য লোকের হস্তে মধ্যে মধ্যে বড়ই উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতে হইত।

রাধানাথের প্রগাঢ় কালীভক্তি ছিল ৺কালী পূজা না করিয়া মা-কে না জানাইয়া সে কখনও ডাকাতী করিতে যাইত না। রাধানাথ তাহার ওস্তাদজীর নিকট কালীর স্বরূপ কি বুঝিয়া লইয়াছিল সুতরাং স্ত্রীলোক মাত্রকেই সে মা বলিত ও জগদম্বার বিভূতি বলিয়া মান্য করিত। স্ত্রীলোককে রাধানাথ সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞানে মনে মনে পূজা ভক্তি ও প্রণাম করিত। বালিকা ও কুমারীকে সে সাক্ষাৎ কালিকা ও দেবী বলিয়া বুঝিত একবারও অভেদ জ্ঞান করিত না। রাধানাথের হুকুম ছিল যে যদি তাহার দলস্থ কেহ কখনও কোন স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করে তবে অমনই তাহার মুণ্ডচ্ছেদ হইবে।

একবার এই ঘটনাটি হইয়াছিল। একদা একজন ব্রাহ্মণ রাধানাথের ডাকাতীর দলে আসিয়া ভর্ত্তি হয়। আসিয়া অবধি সে বলিতে আরম্ভ করে যে অমুক গ্রামের অমুকের বাড়ীতে অনেক টাকাকড়ি আছে সেইখানে ডাকাতী করিলে প্রচুর লাভ হইবে। রাধানাথ সংবাদ লইল যে সে ব্রাহ্মণ গরিব। যতদূর প্রকাশ তাহার টাকাকড়ি নাই। সুতরাং ডাকাতী করিতে রাধা অস্বীকার করিল। ডাকাত ব্রাহ্মণও ছাড়ে না। সে বলিল আমি দায়ী হইব যদি না মাল পাওয়া যায় কাঁচা মাথা দিব। তখন অগত্যা ব্রাহ্মণের নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া রাধা ডাকাতী করিতে স্বীকার করিল। ধার্য্য দিনে যথাকালে ব্রাহ্মণের বাটীতে ডাকাত পড়িল। ডাকাতরা এদিক ওদিক ঘুরিয়া বাস্‌ক পেট্‌রা ভাঙ্গিতেছে আর সেই ব্রাহ্মণ ডাকাত একটা সিঁড়ির নীচে নিভৃত স্থানে একটি পরমা সুন্দরী কন্যার ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছে। দৃষ্টি মাত্র ক্রোধে জ্ঞান হত হইয়া একজন ডাকাত তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া ফেলিল। রাধানাথ আসিয়া উপস্থিত হইয়া ব্যাপার দেখিল। বুঝিল কোনক্রমে সফল মনোরথ না হইতে পারিয়া ব্রাহ্মণ যুবক শেষে ডাকাতগণের আশ্রয় লইয়া যুবতীর ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে। রাধানাথ গম্ভীর ভাবে বলিল "মা কেন এমন হল কোথা কে কি পাপ করিল। না আমিই পাপী যাহা হোক বুঝিলাম মা নারাজ হইয়াছেন। আমার পতন নিকট।" রাধার সঙ্কেতে তৎক্ষণাৎ ডাকাতগণ চলিয়া গেল।

* * * * *

রাধানাথ শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়ের অত্যাচারে নিতান্ত পীড়িত হইয়া শেষে শ্রীনাথ মুখোর বাড়ী ডাকাতী করা মনস্থ করিল। একথাও ঠিক হইল যে শ্রীনাথ উপস্থিত থাকিলে তাহার ছিন্নমুণ্ড ধূলি চুম্বন করিবে। শ্রীনাথের স্ত্রী ছিল না বাটীতে শ্রীনাথের একটি কুমারী কন্যা ও একটি বর্ষীয়সী বৃদ্ধা ছিল—আর কেহই ছিল না। বাটীতে শ্রীনাথ মুখো আসিয়াই বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার বাটীতে ডাকাতী হইবে। তিনি তখনই অতি গোপনে গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। যথাসময়ে ডাকাতগণ রে রে করিয়া আসিয়া মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে পড়িল। তাহারা চারিদিক পাতি পাতি করিয়া খুঁজিল কিন্তু কোথাও শ্রীনাথকে দেখিতে পাইল না। তখন সহসা রাধানাথ দেখিল কপাটের পার্শ্বে কি একটা লুকাইয়া রহিয়াছে।

ছুটিয়া গিয়া দেখিল যে শ্রীনাথের কুমারী কন্যা। রাধানাথ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কুমারী কন্যাকে কোলে করিয়া তাহাকে যথোচিত আদর করিয়া সংবাদ জানিলেন শ্রীনাথ মুখো বাড়ীতে নাই সন্ধ্যার সময়েই পলাইয়াছে। তখন নিকটস্থ ময়রা বাড়ী হইতে সন্দেশ আনিয়া কুমারীর সেবা করিয়া রাধানাথ বিফল মনোরথ হইয়া চলিয়া গেল। শ্রীনাথের বড়ই পরমায়ু। উত্তর কালে শ্রীনাথ মুখোর এই কন্যার বলাগড় থানার দীর্ঘস্থই গ্রামে স্বনামখ্যাত শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ হয়। বৃদ্ধ বয়সে ইঁহাকে গ্রামস্থ সকলে নপাড়ার জেঠাই বলিয়া ডাকিত। এই ডাকাতীর গল্প ইনি স্বমুখে বলিয়াছেন।

এদিকে শ্রীনাথ রাধানাথকে ধরাইবার জন্য প্রাণপণ করিলেন। গ্রামে আর একটিও পুলিস পাহারা রহিল না। রাধানাথকে ধরিবার জন্য আর কেহ চেষ্টা করিত না। রাধানাথও দেখিল যে তাহাকে ধরিবার জন্য কোম্পানির আর বড় চেষ্টা নাই—সুতরাং শিথিলতা ও অবসন্নতা রাধানাথকে আক্রমণ করিল। এই সময়ে রাধানাথ ঘোর মদ্যপায়ী হইয়া উঠিল। সর্ব্বদা গ্রামের সেই অবিদ্যার নিকট থাকিত। একদিন শ্রীনাথ বাড়ীতে আসিয়া জানিতে পারিলেন রাধা অবিদ্যার ঘরে অত্যন্ত মাতাল হইয়া পড়িয়া আছে উঠিবার ক্ষমতা নাই। তখনই পুলিস প্রহরী আনাইয়া ধরিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু রাধা সে দিনও পলাইয়া গেল—সময়ে অবিদ্যা তাহাকে সংবাদ দিয়াছিল।

শেষে শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় অনেক চেষ্টা করিয়া অনেক অর্থব্যয় করিয়া রাধার অবিদ্যাকে বশীভুত করিল। অবিদ্যা সংবাদ দিল যে রাধা আবার মাতাল হইয়াছে। এবার পুলিস পাহারা চুপে চুপে গিয়া বাড়ী ঘেরাও করিল ও উঠানে সরিষা ছড়াইয়া দিল। রাধা অবিদ্যার ঘরে নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিয়া আছে আর উর্ণনাভ শ্রীনাথ তাহার চতুর্দ্দিকে জালবিস্তার করিতেছে—কে আর এবার তাহাকে সংবাদ দিবে, অবিদ্যা যে শ্রীনাথের বশীভূত হইয়াছে। গ্রামের লোক বিপদ গণিল। তাহাদের ইচ্ছা নয় যে রাধার কোন রূপ অমঙ্গল হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সে দিন রাধার মা আবার বাড়ি ছিল না। গ্রামের দু এক জন সাহসী লোক তফাৎ হইতে চীৎকার করিয়া রাধাকে সাবধান করিতে প্রয়াসী হইল। যখন অবিদ্যা দেখিল

গ্রামের লোক এইরূপে তার প্রাণবল্লভকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে তখন তার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তখন সে রাধানাথকে জাগরিত করিয়া পুলিস ঘেরাও করার কথা বলিল, রাধানাথ বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল—বুঝিল বিশ্বাসঘাতকতা। তখন আর কি হইবে জয়কালী বলিয়া যেমন উঠানে পড়িয়া ছুটিবে অমনি সরিষার উপর পড়িয়া গেল অমনি চারিদিক হইতে বাঁশ দিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরা হইল। অনেক ধস্তাধস্তির পর রাধানাথের হাতে হাতকড়ি পায়ে বেড়ী পড়িল। রাধা পুলিস বেষ্টিত হইয়া হুগলির ডাকাতী কমিশনের বাড়ীতে চলিল।

আজ হুগলির ডাকাতী কমিশনের বাড়ীতে লোকেলোকারণ্য—রাধা ডাকাত ধরা পড়িয়াছে। যেন সার্কিট হৌসে কোন মেলা হইয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে পীপীলিকার ন্যায় লোকের সারি চলিয়াছে। কেন? রাধানাথের ফাঁসি দেখিতে, লোকের বিশ্বাস রাধানাথ মরিবে না। তার মা যদি হাড় পায় তবে তখনই আর একটি রাধা সৃষ্টি করিবে। সরকার বাহাদুর যখন শুনিলেন রাধার মা কোথা গিয়াছে তখন সে ফিরিয়া না আসিতে আসিতেই কাজ সাবাড় করিতে মনস্থ করিলেন। যে দিন সন্ধ্যার সময় রাধা পঁহুছিল, সুতরাং সেই রাত্রীতে সাক্ষী আনিতে চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিল। প্রাতঃকালে সরাসরি বিচার করিয়া কমিশনর ফাঁসীর হুকুম দিয়া চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন রাধার মা যেন কাছে আসিতে, ফাঁসী দেখিতে বা হাড় না পায়। কেহ কেহ বলেন রাধানাথের বিচার খুব গোপনেই হইয়াছিল আর সাক্ষী এক শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়।

ধরাধামে আজি রাধানাথের শেষ দিন। প্রাণ দিয়া মন দিয়া দেহ দিয়া অর্থ দিয়া যে সকল লোকের রাধানাথ উপকার করিয়াছিল—এক দিন নয় দুদিন নয় কুড়ি বৎসর ধরিয়া উপকার করিয়াছিল—তাহারা আজ আসিয়াছে, দূর দুরান্তর হইতে আসিয়া রাধানাথকে, উপকারী বন্ধুকে, শেষ দিনে জন্মের মত দেখিতে আসিয়াছে। রাধানাথ নিরন্নকে অন্ন দিত, দিগম্বরকে বস্ত্র দিত, আতুরকে ঔষধ দিত। কন্যাদায়, পিতৃদায়, মাতৃদায়, প্রায়শ্চিত্তদায় এ সকল লোক আসিলে এক পয়সা দেন কি? এখন দেশের অপর লোক কেহ দেয় কি? রাধানাথ দিত। রাধা ধনীর লইয়া নির্ধনীকে দিত, কৃপণের ধন লইয়া দীন দুঃখীর দুঃখ মোচন করিত। ডাকাতীর সময় অত্যাচার ছিল

না। চাবী দেও জিনিষ লইয়া যাই। পূর্ব্বে পত্র লিখিলে যে টাকা দিত তাহার বাটি ডাকাতী হইত না। বিলাতের রবিণ হুডের অপেক্ষা রাধা অনেক উচ্চ সরকার জানিতেন, তাই পাছে লোকে রাধাকে ছিনাইয়া লয় এই জন্য অনেক পুলিস পাহারার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তবে রাধার তুলনা কি কেবল রাধা, গঙ্গা জলের কি আর তুলনা নাই? না, আছে—বিশ্বনাথ বাবু। বিশ্বনাথ বাবুর নাম এত অধিক হইবার কারণ এই যে তিনি ৪১৫টা জেলা লইয়া কার্য্য করিতেন আর রাধা ১টি মাত্র জেলা লইয়া থাকিত। বিশ্বনাথ লেখা পড়া জানিত ও সদ্বংশজাত, রাধা নিরক্ষর চণ্ডাল। সে যাহাহোক লোকে লোকারণ্য। রাধার অবিদ্যা আত্মগ্লানির দহনে থাকিতে পারে নাই ঘুরিয়া আসিয়াছে—দূরে প্রহরীগণ তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে নিকটে আসিতে দিতেছে না। রাধার অবিদ্যা বলিয়া অনেক লোক দেখিতে যাওয়ায় সেখানে বড় ভিড় আর সে ধরাইয়া দিয়াছে বলিয়া লোকে তাকে মারিতে উদ্যত সুতরাং পুলিস তাহাকে যত্নে রক্ষা করিতেছে। আর রাধার মা—সে হতভাগিনী আজি শেষ দিনে একবার পুত্রকে দেখিতেও পাইল না—কোথায় গিয়াছে হয় ত সংবাদই জানে না। আর এক পার্শ্বে উচ্চ স্থানে—সে খানে ভিড় নাই—একটু নিভৃতে শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া ভাবনা সাগরে ভাসিতেছেন, আত্মগ্লানি দাবাগ্নিতে শতধা দগ্ধ হইতেছেন। আজ মনে মনে বলিতেছেন—এক একবার চীৎকার করিয়াও বলিতেছেন হায় হায় কি করিলাম কেন ধরাইলাম। প্রাণসম প্রিয়তমা কন্যা আমাকে যে হাতে ধরিয়া বলিয়াছিল "বাবা রাধা জ্যেঠা আমাকে বড় ভালবাসে তাকে ধরাস নি।" হায় হায় কেন শুনিলাম না। ঈর্ষার বশে কি সর্ব্বনাশই করিলাম। শ্রীনাথ আজ উন্মত্ত এক একবার অস্থির হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে রাধার ফাঁসী হইলে তিনি নিজে গলায় দড়ি দিয়া মরিবেন। তাঁহার কন্যাকে যে রাধার শোক বড়ই লাগিবে।

শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় পূর্ব্বে জানিতেন না যে তাঁহার কন্যা রাধাকে এত ভালবাসে। তারপর একেবারে শেষ সময়ে শুনিলেন তাঁহার বাড়ীতে ডাকাতীর রাত্রে রাধানাথ তাহার কন্যার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল। কিন্তু তখন রাধানাথ ধরা পড়িয়াছে রাধা তখন হুগলির পথে রওনা হইয়াছে।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়া রাধানাথ আসিল। ধীর গম্ভীর দৃঢ় পদবিক্ষেপে ফাঁসী কাষ্ঠে উঠিল। একবার চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখিল। দূরে দেখিল তাহার অবিদ্যা পুলিস পাহারা ঘেরা—কাছে আসিতে দিতেছে না, রাধাকে দেখিয়া সে ভূমে গড়াগড়ি দিয়া চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে ও ছটফট করিতে লাগিল। রাধানাথ গম্ভীর ভাবে তাহাকে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া হো হো করিয়া, কি মনে করিয়া, একবার হাসিয়া, উঠিল। তার পর রাধার চক্ষু লোকারণ্যে যেন কাহাকে খুঁজিতে লাগিল। চক্ষুর্দ্বয় খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিয়া আসিল—যেন অন্বেষণের বস্তু মিলিল না। পুনরায় রাধানাথ আবার কি অনুসন্ধান করিতে লাগিল, আবার তাহার নয়নদ্বয় লোকারণ্যে কাহাকে খুঁজিতে লাগিল। এবার কিন্তু অন্বেষণের বস্তু মিলিল। এ বস্তু শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং। দেখিবা মাত্র রাধানাথ একবার চমকাইয়া উঠিল—শ্রীনাথ আর সে শ্রীনাথ নাই জীর্ণ শীর্ণ প্রায় দুই দিনে বার্দ্ধক্যে উপনীত দুই দিনে জরাগ্রস্ত। তখন যুক্ত কর কপালে তুলিয়া ঘাড় নোয়াইয়া রাধানাথ ভক্তিভাবে শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়কে প্রণাম করিল। তারপর উচ্চৈঃস্বরে বলিল "মুখুয্যে মহাশয় তোমার শত্রু রাধা চাঁড়াল চলিল কিন্তু আবার দেখা হবে। আপনি ভাল করেছেন—পাপের নিবৃত্তি হল; কিন্তু পাপ করাবার মূল আপনি। তাই বা কেন, কপাল ছাড়া পথ নাই। সকলই কালীর ইচ্ছা।" এই কথা শুনিয়া মুখোপাধ্যায় উন্মত্তের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, লোকে দেখিয়া অবাক্। পুলিস কি সঙ্কেত করিল। রাধানাথ স্থির হইয়া দাঁড়াইল, যুক্ত করে দেব দেবীকে প্রণাম করিল—গঙ্গাকে প্রণাম করিল। তার পর চীৎকার করিয়া বলিল "ভাই সকল সকলে একবার জয় কালী বল, একবার জয় কালী বল।" তখন সেই লোকারণ্য সমস্বরে একতান মনে, গভীর আরাবে বলিল জয় জয় মা কালী জয় জয় মা কালী, জয় জয় মা কালী। শব্দ জল স্থল কানন ছাপাইয়া বাষ্পার্ণব ভেদ করিয়া আকাশে উঠিল। আবার নিকটস্থ ভাগীরথী বক্ষে সেহ গভীর আরাব গড়াইয়া গড়াইয়া পরপারে গিয়া পঁহুছিল অমনি প্রতিধ্বনি বলিয়া উঠিল "মা কালী"।

রাধার মুখে মুখোশ দিয়া গলায় ফাঁস দেওয়া হইল। রাধানাথ স্থির হইয়া কালী নাম জপ করিতেছে—চক্ষু মুদিয়া আছে। কর্ত্তার সঙ্কেতে

পুলিস পাহারা কাষ্ঠ খণ্ডের উভয় পার্শ্বের দড়ী একই মুহূর্ত্তে কাটিয়া দিল। রাধানাথ দড়ীতে দোদুল্যমান হইয়া একেবারে মঞ্চ হইতে ৮ হাত নীচে পড়িয়া ঝুলিতে লাগিল। সব ফুরাইল।

তখন সেই লোকারণ্য বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। পুলিস বেটন সাহায্যে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। রাধানাথের হাড় তাহার মা যাহাতে না পায় তাহার বন্দোবস্ত পুলিস কর্ত্তৃক হইল।

* * * * *

শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় সেই দিন গলায় দড়ী দিয়া মরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। লোক আসাতে কার্য্য সমাধা হয় নাই। মধ্যে মধ্যে এইরূপ চেষ্টা তিনি করিতেন, শেষে একদিন তিনি চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করিলেন। পাঠক মহাশয় রাধানাথের কথা স্মরণ হয় কি ?

ফটিক্ জল।

(১)

বরিষার সহচর কে তুমি হে পাখি,
কাতরে ফটিক জল চাহিতেছ অবিরল,
উদাস পরাণে ডাক ঊর্দ্ধে করি আঁখি,
বরিষার সহচর কে তুমি হে পাখি ॥

(২)

বরিষার সহচর কে তুমি হে পাখি,
পুরাইতে কিবা আশা মিটাইতে কি পিপাসা
ঘন ডাক ঘন পানে অন্তরালে থাকি ;
বরিষার সহচর কে তুমি হে পাখি ॥

(৩)

বরিষার সহচর কে তুমি হে পাখি,
নিদাঘে তাপিত প্রাণে চাহিয়া আকাশ পানে
কত দিন অবসন্ন ক'রে হাঁকাহাঁকি ;
বরিষার সহচর কে তুমি হে পাখি ॥

(৪)

বরিষার সহচর কে তুমি হে পাখি,
নদনদী সরোবরে কত অনন্ত সাগরে
সলিলে সদত ভরা সুন্দর নিরখি ;
বরিষার সহচর কে তুমি হে পাখি ॥

(৫)

বরিষার সহচর কে তুমি হে পাখি,
সে জলে মেটে না আশ চাই তাই বার মাস
জলধর জলধারা সকাতরে ডাকি ;
বরিষার সহচর কে তুমি হে পাখি ॥

(৬)

বরিষার সহচর কে তুমি হে পাখি,
সরোবর অবহেলি বিশাল জলধি ফে'লি
এক বিন্দু মেঘ বারি পাইলে কুতকী ;
বরিষার সহচর কে তুমি হে পাখি ॥

(৭)

বরিষার সহচর কে তুমি হে পাখি,
অম্বরে জলদ নাদে গাও গান সবিষাদে
তাহাতে চাতক তুমি হও বড় সুখী ;
বরিষার সহচর কে তুমি হে পাখি ॥

(৮)

বরিষার সহচর কে তুমি হে পাখি,
জলদে বিদ্যুচ্ছটা তোমার ডাকার ঘটা
সুন্দরী লইয়া খেলা কি সুন্দর দেখি ;
বরিষার সহচর কে তুমি হে পাখি ॥

(৯)

বরিষার সহচর কে তুমি হে পাখি,
এক বিন্দু বারি তরে ডাক সদা সকাতরে
ক্ষুদ্র ও হৃদয় খানি প্রেমে ভরি রাখি ;
বরিষার সহচর কে তুমি হে পাখি ॥

(১০)

বরিষার সহচর কে তুমি হে পাখি,
শিখাইতে প্রেমতত্ত্ব নিজমনে সদামত্ত,
নর কিন্তু ভেবে মরে বিষয়ের ফাঁকি ;
বরিষার সহচর কে তুমি হে পাখি ॥

(১১)

বরিষার সহচর কে তুমি হে পাখি,
প্রকৃতির প্রেম শিক্ষা মানবের হয় দীক্ষা
বিশ্বপ্রেম জেগে উঠে তোমাদের দেখি ;
বরিষার সহচর কে তুমি হে পাখি ॥

(১১)

জীব শ্রেষ্ঠ হে মানব হের ক্ষুদ্র পাখী,
বিষয় মদিরা ভুলি প্রেমের লহরী তুলি
মিশাও অনন্তে মন প্রেমসুধা মাখি ;
বরিষার সহচর কি সুন্দর পাখী ॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

গদাই পুরুত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শ্মশানে।

গল্প শেষ হইলে বন্ধুবর অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। আমি আপনার ভাব লইয়াই রহিলাম। বসিয়া বসিয়া কত কথা ভাবিতেছি। কখনও য়ুরোপের দুর্দ্দশা ভাবিতেছি কখনও ভারতের মহানুভবতার বিষয়, হিন্দু-ধর্ম্মের বিরাটত্বের বিষয় ভাবিতেছি। আমার মনে হইল হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে এমন একটা গূঢ় ব্যাপার আছে যাহা সাধারণের জানা নাই বা সাধারণের জানা হইতে পারে না, কিন্তু রহস্যজ্ঞের মধ্যে সকলেই জানেন। নহিলে, আমি মনে মনে তর্ক করিলাম হিন্দুর সন্ন্যাসী ফকীরের মধ্যে এত তেজ

এত সন্তোষ কোথা হইতে আসে। আহারের জন্য আদৌ চেষ্টা নাই কাহারও নিকট চাহিবে না অথচ ভূতে তাহার প্রয়োজনীয় পদার্থ গুলি আনিয়া সুমুখে রাখিয়া যাইবে। মানুষ ধন জন গৃহ স্ত্রী পুত্র পরিবার একেবারে ত্যাগ করিয়া, কৌপীন কমণ্ডলু মাত্র অবলম্বনে কি করিয়া দীর্ঘ জীবনটা দারুণ হিংস্রক জন্তু সমাকুল ভীষণ বিষাক্ত সর্প পরিপূর্ণ আহারাভাব জলাভাব প্রভৃতি যন্ত্রণা সহিয়া, ঘোর বিজন কান্তারে কাটাইয়া দেয় তাহা ভাবিবার কথা। এমন কি একটা আছে যাহার মহিমায় তাহারা এ সব তুচ্ছ করে বা এসব যন্ত্রণা ও অসুবিধা আদৌ অনুভব ও ভোগ করিতে হয় না। হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে যেখানে যাইবার পথ একবারে নাই, যেখানে পর্ব্বত গুহা, উপত্যকা, অধিত্যকা, বৃক্ষ লতাগুল্ম রহিত পর্ব্বত গাত্র ও গিরি তরঙ্গিনী সকলই চির হিমানী মণ্ডিত, যেখানে কোন জীবিত প্রাণীর পরিচয় পাওয়া যায় না, যেখানে কেবল মেরু দেশীয় তুষার শৈবাল ও তুষার বিচরণ-কারী ভল্লুক ও হরিণ ও কাক প্রভৃতি দুই একটি জীব জন্তু পরিদৃষ্ট হয় সেখানে অনায়াসে—সেই সাধারণ মনুষ্যের একেবারে বাসানুপযোগী তুষার প্রান্তরে একটি কুটীর রচনা করিয়া বা একটি গুহাবলম্বনে সাধু মহাপুরুষগণ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। আর সে জীবনযাত্রাই বা কি রূপ? রোগ শোক জরা বিহীন কখনও বা মৃত্যু বিহীন জীবন, ক্ষুধা তৃষ্ণা বিরহিত, ইন্দ্রিয়বৃত্তি ইন্দ্রিয়চেষ্টা বিরহিত, সুধাপানে চির আনন্দময়, ও ব্রহ্মা-নন্দে বিভোর। আবার তাহার উপর ভগবান স্বয়ং হাতে তুলিয়া অষ্টৈশ্বর্য্য দিতেছেন কেহ বা লন কেহ বা লন না। যাহারা লন বা ইচ্ছা করিয়া কোন দিন ভোগ করেন তাঁহারা চক্ষুর নিমেষে ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিয়া আসিতেছেন। ইচ্ছা মাত্র ভগবান ভক্তের ভাবানুমোদিত দেহ বা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তের সম্মুখে। এখানে ভক্তও যা ভগবানও তা। বরং এখানে ভগবান অপেক্ষা ভক্তেরই মহিমা আমার মতে অধিক বলিয়া বোধ হয়। কোন একটা গূঢ় ব্যাপার আছে যাহার বলে সাধুগণ অচিরে সিদ্ধি লাভ করেন। এখন দেখিতেছি ভারতই জগদম্বার প্রিয়তম, য়ুরোপ আমেরিকা তিনি লালচুসী দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। য়ুরোপ ও আমেরিকার সুধীগণ চৈতন্য মহাসাগরের বেলা ভূমিতে বালকের ন্যায় জড়ের উপল খণ্ড সংগ্রহ করিতেছেন মাত্র।

আমি এতদূর চিন্তা করিয়াছি এমন সময় বন্ধু বলিয়া উঠিলেন "ভারতবর্ষের প্রতি যথার্থই জগদম্বার করুণা, ভারত যে চৈতন্যজ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছে সে মহাসাগরের জল স্পর্শ পর্য্যন্ত য়ুরোপ আমেরিকা করিতে পারে নাই। জড়ের লালচুসী পাইয়াই য়ুরোপ আমেরিকা আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছে।

আমি। ক্ষমা করিবেন কথাটায় বাধা দিতেছি। আমি ঠিক যে ভাবটি চিন্তা করিতেছিলাম আপনি ঠিক সেই ভাবটির কথা বলিলেন। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আপনি কি আমার মনের ভাব, মনের কথা টের পাইয়াছেন।

বন্ধু। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। যখন অপর পাঁচ রকম ভাবে হৃদয় আলোড়িত না করে, যখন রিপুর খেলা নাই, যখন সত্ত্ব চিন্তা হইতেছে তখন সে স্থানে যাহারা থাকিবে তাহাদের মনে এক ভাবই খেলিবে। ইহাই ভাব সঞ্চালনের সরল ও আদি বিকাশ। পরীক্ষা দ্বারাও একথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। য়ুরোপে আজি কালি thought transferএর অনুশীলন হইতেছে।

আমি। আপনি কি কথা কহিবার আগে মনে করিয়াছিলেন যে আমি ঐ ভাবই ভাবিতেছি।

বন্ধু। নিশ্চয়ই। অতি সহজ। আমার মনে যে ভাবটা হইল আমি বুঝিলাম সেই ভাবটা আপনারও হইয়াছে। সাধুগণ ও যোগীগণ এই কারণেই অপর লোকের মনের কথা বলিতে পারেন। তবে তাঁহারা সত্ত্বগুণাবলম্বী হওয়াতেও তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তি প্রবলা হওয়ায় তাঁহারা সেই স্থানে একটা সত্ত্বের বাষ্পার্ণব সৃষ্টি করিয়া ফেলেন। সেই সত্ত্বের বাষ্পার্ণবের মধ্যে তমোগুণাবলম্বী ও রজোগুণাবলম্বী পতিত হইলেও সত্ত্বগুণাবলম্বী তাহাদের মনের কথা বুঝিতে পারেন। এখানে সত্ত্বেরই প্রাধান্য ছিল, হয় আপনার ভাব আমাতে আসিয়াছে না হয় আমার ভাব আপনাতে গিয়াছে। তাপ তাড়িত, আলোকের যেমন তরঙ্গ আছে ভাবেরও সেইরূপ তরঙ্গ আছে। ভাবের নাশ নাই। আপনি যদি সুভাব সৃষ্টি করেন সুভাব প্রসব করেন সেই সকল সুভাব হইতে পরে আপনার মঙ্গল হইবে। মনে যদি কুভাব সৃষ্টি করেন কুভাব প্রসব করেন তাহা হইলে উত্তরকালে ঐ সকল কুভাব আপনার অমঙ্গল করিবে। সে অমঙ্গল নানা আকারের হইতে পারে।

আপনার আধ্যাত্মিক অবনতি হইতে পারে, অশান্তি হইতে পারে, পীড়া হইতে পারে। কথার পিঠে কথা আসিয়া পড়িতেছে। ভগবানের নিকট সকলেই সমান, তিনি সকলকে সমান চক্ষে দেখেন। এখন আপনি যদি রাম বাবু বলিয়া এক ব্যক্তির ক্রমাগত হিংসা করেন তাহা হইলে ভগবান রাম বাবুকে রক্ষা করিবার জন্য আপনার উপর হইতে দৃষ্টি বা কৃপা সংযত করিয়া রাম বাবুর উপর বিন্যস্ত করিবেন। যদি চারি আনা রকম হিংসা করেন তাহা হইলে আপনার উপর হইতে ভগবানের চারি আনার কৃপা তুলিয়া রাম বাবুতে ন্যস্ত হইবে, যদি ষোল আনা হিংসা করেন তাহা হইলে ষোল আনা কৃপা হইতে আপনাকে বঞ্চিত হইতে হইবে ও আপনার প্রতি ভগবানের যে ষোল আনা কৃপা বা দৃষ্টি ছিল তাহা রাম বাবুর উপর ন্যস্ত হইবে। সুতরাং রাম বাবুর (যাঁহার হিংসা আপনি করিতেছেন) লাভ ও আপনার (যিনি হিংসা করিতেছেন) লোকসান। মোটামুটি বুঝাইবার জন্য এই উদাহরণ দিলাম। ইহার উল্টাটা আবার আছে। আপনি এক জনের মঙ্গল করিবার জন্য ষোল আনা চেষ্টা করিতেছেন তাহাকে ষোল আনা ভালবাসিতেছেন। এখানে ভগবান আপনার ভালবাসার পাত্রের উপরকার কৃপা তুলিয়া আপনাতে ন্যস্ত করিবেন। সেইরূপ একটি আধটিকে ভাল না বাসিয়া যদি ৫০। ১০০ জনকে ভালবাসেন ১০০০কে ভালবাসেন তাহা হইলে ততগুণ ভগবানের কৃপা আপনার উপর ন্যস্ত হইবে। সুতরাং পরের হিংসা করায় কত ক্ষতি আর অপরকে ভালবাসায় কত লাভ দেখুন। তাই সাধুগণ বলেন প্রাণ খুলিয়া পরকে ভালবাস ও পরের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল কর তোমার মঙ্গল হইবে ভগবান তোমার করতলস্থ হইবেন। তাই সব মহাজন বাক্য আছে live for others, পরোপকারায় সতাং জীবনং, Love is Heaven and Heaven is Love. ভগবান গীতায় বলিয়া গিয়াছেন যাহারা পরের হিংসা করে, তাহারা আমারই হিংসা করে, কেন না পরের দেহে আমিই আত্মারূপে আছি। সেই সকল নৃশংস ক্রূরকে আমি নরকে নিক্ষেপ করি তাহারা আসুরী জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং জন্মে জন্মে তাহারা অধম গতি প্রাপ্ত হইয়া শেষে পশু হইয়া জন্মায়। এখন বুঝিবেন কেন যীশুখৃষ্ট পর পর করিয়া ক্ষেপিয়াছিলেন কেন পরের মঙ্গলের জন্য নিজে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন বুঝিবেন যাদের, হরি

বল্‌তে নয়ন ঝরে তারাই দুভাই কেন আসিয়াছিল, কেন মার খাইয়া দুই ভাই গৌর নিতাই—বলিতেন মেরেছ বেশ করেছ, আবার মার কিন্তু একবার হরি বল। কেন গৌর নিতাই পরের প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিলেন, কেন মার খাইয়া কোল দিতেন, কেন আচণ্ডালকে হরি বলাইতেন, কেন শৌণ্ডিক, সুবর্ণ বণিক, মুসলমানকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন নাই এখন তাহা বুঝিতে পারিতেছি। কেন তুলসীদাস তারস্বরে বলিয়াছেন—বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দলালা; প্রেম সাধনমে মিলে ভগবান—কেন বলিয়াছেন আজি তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

তাই আমার মনে হয় য়ুরোপের বড় বিপদ—সেখানে মুষ্টি ভিক্ষাটি পর্য্যন্ত নাই। পরার্থপরতা কাহাকে বলে জানে না। বাইবেল যদিও শিক্ষা দিয়াছেন তাহারা বাইবেল মানে না। তাহারা individuality (স্বানুবর্ত্তিতা) বলিয়া কথা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারা ভালবাসে অর্থ ও তাহাদের নিজের দেহ ও প্রাণ। তারা জনে জনে স্বার্থপর পিতা পুত্রের খবর রাখে না, স্ত্রী স্বামীর সংবাদ রাখে না, ডাইভোর্স লইয়া আবার বিবাহ করে। ভাই ভাইয়ের সংবাদ রাখে না। এইরূপে জনে জনে স্বার্থপর এইরূপে জাতি স্বার্থপর। য়ুরোপে প্রেম ভালবাসা নাই পরার্থপরতা নাই। য়ুরোপের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমি বড়ই শঙ্কিত হইয়াছি। আমার মনে হয় য়ুরোপ অচিরে আধ্যাত্মিক হইবে নতুবা, য়ুরোপের একেবারে ধ্বংস হইবে। ধ্বংসের বীজ যে স্বার্থপরতা হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে। তাই আজ য়ুরোপ আমেরিকা এনলার্কিষ্ট, কমুনিষ্ট, নিহিলিষ্ট, সোসিয়ালিষ্ট প্রভৃতির ঘোর অত্যাচারে প্রপীড়িত, তাই ঘাতুকের গুপ্তছুরিকার আঘাতে নরদেহ ধূলায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। তাই রক্তস্রোত ধরা প্লাবিত করিতেছে তাই সমাজ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। তবে ভগবানের কৃপা নাকি অজস্র তাই ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ড তথা য়ুরোপের পরিচয় করিয়া দিয়াছেন। আমার মনে হয় যদি ভারতের নিকট অবনত মস্তকে য়ুরোপ সভ্যতা শিক্ষা করে; যদি প্রেমভক্তি পরার্থপরতার দীক্ষা গ্রহণ করে তবে এখনও তাহার দিন আছে নহিলে সমূলেন বিনশ্যতি। ইংলণ্ড ভারতে আসায় ইংলণ্ডের বেশী মঙ্গল হইয়াছে। ইংলণ্ডকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান ইংলণ্ডকে ভারতে আনিয়া ছিলেন। দেখা যাউক তাহারা চক্ষু বুজিয়া হর পার্ব্বতীকে

পাশ কাটাইয়া যায় কি না? বন্ধুকে আমি বাধা দিয়া বলিলাম আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। আপনি বলিবেন ভারত জগদম্বার প্রিয়তম, আর ইংলণ্ডেরও ভারতের সহিত মিলন হওয়াতে মঙ্গল হইয়াছে আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে জগদম্বা কেন আপন প্রিয়তম ভারত ভূমিকে অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন। কেন সাত শতবর্ষ ব্যাপী—অধীনতার বোঝা ভারতের মাথায় চাপাইয়া দিয়াছিলেন কেন বিধর্ম্মী মুসলমানের পদদলিত করিয়াছিলেন। ইহাই কি ভালবাসার লক্ষণ?

বন্ধু। ভগবানের মনের ইচ্ছা কি তাহা যদি মানুষে বলিতে পারিত তাহা হইলে আর ভাবনা থাকিত না। তবে মানুষ যে এটা ওটা বলে কথনও আপন আপন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কখনও কোন সাধু মহাপুরুষের নিকট কথার আভাস পাইয়া। সাধু মহাপুরুষগণ অবশ্য রাজনীতির কোন ধারই ধারেন না। ধর্ম্মের গ্লানির কথা উঠিলে প্রসঙ্গ ক্রমে যাহা বলেন তাহা হইতে যতটুকু বুঝা যায়। আমি যাহা বলিতেছি বা বলিয়াছি তাহার কতটুকু আমার শোনা কথা আর কতটুকু নিজের কল্পনা তাহা আমি বলিতে পারি না। ভগবানের অভিপ্রেত কি, আমরা চৌহদ্দী আঁটিয়া লইব—এই বা কি কথা? তবে এটাও মনে রাখিতে হইবে ঈশ্বর যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন—তিনি যে মঙ্গলময়। ভারত অধীন হইয়াছে বলিয়া আপনি বলিতেছেন—কিন্তু এই সঙ্গে একটা কথা বিবেচনা করাও যাইতে পারে। পিতা পুত্রকে মাতা সন্তানকে শাসন করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে দণ্ড দিয়া থাকেন—তাহা নিশ্চয়ই দুঃখপ্রদ আপাত মধুর নহে কিন্তু সন্তানের শাসন কার্য্যে পিতামাতার সন্তানের মঙ্গল ব্যতীত অপর কোন ইচ্ছা থাকিতে পারে কি? ভারত কর্ম্মভূমি—ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ সত্ত্বগুণাবলম্বনে ধর্ম্মালোচনার জন্যই ভারতে মানবের জন্ম। কেন ধর্ম্ম ভারতের প্রাণ—সে বড় গূঢ় কথা—তাহার আলোচনা এখন হইতে পারে না। সে যাহাহৌক ভারত যখন সেই ধর্ম্ম ছাড়িয়া ব্যভিচারে রত হইল তখনই ভারতের "দুর্দ্দশায়" সূত্রপাত হইল। ভগবান, মনে করুন ভারতকে দণ্ড দিয়া শাসন করিতেছেন। শিক্ষা দান করিতেছেন। শিশুর পক্ষে দুই ঘণ্টার দণ্ড যথেষ্ট হইতে পারে—ভারতের পক্ষে তাহা দুই সহস্র বৎসর হইতে পারে। অধীনতা "দুর্দ্দশা" একথা স্বীকার করিয়া লইয়াই

বলিতেছি। সে সম্বন্ধে বিপরীত ভাবের আলোচনা ত আছে। বন্য জন্তুর ন্যায় অসভ্য মুসলমান ভারতের সংঘর্ষে আসিয়া কি সভ্য হয় নাই মনুষ্যত্ব কি শিখে নাই। অতি পুরাকালে আরব দেশ হিন্দুর কাছে যে সমস্ত শাস্ত্রই শিক্ষা করিয়াছিল। তাহাদের গ্রন্থ পাঠে বুঝা যায় যে সে সকল সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র, গণিত শাস্ত্র, পাটীগণিত বীজগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি প্রভৃতি জ্যোতিষ ফলিত জ্যোতিষ পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদ চরক সুশ্রুত প্রভৃতি চিকিৎসা গ্রন্থ সমস্তই যে আরবগণ হিন্দুর কাছে পাইয়াছে। আরবের নিকট আবার য়ুরোপ পাইয়াছে। আসিয়ার মধ্যবর্ত্তী মরু ও পার্ব্বত্যময় দেশের যাযাবর দস্যু এদেশে আসিয়াছিল। পাঠানরাই বা পশু অপেক্ষা অধিক কি ছিল? কিন্তু ভারতবর্ষে আসিয়া তাহারা যেমন সভ্য হইয়াছিল। অতীতের ইতিহাস আজিও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। মোগল পাঠানের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ আজিও যাহা বর্ত্তমান আছে তাহা দেখিলেই তাহাদের সভ্যতার দৌড় বুঝা যায়। পুরাতন পারসীক জাতি সমগ্র অথর্ব্ব বেদটা জেন্দাবেস্তায় পরিণত করিয়াছিল বটে কিন্তু উত্তর কালেও যে ওরূপ কার্য্য হয় নাই তাহা নহে তবে ততটা বিস্তারিত না হইতে পারে। সঙ্কীর্ণ হইলেও হইয়াছে। মুসলমান জ্ঞানীগণ সংস্কৃতশাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আকবরের একজন প্রিয় কবি মুসলমান বেশ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ সন্তান ব্যপদেশে ব্রাহ্মণের নিকট শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিল। সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ সে সময়ে সকলেই সংস্কৃত পড়িতেন। আবার সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা আরবী পারশী পড়িতেন। সম্রাট আরঙ্গেবের ভ্রাতা দারা সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ লইয়া থাকিলেও সংস্কৃত কবিতা লিখিতে সময় পাইতেন। ইহা কি কম আশ্চর্য্যের বিষয় যে মহামতি দারা ষড়দর্শন পাঠ করিয়া পারসীতে তাহার অনুবাদ করিয়াছিলেন ও ষড়দর্শনের স্বহস্তে টীকা করিয়াছিলেন। মধ্য আসিয়ার মোগল ষড়দর্শনের টীকা করিতে পারিবে বলিয়া ভগবান কি ভারতকে অধীন করিতে পারেন না?

এই সম্বন্ধে আপনার নিকট আমি একটা পৌরাণিক কথার অবতারণা করিতেছি। যদুকুল ধ্বংস কে করিয়াছিল? দ্বাপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইয়া দ্বারকায় রাজ্য সংস্থাপন করিলেন আর বৃহৎ পরিবারের সৃষ্টি করিলেন। কেমন কৌশল করিয়া ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক কুলকে অভিশপ্ত করাইলেন

আর সেই কুলের ধ্বংস সংঘটন করিলেন তাহা মুষল পর্ব্বে লেখা আছে। যদুপতি যদুকুল ধ্বংস করিলেন আপনার সন্তান সন্ততি ধ্বংস করিলেন তাহা অপেক্ষা কি ভারত প্রিয়? আবার দেখুন, যদুবংশ ধ্বংসাবসানে, যখন সব ফুরাইয়াছে তখন অর্জ্জুন দ্বারকায় গমন করিয়া দেখিলেন অবশিষ্ট মাত্র রহিয়াছে কতকগুলি রাঁড়ী। কাজেই নিরাশ্রয়া সেই যদুকুল রমণীবৃন্দকে লইয়া অর্জ্জুন হস্তিনা নগরীতে চলিলেন। এ বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাও ছিল। তিনি যে সেখানে আবার একটা চক্রান্ত করিয়া বসিয়া আছেন অর্জ্জুন প্রথমে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিলে হুণ প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা আসিয়া অর্জ্জুনকে আক্রমন করিল। যে অর্জ্জুন স্বর্গে নিপাতকবচগণকে সমরে জিনিয়া স্বর্গকে নিরাপদ ও ইন্দ্রকে শান্তি প্রদান করিয়াছিলেন, যে অর্জ্জুন মহাদেবকে সম্মুখ সমরে তুষ্ট করিয়া পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, যে অর্জ্জুন খাণ্ডব দাহন করিয়া অগ্নিকে তুষ্ট করিয়া গাণ্ডীব ধনু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে অর্জ্জুন সক্ষাৎ নরনারায়ণ ও ভগবানের সখা, যে অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র সমরে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি বীরগণকে সম্মুখ সমরে পরাস্ত করিয়াছিলেন; সেই অর্জ্জুন আজি কালবশে, অসভ্য জাতিগণের সহিত সমরে পরাজিত হইলেন, গাণ্ডীব তুলিতেও পারিলেন না। অসভ্য জাতিগণ অনায়াসে অর্জ্জুনকে যুদ্ধে জিনিয়া যদুকুল রমণীগণকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিবারবর্গকে কাড়িয়া লইয়া গেল। তখন অর্জ্জুন নিজের পূর্ব্ব বিক্রম স্মরণ করিয়া নিজের পুরাকৃত কার্য্য স্মরণ করিয়া, আর নিজের পরাজয় ও যদুকুল রমণীগণের অসভ্য জাতিগণ দ্বারা হরণ দেখিয়া, স্মৃতির বৃশ্চিক দংশনে অস্থির হইয়া বালকের ন্যায় স্ত্রীলোকের ন্যায় "হা ভগবান" বলিয়া উচ্চৈস্বরে কেবল বিফল রোদন করিয়াছিলেন। কালবশে নরনারায়ণ অর্জ্জুনের রোদন ও বিফল রোদন অরণ্যে রোদন হইয়াছিল। আমি ত মনে করি ভারতের অধীনতার অনেক গূঢ় অর্থ আছে। ভারতের বর্ত্তমান অধীনতায় দুঃখ কোথা? আমি ত কিছু দুঃখের কারণ দেখি না। রাজা যিনিই হোন না কেন তিনি ত রাজত্ব করিবেনই তাহাই হইতেছে। যাহারা ক্ষত্রিয় তাহারা যুদ্ধ করিত — এখনও যাহারা ভারতের হইয়া যুদ্ধ করিতেছে তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় মনে করুন না কেন? কি ইংরেজই ক্ষত্রিয় এবং ইংরেজই (ক্ষত্রিয়ই) রাজা মনে করুন না।

যাহারা বৈশ্যবৃত্তির অনুশীলনকারী তাহারা বাণিজ্য করিতেছে। যাহারা শূদ্রবৃত্তির লোক তাহারা চাকরী করিতেছে। আর কলিতে ব্রাহ্মণ নাই অথবা কাউন্সিলের মেম্বর ব্রাহ্মণ রাজাকে মন্ত্রণা দিতেছেন এই ত বেশ রাজত্ব চলিতেছে ইহাতে কাহারও কিছু ক্ষতি নাই। বেশ ত চলিতেছে। কালবশে যেরূপ হওয়া উচিৎ সেইরূপই ত হইয়াছে। তাই কালের কাল মহাকাল যাঁর পদানত সেই জগদম্বার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া বসিয়া আছি। জানি মায়ের ইচ্ছা যাহা তাহা হইয়াছে তাহা হইতেছে ও তাহাই হইবে। আমাদের সমস্ত বিফল কার্য্যের নাম কংগ্রেস বা চেষ্টা। ভগবানও চেষ্টার উপর বড় চটা।

এমন সময় সহসা আমরা দেখিলাম ধ্যান মগ্ন সন্ন্যাসী বাহির হইয়াছেন বাহির হইয়া এক দৃষ্টে সন্ন্যাসিনীর কুটীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন অতি উৎসাহে ও মনঃসংযোগে সেই দিকে দেখিতেছেন। আমরাও উঠিয়া দাঁড়াইয়া যতটা পারি আত্মগোপন করিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে কুটীরে সন্ন্যাসিনী ছিল সেই থানে আর একজন সন্ন্যাসিনী বাহির হইয়া কুটীরের সম্মুখে নিমন্ত্রিতের পাতা করিতেছেন। প্রথমে যে ভৈরবীকে দেখিয়াছিলাম সে সময় তাহাকে সেখানে দেখিতে পাইলাম না। পাতা দেওয়া হইলে সন্ন্যাসিনী পাতে পাতে কি দিলেন। নিশ্চয়ই বুঝিলাম থাবার দিলেন কিন্তু সেই দূর হইতেও আমাদের মনে হইল পাতা গুলি অতি ছোট মানুষের থাবারের উপযোগী নয়। যাহাহৌক একটু পরে সন্ন্যাসিনী বাহিরে আসিয়া অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে আয় আয় আয় বলিতে লাগিলেন। তথনই এক অদ্ভুত দৃশ্য আমাদের নয়নগোচর হইল। দেখিলাম দ্বাদশটী শৃগাল কোথা হইতে আসিয়া সেই পাতে পাতে বসিয়া গেল ও মানুষের ন্যায় পংক্তি ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। আমি ত একেবারে অবাক্, আমার মস্তিষ্ক তথন একেবারে তোলপাড় করিতেছে, আমি ক্ষেপিয়া যাই যাই, আমার এমন অবস্থা এ কি এ—এ যে অদ্ভুত ব্যাপার যদি য়ুরোপে কোন বন্ধুর কাছে আমি এ গল্প করি তাহারা আমাকে তথনই পাগলা গারদে পাঠাইয়া দিবে কোন কথা শুনিবে না। অল্পক্ষণ পরে দেখিলাম সন্ন্যাসিনী আবার আহার দ্রব্য পরিবেশনে নিযুক্ত হইয়াছেন। পংক্তি ভোজন হইয়া গেল সন্ন্যাসিনী প্রণাম করিলেন। তথন শিবাদল বাহির হইয়া দিক বিশেষে চলিয়া গেল এবং অল্পদূর যাইয়া তারস্বরে যামঘোষ যামঘোষণা করিল। আমি দেখিলাম নিজ কুটীর হইতে সন্ন্যাসী ঐ দৃশ্য দেখিলেন নিকটে গেলেন না, তবে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন ও পরে শিবাদল গমন করিলে নিজ কুটীরে প্রবিষ্ট হইলেন। আমার বন্ধুও দেখিলাম সকলকে প্রণাম করিলেন ও নিমন্ত্রিত শিবাদলকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন।

আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম চীৎ হইয়া শুইয়া পড়িলাম আমার অবস্থা দেখিয়া বন্ধুর বড়ই কষ্ট হইতেছে বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু এ হেন সময়ে যদিও কৌতূহলে মরিয়া যাইতেছি তথাপি কথা কহা উচিৎ নয় বুঝিয়া নিতান্ত চেষ্টা করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। বন্ধু অনেকক্ষণ পরে আপনার জপাদি করিয়া—বোধ হইল তিনি কোনরূপ জপ করিতেছিলেন—আমার প্রতি কৃপালু হইয়া বলিলেন "আপনি যে এই দৃশ্য দেখিয়া নিতান্তই আশ্চর্য্য হইবেন সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনাকে স্বরূপ বলিতেছি যে আমাদের দেশের যে কোন লোকেও একথা জানে না। শিক্ষিত ভদ্রলোকের কথা ছাড়িয়া দিন, সন্ন্যাসী ফকীর দরবেশ জঙ্গম ইহাদের মধ্যেই অনেকে এ রহস্যের বিষয় জানে না। যাঁহারা ভাগবতীয় ধর্ম্মের আলোচনা বা সাধনে মগ্ন তাঁহারাও এ রহস্যের বিষয় অবগত নহেন, একান্ত গুরুকৃপা ব্যতীত এ দৃশ্য কেহ কথনও দেখিতে পায় না। আপনার উপর আপনার গুরুর কৃপা হইয়াছে এবং আমার উপর আমার গুরুদেবের আমার শ্রীনাথের কৃপা হইয়াছে নিশ্চয় জানিবেন। আজ আমার অত্যন্ত আনন্দ হইতেছে। কেন না আমি নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারিতেছি আপনাকে কৃপা করিবার জন্য আপনার গুরুদেব কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

আমি—আমি ম্লেচ্ছ যবন, খৃষ্টান আমার আবার গুরু কে? কই আমি ত কিছু জানি না।

(ক্রমশঃ)

প্রাচীন সাধন-সঙ্গীত।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত ।)

আজ নিম্নে যে সকল সঙ্গীত প্রকাশিত হইল, তাহাদের রচয়িতৃগণের নাম— ১। গৌরীকান্ত, ২। ষষ্ঠীচরণ মজুমদার, ৩। অমর মাণিক্য, ৪। কাশী রামানন্দ, ৫। দ্বিজ শ্যামানন্দ, ৬। মাধব, ৭। আলি রাজা। এতন্মধ্যে গৌরীকান্তের ২টি ও ষষ্ঠীচরণের ৪টি ভিন্ন আর সকলেরই এক একটী সঙ্গীত প্রদত্ত হইল। অবশিষ্ট ৩টি গীত অসম্পূর্ণ ও ভণিতি শূন্য।

প্রাগুক্ত কবিগণের মধ্যে ষষ্ঠীচরণ মজুমদার মহাশয় ও কবি আলি রাজা এখন 'পূর্ণিমার' পাঠকবর্গের নিকট কথঞ্চিৎ পরিচিত। সম্প্রতি সুপরিচিত লেখক শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় আলি রাজার পদাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতেছেন। কৌতুহলী পাঠক এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে উহাঁর বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হউন। গৌরীকান্ত বিরচিত 'চন্দ্রকান্ত' নামে একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। সেই গ্রন্থে তিনি নিজেকে 'দাস ও বৈদ্য' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'পরিষৎ পত্রিকায়' মল্লিখিত 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণে' পরিদৃষ্ট হইবে। মাধব নামে বঙ্গসাহিত্যে একাধিক কবি আছেন। ইনি কোন্ মাধব, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। অমর মাণিক্য, কাশী রামানন্দ ও দ্বিজ শ্যামানন্দের নাম বোধ হয় এই প্রথম শ্রুত হইল। ইঁহাদের গীতগুলি প্রায় ২০০ বৎসরের পুরাতন হস্তলিপি হইতে সংগৃহীত হইল। ভণিতিশূন্য অসম্পূর্ণ গীতগুলি রামপ্রসাদের গীত সংগ্রহ পুস্তকে পাইয়াছি। তদ্দ্বারা ঐ গীতগুলি রামপ্রসাদের রচিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।—

রণে কে আলো রে ভয়ঙ্করী !
অঙ্গে ভূষণ কিবা শোভিত, ঘোর ঘন মাঝে যেন তড়িত,
পদাম্বুজে অলি মধু লোভিত, হইয়া ক্ষুধিত, গুঞ্জরে ফিরি !
লোল রসনা দশনে লগ্ন, খরতর অসি করেতে তীক্ষ্ণ,
ঘোর রূপিণী রণেতে মগ্ন, বিগত-অম্বর দিগম্বরী !
গলিত কেশ বপু প্রকাণ্ড, গলে দোলে হার মনুজ মুণ্ড,
যেন হুতাশন রণে প্রচণ্ড, জ্ঞান হয় বুঝি সুমেরু গিরি !

ঘূর্ণিত লোচন দেখিতে ত্রাস, প্রলয় পবন সম নিশ্বাস,
রণ রঙ্গিনী মৃদু মৃদু হাস, করিছে বিনাশ অসুর মারি !
নহে মানুষী, নহে অসুরী, সামান্য দেবের নহে এ নারী,
গৌরীকান্ত ভণে জগদীশ্বরী, চল যায়্যা বামার চরণে ধরি। ১। ৭৬।

জয় জয় জয় দুর্গে দুর্গতি নাশিনী।
বিপদে করিবে রক্ষা নগেন্দ্রনন্দিনী॥
নামের মহিমা ত্রিলোকের (সার ?)*।
পঞ্চমুখে কহিতে না পারে গঙ্গাধর॥
ভব-পারাবারে দুর্গা নামেতে তরণী।
ত্রাহি তারা দীন জনে মোক্ষ প্রদায়িনী॥
তুমি সৃষ্টি স্থিতি-কর্ত্রী তুমি গো বিনাশ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইচ্ছায় প্রকাশ॥
ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডোদরী তুমি ত্রিলোচনী।
বিশ্বেশ্বরী বিশ্বময়ী বিশ্বের জননী॥
তুমি ব্রহ্ম-বস্তু পরাৎপরা মহামায়া।
সংসার সৃজন-হেতু হৈলে হরজায়া॥
কে জানে তোমার অন্ত অনন্ত-রূপিণী।
গৌরীকান্তে অন্তে মাত্র ভরসা ভবানী॥ ২। ৭৭।

দিন তো থাক্‌বে না গো মা, কেবল কথা রবে;
কথা রবে, কথা রবে, কথা রবে গো, জগতে কলঙ্ক রবে।
ভাল কিবা মন্দ কালী, অবশ্য এক দাড়া হবে;
সাগরে যার বিছানা, শিশিরে তার কি করিবে ?
দুঃখে দুঃখে মা জর জর, আর কত মা দুঃখ দিবে ?
কেবল ঐ দুর্গা নামে শ্যামা নামে কলঙ্ক রটিবে †। ১। ৭৮।

---

* এ স্থানে কীট-দষ্ট।

† 'সময় থাক্‌বে না' এরূপ একটা গীত প্রসাদ পদাবলীতে আছে। কাব্য-বিশারদের সংস্করণ ৯১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মালশী।

আনন্দময়ী হইএ, মোরে নিরানন্দ কৈর না।
অহনিশি বসি দুর্গা দুর্গা ডাকি, তবু দুঃখ রাশি গেল না!
আমি যদি মরি, হর সুন্দরি, তব নাম কেহ লবে না।
ভবানী ভাবিএ, ভব যাব তৈরে, এই মনে ছিল বাসনা।
ভবের মাঝারে, ডুবালি আমারে, স্বপনেহ তাহা জানি না! ২।৭৯।

তুমি বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা।
ওরে যে পদে ওপদ পেয়ছ, জান না সে পদের মজা। ৩। ৮০।

তাল—ধ্রুপদ।

নমামি তারিণী তারা, এদীনে তার গো ওমা!
সুখ-মোক্ষ-প্রদায়িনী ভৈরবী ভবানী ভীমা।
হর হৃদ্বিলাসিনী চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনী;
যোগারাধ্যে মহাবিদ্যে উমেশ মোহিনী উমা!
সর্ব্বাণী গীর্ব্বাণী বাণী, নির্ব্বাণ গুণ দায়িনী;
শ্রীষষ্ঠীচরণে কৃপা কর গো ঈশ্বরী শ্যামা! ৭। ৮১।

সুরট—একতালা।

কালী করুণা করহে দীনে।
সহেনা যন্ত্রণা, কে দিবে মন্ত্রণা,
সে প্রবীণ চরণ বিনে॥
সারদে বরদে শুভদে শঙ্করি, বিষম বিষয় বিপদে কি করি,
ক্ষমা ভিক্ষা করি, ওমা ক্ষমঙ্করি, নিস্তার দুস্তার ঋণে।
ভয়ে ভয়ে মরি, কি করি কি করি,
তব কৃপাতরী, ধরি জোর করি,
হেন মনে করি, মহাযাত্রা করি,
দাস ষষ্ঠী দৃষ্টি হীনে॥ ৮। ৮২।

মাগো ব্রহ্মময়ী সারাৎসারা!
ত্বংহি বিশ্বরূপা ওহে চিৎস্বরূপা নিরাকারাকারা সাকারাকারা। ১।
অনন্ত অদ্বৈত ত্বংহি বিশ্বমূলাধারা, স্থূল সূক্ষ্ম মোক্ষরূপা বিরাট আকারা,
ত্রিগুণ-জড়িত, ত্রিগুণ পূরিত, ত্রিগুণ-রহিত হে নির্ব্বিকারা! ২।
ত্বংহি পূর্ণ একগুণে বর্ণিত ঈশ্বরী, ত্রিগুণে ত্রিগুণাত্মিকা পরমা ঈশ্বরী,
ত্বংহি গুণাতীতা, ত্বংহি দ্বন্দ্বাতীতা, ত্বংহি ভাবাতীতা ব্রহ্ম অপরা। ৩।
অব্যক্ত অনিত্য নিত্য সত্য সনাতনী, অচিন্ত্য অকথ্য তথ্য তত্ত্ব-পরায়নী,
পরমা প্রকৃতি, পুরুষ আকৃতি, ত্বংহি শ্রুতি স্মৃতি জ্ঞান আকারা। ৪।
ক্ষিতি জল তেজ বায়ু পদার্থ আকাশ, হিরণ্য গর্ভাদি কীট তোমাতে প্রকাশ,
ত্বংহি হে বিজ্ঞান, তত্বমসি জ্ঞান, শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান ভব নিস্তারা। ৫।
ষড়ঙ্গ ব্যাপিনী আদ্যা অনাদ্যা অপরা, সহস্রার নিবাসিনী স্বচ্ছ পরাৎপরা,
সুষুম্না বেষ্টিনী, কুলকুণ্ডলিনী, বীজ স্বরূপিনী সোঽহংকারা। ৬।
মহাযোগে যোগমায়া মহাপদ্মাসনে, ব্রহ্মানন্দে রহিআছ শিবসংমিলনে,
পীযুষ ভাণ্ডারে, সেই একাধারে, ব্রহ্মবীজাকারে মা একাকারা। ৭।
সে সংযোগ বিয়োগেতে প্রণব উদ্ভব, বিন্দুরূপা মহামায়া হইলে প্রভব,
ত্রিগুণে ত্রিজন, করিলে সৃজন, মায়া বিস্তারণ করিলে সারা। ৮।
মহামায়া তব মায়া অপার অসীমা, সমাধি যোগেতে যোগী নাহি পায় সীমা,
এই শ্রীচরণে যাচে হীন জনে, শ্রীষষ্ঠীচরণে নিস্তার তারা*। ৯। ৯।৮৩।

রাগ বারোঁয়া—তাল ঠেকা।

আমার কি হবে কালিকে!
জীবনযাত্রা গত মাগো, করি আজি কালিকে!
মজে বিষয় সম্পদে, না ভজিলেম ঐ পদে,
ডুবিলেম ঘোর বিপদে, নৃমুণ্ডমালিকে!
এভব সিন্ধু অকূল, ভেসে মা পাইনে কূল,
কুলকুণ্ডলিনী কূল দেও ইন্দু-ভালিকে!

---

* এই গীতটি বেনারসে কবির মৃত্যুর অত্যল্প দিন পূর্ব্বেমাত্র রচিত হইয়াছিল, বলিয়া জানা যায়।

প্রাণ যায় গো সন্তরি, পেলে মা চরণতরী,
শ্রীষষ্ঠীচরণ তরি, ওহে নগ বালিকে! ১০। ৮৪।

মালশী।

ভবতারিণী জগত জননী ধরণীধরের নন্দিনী!
সেবিত (ললিত ?) সুরহর স্বরূপ অম্বর
সরসিজাসন বন্দিনী।
ভূজগপতি অতি নিগুণ * মতি যদি
কোটী যুগ ভরি গাও রে।
সহজে গুণগণ, নিপুণ মতি উন
গণনে ওর ন পাও রে॥
জননী ত্রিভুবন অমর নাহিক
নহে ত হে রাজতি (?)।
বিমল তুয়া পদ শরণে সম্পদ
অমর মাণিক্য গায়তি॥ ১। ৮৫।

মালশী।

কমল নয়ানে কর করুণা গো মা!
কমল পীযূষ হর পঞ্চ বিশিখ ধর
কুল শরাসন পাণি পুরনা (?)।
পূরিত চুরিত হাসে অমিয়া কথেক ভাষে (ভাসে ?)
পঞ্চ বসনে † চিত্ত হরনা॥
পাইয়া ভবের ভীত উনমত্ত হৈছে চিত
ন জানি কাহারে বোল ভাব না!
বিরিঞ্চি শ্রীধর শিব চারু চরণে তব
কি দিয়া করিমু পদতুলানা (তুলনা)॥

---

* 'নিগুণ' স্থলে 'নিপুণ' ও পড়া যায়।
† 'বসনে' স্থলে 'বয়নে' বা 'বয়ান' ও পড়া যায়।

দীন কাশী রামানন্দে তোহ্মার চরণ বন্দে
কি দোষে অধিক গেলা রসনা (বয়না ?)।
সূর্য্যসুতে ডড়িতে * ভুজে বাধিয়া নিতে
তাহে মোতে নিদয়া হবে না॥ ১। ৮৬।

মালশী।

দূর কর জঞ্জাল গো নারায়ণি,
সেবি তুয়া পাএ ভব তারিণি!
ভরিয়া পাপের ভরা, ভরা হৈল ভারি।
পার কর পার কর গো নারায়ণি ফুকরে কাণ্ডারী॥
গণেশের মাতা তুহ্মি নামে দশভুজা।
সীতা উদ্ধারিল রামে করি তোহ্মার পূজা॥
বসুদেব সুত কৃষ্ণ কংস ভয় পাইয়া।
তাহানে গো করিলা পার শিবারূপী হৈয়া॥
দ্বিজ শ্যামানন্দে কহে শুন গো ভবানি।
সেবকেরে কর পার তুয়া নাম জানি॥ ১। ৮৭।

হের ও কে এল গো রণে নব-জলদ-বরণী!
ঐ যে ভীষণ আননারে লোহিত-নয়না নব-যৌবনা উলঙ্গিনী!
এলোকেশী ভালে শোভে অর্দ্ধশশী লোলজিহ্বা বদনেতে অট্টহাসি
বিকট-করাল-দশনী!
বামা ধরে অসি করে রে, পশিএ সমরে
বিনাশে অসুরে একাকিনী!
রুধির-ধারা বহিছে অধরে, কণ্ঠ-বিভূষিতা-শীর্ণ-মুণ্ডহারে,
শবারুঢ়া ভয়ঙ্করা ভামিনী!
বিষোদরা যেন কাল ভুজঙ্গিনী, বিরাজে ঐ ঘোর বরণী!
ওমা, দেখে লাগে ভয় রে, হও মা সদয় দেও মাধবে অভয়,
ভয়-বারিণী! ১। ৮৮।

---

* ডড়িতে — দড়িতে।

মালশী।

করুণাদধি নানান বরণী শ্যামা কালী! ধু।
তুমি নারায়ণ হরি, তুমি হর ব্রহ্মা গৌরী,
দেবের দেবতা তুয়া মূল।
অষ্ট লোকে পরিহার, রাতুল চরণে যার,
শরণ মাগে নর দেবকুল॥
তুমি গুরু মাতা পিতা, ত্রিলোক পরম দাতা,
তারিণী করুণা সিন্ধু সার।
জগত রুদ্রাণী তনু, শিব লীলা রাধা কানু,
সত্ব রজঃ তমঃ শক্তি যার॥
হীন আলি রাজা বোলে, শ্যাম কালী পদতলে,
শক্তিলীলা শঙ্কর ঘরিণী।
সুর বংশী হর গৌরী, চন্দ্র অংশী রাধা হরি,
তত্বরূপী নবীন যৌবনী॥ ২। ৮৯।

শ্রীআবদুল করিম।

গ্রন্থ সমালোচনা।

শ্রীকৃষ্ণ লীলা—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, রচয়িত্রী শ্রীমতী রমণী দেবী। কলিকাতা শ্যামবাজার ১১নং গোপাল বিশ্বাসের লেন হইতে শ্রীনিলমণি ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত। কলিকাতা বাগবাজার ২নং আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেন পত্রিকা প্রেসে শ্রীতড়িৎকান্তি বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত। সন ১৩১১ বৈশাখ। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

গ্রন্থে একটি প্রকাশকের নিবেদন আছে। তিনি বলেন "আমি কতিপয় সহৃদয় বন্ধু ব্যক্তিকে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখাইয়াছিলাম তাঁহারা উহা পাঠ করিয়া অতীব আগ্রহের সহিত এই গ্রন্থ মুদ্রিত করার জন্য উপদেশ করেন। এই বন্ধুগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু অমূল্যপ্রসাদ ঘোষ এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী এই তিন জনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা ভগবানের নাম ও লীলা প্রচারের একান্ত

পক্ষপাতী।" ইহা ব্যতীত গ্রন্থে শ্রীহেমচন্দ্র সেন লিখিত (ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের সুযোগ্য অধ্যাপক ও ডাক্তার) একটি ভূমিকা আছে। আমরা ভূমিকা হইতে কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম। পাঠক মহাশয় ইহাতে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিবেন।

ব্রহ্মসংহিতা বলেন ঃ—

ঈশ্বরঃ পরমঃকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥

শ্রীকৃষ্ণই পরম তত্ত্ব। ইনি রসিকশেখর। সুতরাং লীলারস-বিগ্রহ। গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার সুমধুর সরল ভাষায় ভক্তিভাবে এই লীলা-রসময় সাক্ষাৎ ব্রহ্মসনাতন শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। ভক্তির ভাষা চিরমধুরা ও ভক্তহৃদয় আকর্ষণী। তাঁহার এই সরল লীলাবর্ণনা পাঠে ভক্তমাত্রেই যে নিরতিশয় আনন্দানুভব করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত যেমন বাঙ্গালাভাষা পাঠকমাত্রেরই পাঠযোগ্য, এই শ্রীকৃষ্ণলীলা গ্রন্থ খানিও ভাষার সরলতাগুণে, বিষয়ের পরম পবিত্রতাগুণে বাঙ্গালাভাষাজ্ঞ পাঠকমাত্রেরই পঠনযোগ্য। গ্রন্থকর্ত্রী পণ্ডিতা নহেন, তিনি পাণ্ডিত্যপ্রকাশ-যশোলাভ বা অর্থলাভের জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। লীলাগ্রন্থ শ্রবণে অনুরাগ তাঁহার স্বভাবসুলভ গুণ। বাল্যে ও যৌবনে তিনি নিবিষ্টচিত্তে শ্রীভগবানের লীলা পাঠ শ্রবণ, সর্ব্বদাই শ্রীলীলার অনুধ্যান করেন। নানা প্রকার সাংসারিক কার্য্যভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত, কিন্তু তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের লীলারস পানে বিভোর। তিনি সামান্য লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া নিজে অবসর প্রাপ্তিমাত্রই লীলাগ্রন্থ পাঠ করেন, আর সময়ে সময়ে স্বীয় চিত্তের পরিতৃপ্তির জন্য পয়ার প্রভৃতি ছন্দে লীলাবিষয়ক প্রসঙ্গ লিখেন। তাঁহার শ্রীলীলানুধ্যান ও সৎপ্রসঙ্গাদি লিখনাদি কার্য্য এখনও সমভাবেই চলিতেছে। তাঁহার প্রসঙ্গ গুলি সরল প্রাণের ভক্তিময়ী ভাষায় গ্রথিত।"

তারপর গ্রন্থকর্ত্রী আপনার আত্মপরিচয় দিয়াছেন। দেখুন—

শৈশবে ত্যজিল মাতা, পিতা না খুঁজিল। পিতার সমান সদা পালন করেন॥
শিশুকালে শ্বশুরের বাটী পাঠাইল॥ তাঁহার পালনে কভু কষ্ট নাহি পাই।
শাশুড়ী ছিল না মোর শ্বশুর রক্ষেণ। মাতা পিতা ভ্রাতা বন্ধু ক্রমে ভুলে যাই॥

এইরূপে কিছু দিন বঞ্চিনু সুখেতে।
মম ভাগ্যদোষে যান শ্বশুর স্বর্গেতে॥
একমাত্র কন্যারত্ন বিধি দিয়াছিল।
পঞ্চম বৎসরে সেই তেয়াগিয়া গেল॥
এইরূপে কিছু দিন হইলে যাপন।
একদিন স্বামী মোরে করেন ভৎর্সন॥
তাহাতে আমার মনে অভিমান হয়।
ভাবিলাম দেবদেবীর লইব আশ্রয়॥
দেবের শরণাগত হয় যেই জন।
বিবিধ সঙ্কটে সেই পায় পরিত্রাণ॥
এইরূপ চিন্তা আমি মনেতে বিচারি।
চৌত্রিশ অক্ষরে স্তব প্রথমেতে করি॥
কালীর করিয়ে স্তব হর্ষ হল মনে।
রচিলাম কৃষ্ণলীলা বিবিধ যতনে॥
তিন খানি গ্রন্থ আমি করেছি রচন।
"দেবীর মাহাত্ম্য" আর "সংশয় ভঞ্জন"॥
"কৃষ্ণলীলা" সুধারাশি যে করয়ে পান।
ভববন্ধ কেটে সেই যায় কৃষ্ণধাম॥
বিদ্যা বুদ্ধিহীনা আমি ক্ষমতা বিহীনা।
সুধু নাম বলে গ্রন্থ করেছি রচনা॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণপদ-আশা।
গ্রন্থ বিরচনে মোর ইহাই ভরসা॥

গ্রন্থকর্ত্রী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদ্যোপান্ত লীলা প্রকাশে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। ভরষা করি ভগবানের কৃপায় তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য সফল হইবে। এরূপ গ্রন্থের অভাব ছিল ভগবানের লীলা একত্রে কোন বাঙ্গালা পুস্তকে নাই। সংস্কৃত পুস্তকেও প্রায়ই বিক্ষিপ্ত। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলেন তারপর কি হইল অনেকে জানে না তারপর একবারে তাঁহাকে দ্বারকায় দেখিতে পাওয়া যায়, আবার কুরুক্ষেত্র সমরে তাঁহাকে সারথী হইতে দেখা যায়। উত্তর কালে কি হইল তাহারও রীতিমত বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। এখানি শ্রীকৃষ্ণের জীবনীও বটে আবার তাঁর লীলা প্রকাশকও বটে। তাই বলিতেছি এ গ্রন্থ প্রচার করিয়া প্রকাশক বাঙ্গালা ভাষার একটি অভাব মোচন করিলেন আমরা যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে কালে রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় এই গ্রন্থের গৃহে গৃহে আদর হইবে। ইহা পাঠে নিশ্চয়ই ভক্তির অনুশীলন হইবে আর ভক্তি পাইলে সাধকের আর কি বাকি থাকে? এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়। ভাষা সরল, কষ্ট কল্পনা নহে, সহজ, হেঁয়ালী বিড়ম্বনা নাই। নমুনা স্বরূপ আমরা উদ্ধব সংবাদ হইতে একটু তুলিয়া দিলাম। ভগবান শ্রীমতী রাধাকে যে পত্র লিখিয়াছেন উদ্ধব তাহা পড়িতেছেন ইহাতে আরম্ভ—

উদ্ধব পড়েন পত্র এক চিত্ত মনে।
চিত্রের পুতলি হয়ে শুনে সর্ব্বজনে॥
শুন শুন কমলিনী করি নিবেদন।
আমার উপরে না করিবে অভিমান॥

কার্য্য ক্রমে যদি আমি মথুরাতে রহি।
তোমা ছাড়া বিনোদিনী কভু আমি নহি॥
তার সাক্ষী দেখ তুমি আপন নয়নে।
চাতকিনী তৃপ্ত নয় অন্য বারি পানে॥
তুমি মম দেহ হও আমি তব প্রাণ।
দেহ ছাড়া হলে নাহি থাকয়ে জীবন॥
তুমি পদ্ম সরোবরে আমি মধুকর।
তোমাতে আমাতে নহি ভাবিবে অন্তর॥
অবনীতে অবতরি তোমার কারণে।
শমন দমন করি তব নাম গুণে॥
দিবানিশি তব নাম যপ আমি করি।
নিজগুণে ক্ষমা কর আমাকে কিশোরি॥
ইহা বলি পত্র হরি রাধাকে লিখেন।
শুনিয়ে শ্রীমতী তাহা উদ্ধবে কহেন॥
শুন সখা এক কথা নিবেদন করি।
যাইয়ে কহিবে তুমি যথা বংশীধারী॥
বিনা মূল্যে দাসী হয়ে যে জন বিকায়।
তাহাকে এ কথা বলা উপযুক্ত নয়॥
কপট জনের কথা বলি শুন স্পষ্ট।
হৃদয় বিষেতে ভরা মুখে বলে মিষ্ট॥
মথুরাতে রাজা হয়ে আছেন শ্রীহরি।
পাটরাণী হয়ে আছে কুবুজা সুন্দরী॥
বাঁকাতে বাঁকাতে ভাল হয়েছে মিলন।
অনাথিনী কাঙ্গালিনী হল গোপীগণ॥
না বুঝে আমরা কুলে দিয়েছি যে কালী।
মাথায় লয়েছি মোরা কলঙ্কের ডালি॥
প্রথমে হইল দেখা যমুনার তীরে।
কত ছল করি হরি ভুলাতে আমারে॥
পার করিতেন নায় হইয়ে কাণ্ডারী।
আশ্বাসে আকাশে তুলে নিকুঞ্জ বিহারী॥
এখন সে শ্যাম রায়ে করিতে দর্শন।
কত যুগ কেটে গেল করিয়ে রোদন॥
প্রফুল্লিত পদ্ম যদি দেখে সরোবরে।
মধু লোভে অলি আসি তখনি গুঞ্জরে॥
কিন্তু মধু ফুরাইলে করিবে গমন।
পুনর্ব্বার ফিরে আর করে না দর্শন॥
বুঝিলাম সেইরূপ কৃষ্ণের প্রণয়।
অগ্রেতে বাড়ায়ে তারে পশ্চাতে মজায়॥
বাঁশীস্বরে উদাসিনী করিল যাহারে।
পুনর্ব্বার না দেখিলা নয়নে তাহারে॥
জনক জননী তাঁর করিছে রোদন।
দুঃখের সাগরে ডুবে মরে গোপীগণ॥
শ্রীদাম সুদাম আদি যত সখাগণ।
আর কেহ নাহি করে তারা গোচারণ॥
রাজহংসগণ নাহি চরে সরোবরে।
ময়ূরের নৃত্য নাই বনের ভিতরে॥
বৃন্দাবনে শুনি নাই কোকিলের ধ্বনি।
যে অবধি মথুরায় গেছে চিন্তামণি॥
আমরা অবলা জাতি না বুঝি হে ছল।
খল সঙ্গে করে প্রেম কলঙ্ক কেবল॥
বসে থাকি পাগলিনী সদাই বিমনা।
গৃহে না থাকিতে পারি দেয় গো গঞ্জনা॥
যথা তথা থাকি বসে না পারি উঠিতে।
নির্ব্বাণ না হয় অগ্নি জ্বলে অন্তরেতে॥
ইহা বলি বিনোদিনী জ্ঞান হারাইল।
মূর্চ্ছাগত ধরাতলে পতিত হইল॥

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

অন্তঃপুর। ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন, সন ১৩১০ সাল। সচিত্র মাসিক পত্রিকা (কেবল মহিলাগণ কর্ত্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত) স্বর্গীয়া বনলতা দেবী কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ১৷৷০। অন্তঃপুর আফিষ ৩২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। Antahpur—Office, 32, Sukea's Street, Calcutta. আর ঠিক মাথার উপর আছে Antahpur Reg. C 266 টাইটেল পেজে ইহা ব্যতীত একটি সূচী আছে। সে এইরূপ—

সূচীপত্র।

বিষয়।	লেখিকা।
নির্ব্বন্ধ	শ্রীমতী গিরিবালা সেন গুপ্তা।
চারিটী আদর্শ রমণী	,, অসীমা সুন্দরী সোম।
সকল দিন সকলের সমান যায় না	,, আয়সা খাতুন।
জীবন-সংগ্রাম	,, বসন্ত কুমারী বসু।
রন্ধন	,, অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।
কবিতা	,, মোহিত কুমারী দেবী
	,, কুমুদেন্দু দেবী প্রভৃতি।
বিবিধ প্রসঙ্গ	

আমরা আর সব দিয়াছি কেবল পৃষ্ঠার অঙ্ক—অর্থাৎ কোন প্রবন্ধ কোন পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে—দিই নাই। এত করিয়া অন্তঃপুরের চৌহদ্দী কেন দিলাম পাঠক পাঠিকা পরে বুঝিবেন। ইহা অপেক্ষা এক খানি ছবি আছে জয়পুরের যাদুঘর ও বাগান।

আমরা "চারিটী আদর্শ রমণী।" পাঠ করিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়াছি। ১৩১০ সালের ফাল্গুনের অন্তঃপুর "চারিটি আদর্শ রমণী" প্রবন্ধ বাহির করিলেন কিন্তু ঠিক এই প্রবন্ধ ১৩০২ সালের পৌষের পূর্ণিমায় (৩য় ভাগ ৯ম সংখ্যা পৌষ ১৩০২) ২৪৪ পৃঃ প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ণিমায় লেখক ছিলেন শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ কাঞ্জিলাল আর অন্তঃপুরের লেখিকা দেখিতেছি শ্রীমতী অসীমা সুন্দরী সোম। অন্তঃপুর উন্নতিশীলাদের কাগজ ইহারা

আপনাদের "দেবী" "দাসী" ছাড়িয়া দিয়া উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন—বিশেষ একটি ধর্ম্মের প্রকাশ্য অনুশীলন করেন ইহাদের দ্বারা এরূপ কাজও সম্ভব ইহা মনে করিয়া আমরা অস্থির হইয়াছি। ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন সকল গুণের উপর স্বভাব। নীতি শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছিলেন গাভীর দুগ্ধের মিষ্টতা যেমন স্বাভাবিক তেমনি স্বভাবও স্বাভাবিক, চলিত কথায় বলে ইল্লৎ যায় ধুলে, স্বভাব যায় মলে। পুরুষ চোরকে পার আছে মেয়ে চোরকে পার নাই। পাঠক মহাশয় এ একেবারে দিনে ডাকাতী। পুং শিক্ষার ফল একদিন "গাওরে জগপতি জগ বন্দনে" দেখাইয়াছি আর স্ত্রী শিক্ষার ফল আজ আদর্শ রমণীতে, সকলই বিধির "নির্ব্বন্ধ"। আমাদের কপাল দোষে সবই বিড়ম্বনায় পরিণত হইতেছে। একেই বলে "গুণ হয়ে দোষ হল বিদ্যার বিদ্যায়"। যাহাহৌক গালি দিয়া আর কি করিব? পাঠক একবার ব্যাপারটা সাহসটা বুকটা চাতুরীটা কৌশলটা দেখুন।

পূর্ণিমা—

চারিটী রমণী।

১।

যোগমায়া যৌবনে যোগিনী। পরিধানে গৈরিক বসন, পশ্চাতে বিন্যস্ত কেশদাম, ললাটে সিন্দূর বিন্দুর কি অপূর্ব্ব শোভা। যোগমায়া লৌকিক লজ্জা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া সর্ব্বত্র যাতায়াত ও সকলেরই সঙ্গে অসঙ্কোচভাবে কথা কহিয়া থাকেন। শরীরে বিলক্ষণ বল, মনে অসীম সাহস। মুখমণ্ডলে কি এক অনির্ব্বচনীয় আভা—তাঁহাকে বিদ্রূপ বা উপেক্ষা করিবার প্রবৃত্তি কাহারও হয় না। এই জন্য নিরুদ্বেগে প্রশান্তভাবে যৌবনতরঙ্গে তিনি ভাসিতেছেন।

ভাগ্যগুণে অনুরূপ পতি মিলিয়াছে। তাঁহার অনেক শিষ্য আছে। তিনিও সংসারযোগী। শাস্ত্রালোচনায় দিন অতিবাহিত হয়। সেইরূপ আলোচনায় উভয়ে পরম সুখে দিনাতিপাত করিতেছেন।

যোগমায়া গ্রন্থাদি পড়িতে পারেন। বৈষ্ণবগ্রন্থাদি সমুদয় তাঁহার কণ্ঠস্থ। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের অমৃতরসে ডুবিয়াছেন, প্রেমামৃতপানে জীবনকে অমৃতময় করিয়া তুলিয়াছেন।

স্বামীর প্রসাদ পাইতেন। আহারান্তে তাঁহার স্বামী বিশ্রামার্থে শয়ন করিলে মায়াময়ী পতির চরণতলে বসিয়া চরণ সেবা করিতেন, কোন দিন হয়ত সেই তীর্থধামে মস্তক রাখিয়া নিদ্রাদেবীর আশ্রয় লইতেন।

ছায়ার ন্যায় পত্নী পতির পথানুবর্ত্তন করিবেন, ইহা কি কবির কল্পনা? যিনি কল্পনা মনে করেন, তিনি একবার দেখুন দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র স্বামীর সঙ্গে মায়াময়ী কেমন প্রীত মনে বেড়াইতেছেন। ঐ দেখুন প্রীতমনে তিনি স্বামীর পাশে বসিয়া একমনে শিষ্যালয়ে বসিয়া সকলকে কত মধুর উপদেশ দিতেছেন। বিবাহের পর হইতে মায়াময়ী একদিনও পতি বিরহিণী হয়েন নাই। সমাজে যাহা কল্পনার অতীত মায়াময়ী নিজ জীবনে তাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

প্রেমময়ীর মূর্ত্তি দর্শনে পতি বিমুগ্ধ। হাস্যের তরঙ্গ নাই, অথচ যেন পূর্ণ শশধরের বিমল কিরণে মুখমণ্ডল সুশোভিত উল্লাস নাই অথচ যেন প্রীতি লাবণ্যে চিরবিকসিত। ভক্তির নয়ন যুগলে যে অমৃত বর্ষিত হইয়া থাকে, তাহাতে তিনি একান্ত পরিতৃপ্ত। হাব ভাব বিলাস ভঙ্গিমা বর্জ্জিত মধুর কান্তির যে কি অনির্ব্বচনীয় ভাব তাহা অপরের বুঝিবার সাধ্য নাই, কিন্তু তাঁহার স্বামী চিরমুগ্ধ। উভয়ের এই পবিত্র ভাব দর্শনে সকলে তাঁহাদের সেই আবাস স্থানকে আনন্দ কানন বলিয়া মনে করিত। সেই আনন্দ কাননে তাঁহারা অতি পবিত্র ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেন।"

পাঠক পাঠিকা সমস্ত অর্থাৎ ৪টি রমণীর বিবরণ তুলিবার স্থান আমাদের নাই। যতটা পারিলাম ততটা দিলাম। ইচ্ছা করিলে তুলনা করিয়া দেখিতে পারেন কিন্তু আগাগোড়া ঐরূপ চুরি। এখন বলুন আমরা কি করিব?

প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা।

চন্দ্রবংশ অবতংস সিংহাসনে নর রায়,
চৌদিকে অমাত্য যেন তারা ঘেরা শশী ভায়।
বল্কলবাসিনী বামা দাঁড়ায়ে চরণ তলে,
ভক্ত যেন প্রভু-পদে সিক্ত প্রেম অশ্রু জলে।
প্রস্তর প্রতিমা প্রায় দাঁড়ায়ে রহিলা ধনী,
একটী সান্ত্বনা ভাষা না কহিলা নরমণি।
নৃপের উপেক্ষা হেন নেহারিয়া কণ্ব শিষ্য—
কহিলেন "শকুন্তলে এ বড় বিষম দৃশ্য—
ভিখারিণী সম হেন রাজ সভাতলে আর—
কতক্ষণ রবে অয়ি? বল যাহা বলিবার"।
লাজে ক্ষোভে সতী-বক্ষ—অশ্রুতে ভরিল হায়!
কহিলা কম্পিত কণ্ঠে নমি মহারাজ পায়।
"সমাগত দাসী প্রভু সেবিতে চরণ দ্বয়—
ভকতে দলিত করা প্রভুর উচিত নয়।
স্মর নাথ তপোবনে সে গন্ধর্ব্ব পরিণয়,
তুমি প্রভু আমি দাসী ভুলিলে কি প্রেমময়?
রবি বিনা পঙ্কজিনী এক তিল নাহি বাঁচে,
অভাগী কাতরে তাই—চরণে আশ্রয় যাচে।
আছে মোর গর্ভে প্রভু তোমার প্রেমের ফুল,
দিও না হে অনাদরে শুকাইয়া এ মুকুল।
দীর্ঘ দিন শ্রীচরণ সেবাতে বঞ্চিতা দাসী—
দেহ আজ্ঞা সেবি পদ প্রণয় পাথারে ভাসি"।
হানি ভ্রুকুটির হাসি কহিলেন নরবর,
"ছি ছি কুল কলঙ্কিনী নাহি কি একটু ডর?
লো পাপিনী—মায়াবিনী কে তুই এখানে বল,
হতে চাস অঙ্ক লক্ষ্মী পাতি পরিণয় ছল।

আর কি লাগে না ভাল কাননে বল্কল বাস,
তাই কি লো আগমন করি রাজেন্দ্রাণী আশ?
ছি ছি অয়ি দুশ্চারিণী নাহিক একটু লাজ,
অপরে বলিতে পতি? ধিক্ লো নারীর কাজ!
গন্ধর্ব্ব বিবাহ আমি করি নাই কোন কালে,
না পারিবে দুষ্মন্তেরে বাঁধিবারে মায়া-জালে।”
প্রেম বিনিময়ে অহো এ গভীর তিরস্কার—
নারী কি সহিতে পারে, কত বল বুকে তার!
মুক্তিল পীবর বক্ষ ঝরি বেগে অশ্রুজল,
কহিলেন ধীরে বামা চাহি পতি-পদতল।
“নিঠুর হইয়া নাথ কত বল কুবচন,
পত্নী কি না আমি তব এই দেখ নিদর্শন।
আপন অঙ্গুলী হ’তে অঙ্গুরী খুলিয়া তুমি
দিয়াছিলে পরাইয়া মোরে প্রেমাবেগে চুমি।
হের সে অঙ্গুরী প্রভু ঘুচিবে সংশয় তায়—
তাপস বালিকা কভু সিংহাসন নাহি চায়।”
অঞ্চলে সঞ্চিত সতী অঙ্গুরী দেখাতে যায়—
শূন্য সে অঞ্চল তাহে অঙ্গুরী কোথায় হায়।
হাসিল সভাস্থ লোক কলঙ্কিনী ভাবি তায়
“দূর হও দুশ্চারিণী” দুষ্মন্ত কহিলা তায়।
সে অনন্ত অপমান সহিল না—সতী বুকে,
মূর্চ্ছিতা হইয়া বালা পড়িলা মনের দুখে।
অস্ফুটে ফুটিল মুখে—“গেল পদ সেবা সাধ,—
কেন লো অঙ্গুরী তুই কাঙ্গালে সাধিলি বাদ।”

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।

ভাষার নমনীয়তা।

বসন্ত কাল। পল্লবিত নিকুঞ্জকাননে প্রকৃতিদেবী ভুবন খানিকে হাসাইতেছেন। আবার কৌতুকপ্রিয় বনদেবতা যেন মনুষ্য-নয়নের অগোচরে থাকিয়া রসপূর্ণ ভাবময় চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তুলিকা টানিতেছেন—কেমন সুদৃশ্য বর্ণের বিচিত্রতা সম্পন্ন হইতেছে দেখ। কোন খানে নীহার ধৌত শুভ্রপুষ্প, কোন খানে অলক্ত নিষ্ঠ্যুত রক্তপুষ্প চিত্র করিবার বর্ণ দিতেছে; কোথাও অভিনব কিসলয় তুলির কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সূক্ষ্ম অগ্রভাগ বাহির করিতেছে—স্বয়ং বনদেবতা চিত্রকরী; নিপুণ হস্তে ধীরে ধীরে কেমন কোমল তুলিকায় বর্ণ ফলাইতেছেন। প্রতি অঙ্গে নবজীবনের সতেজ জ্যোতি ঢল ঢল করিতেছে তবু চিত্রাঙ্কের রেখাপাত হয় নাই—কেবল জগৎ জুড়িয়া একটী শ্যামল সুন্দর ছায়া পড়িয়াছে। চারিদিকে বসন্তের উৎসব মধুর কলরবে স্বভাবকে যেন জাগরিত করিতেছে। শুন দেখি বৃক্ষশাখায় ও কি ডাকিল? পাখির রব? তুমি মনে ভাবিতেছ পাখি বলিতেছে—‘বউ কথা কও’। কিন্তু পাখির কি বউ আছে তা’ সে কথা ক’বে? ঢেঁকীর কচ্‌কচী মনে যা ভাব কাণে তাই শুনায়। পাখির বাক্‌শক্তি নাই, সে আপন মনে নিজের বুলি বলিতেছে—তুমি কিন্তু ‘বউ কথা কও’ ‘বউ কথা কও’ শুনিতেছ।

অনেক গুলি পাখির বুলি ঠিক মানুষের কথার সদৃশ—চাতকে পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষের উচ্চ ডালে বসিয়া ডাকে ফটীকজল, ফটীক জল। আবার ষড়জসিদ্ধ পাপিয়া সুর তুলিয়া কেমন স্পষ্ট বলিতে থাকে “চোক গেল চোক গেল”। পক্ষীর আকার অবয়ব—ঠিক মানুষের মত না হউক যদি বানরেরও কিছু অনুরূপ হইত তাহা হইলে শব্দ শাস্ত্রের কল্যাণে অনেকগুলি পাখির সহিত আমরা কুটুম্বিতা করিতে পারিতাম। পাখিগুলি বাঙ্গালা কথা কয়—‘চোক গেল’ বলে ‘ফটিকজল’ বলে, ‘বউ কথা কও’ বলে। আমরাও বাঙ্গালা কথা কই হোলি উৎসবে চক্ষুতে আবির দিলে ‘চোক গেল’ বলি পরিষ্কার জল দেখিলে ফটিকজল বলি, আবার গৃহলক্ষ্মী অলঙ্কার না পাইলে যখন মান ভরে ভারী হন তখন আমরা ঘোমটাটী খুলিয়া বলি “বউ কথা কও”। তবে কি পাখীর বুলির সঙ্গে আমাদের ভাষার সাদৃশ্য নাই? অবশ্যই আছে। অতএব কতকগুলি ভিন্ন

জাতির ভাষার কতকগুলি শব্দের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া যে, এককালে উহারা সকলেই একভাষী ও একজাতি নিবিষ্ট না থাকিলে কোনও ক্রমেই সেরূপ ঘটিতে পারে না, তবে পাখির সঙ্গে আমাদের কুটুম্বিতা কেন না হইবে? কারণ পাখির বুলির সঙ্গে আমাদের বাক্যের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে।

ইউরোপে বিদ্যার বড় আদর। সেখানে আজকাল প্রাচীন ভাষার সবিশেষ অনুশীলন চলিতেছে। পণ্ডিতেরা অনেক দেখিয়া অনেক শুনিয়া অবশেষে একটী কল্পতরুর ছায়ায় আশ্রয় পাইয়াছেন—তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের শাখা অবলম্বন করিয়াছেন। এই দেব মাতৃক ভাষার শব্দগুলি কল্পবৃক্ষের ফল বলিলেই হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণে বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপত্তি জন্মিলে প্রায় সকল ভাষার শব্দগুলি অনায়াসে সাধিতে পারা যায়। সংস্কৃত শব্দের মত কোন ভাষার শব্দ এত কোমল, নমনীয় ও স্থিতি স্থাপক নহে। উহাকে সঙ্কুচিত কর, সম্প্রসারিত কর, ফিরাও ঘুরাও কিছুতেই উহা ভাঙ্গিবে না, মচ্‌কাইবে না। অতএব অন্য ভাষার শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের যে সৌসাদৃশ্য হইবে তাহা বিচিত্র নয়। শাব্দিকেরা এখন এই প্রতিপাদন করিতেছেন যে, যে যে জাতির ভাষার কতকগুলি শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের সৌসাদৃশ্য আছে মূলে তাহারা এক অভিন্ন জাতি ছিল। কাজেই আমরা দেখিতেছি—'গুণ হয়ে দোষ হ'ল বিদ্যার বিদ্যায়'। সংস্কৃত শব্দের কোমলতাই পবিত্র আর্য্যজাতি ম্লেচ্ছজাতির সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দিতেছে। নরম দেখিলেই সকলে তাহাকে চাপিয়া ধরে। ভারতের তো সব গিয়াছে এখন জাতি ও ভাষা টুকুও থাকা দায়—তাহাতেও অনেকে আসিয়া ভাগ বসাইতেছেন।

সংস্কৃত শাস্ত্র সুশোভিত শব্দ নিকুঞ্জ বনের 'বউ কথা কও' পাখির বুলি। এই নিকুঞ্জবন কোথাও বাক পল্লবে আলো করিয়া আছে, কোথাও ভাব রসময় কুসুম মঞ্জরীর গন্ধামোদে দশ দিক পরিপূর্ণ করিতেছে; আবার শাখার মধ্যে ব্যাকরণ সূত্র পাখির রব মনে যা ভাবিবে সেই সূত্র তোমাকে তাই শুনাইবে। যমুনা পুলিনের কদম্ব ডালে বসিয়া রাখাল রাজ বাঁশীটি বাজাইতেন, ব্রজের রাখালে শুনিত বাঁশী বলিতেছে—'আয় ভাই গোঠে যাই ধবলী-শ্যামলী ডাকিছে ওই'। রাই গৃহ কর্ম্ম করিতেছেন—মন যমুনা তটে—বঁটী পাতিয়া বেসাতি কুটিতেছেন আনমনে আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিতেছেন—ভ্রুক্ষেপ নাই, কান তুলিয়া কেবল এক মনে এক ধ্যানে ভাবিতেছেন, বাঁশী কি বলিতেছে; রাই শুনিতেছেন 'তোমার হয়ে আর কোথায় যাব বা রাই, বল প্রিয়ে আমি কার কাছে দাঁড়াই, হারাই বলে

আমি সদাই বলি রাই ধবলী চরাই, বেড়াই তোমার গুণ গেয়ে বৃন্দাবন ধাম'। প্রাণের ছেলে বিহনে যত বেলা হইতেছে যশোদা রাণীর হৃদয় ফাটিতেছে; তিনি শুনিতেছেন 'আমায় দেখা জননী! ক্ষীর সর ননী, গোঠে গোঠে ফিরি ক্ষুধায় সারা হই'। যাঁর যেমন প্রবৃত্তি তিনি সেই রূপ শুনিতেছেন, তিনি সেই রূপ আপনার ভাবে আপনি মগ্ন হইতেছেন। বাঁশী কিন্তু আপন সুরে ভোর।

সংস্কৃত শব্দ যাহা বলে, সে আপনার বুলিই বলিতেছে। তবে তুমি যদি তাহা হইতে নূতন কিছু বাহির করিতে পার সেটী সংস্কৃতের নমনীয়তা আর তোমাকে অধিক কি বলিব? তোমার সেটী অসামান্য গুণপনা। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নিখিল বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া কি করিতে পারিয়াছিলেন? যদি জর্ম্মনীতে জন্মগ্রহণ করিতে পারিতেন তবে তাঁর এক আনা বিদ্যাতে পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে একচ্ছত্র করিতে পারিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃতের সূত্রানুসূত্র ব্যবচ্ছেদ করিয়া অস্থি, চর্ম্ম তন্তু পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন শেষ বিধবা বিবাহ আর বহুবিবাহ বাদ ভিন্ন তো আর কিছু ক্ষমতায় আসিল না। আর চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় দু পাতা হং কং সং উল্টাইয়া যে বড় বড় কথা কহিতেছেন তিনিই বা কি করিয়াছেন। যদি আর দু হাত পশ্চিমে গিয়া জন্ম লইতেন তবে এক এক কথা কাহন দরে বিক্রয় হইত। কত জাতির জন্ম কোষ্ঠী নিরূপণ করিতেন গঙ্গাজলের সঙ্গে কূপোদকের সাদৃশ্য দেখাইতেন। কিন্তু কি করিবেন? যে দেশের ভাষা সেই দেশেই জন্ম লইয়াছেন—বিদেশী হইতে পারেন নাই—এ জীবনে শব্দ বিদ্যার মর্ম্ম জানা হইল না মনের খেদ মনেই রহিল।

জগৎচিত্র বিচিত্র বিবিধ পদার্থের ভাণ্ডার। সরল চরিত আদিম কবিগণ জগতের এক একটী বিচিত্র ব্যাপার দেখিতেন; ভাব-স্রোতে মন ভাসিয়া উঠিত কল্পনা লহরীতে দুলিতে থাকিতেন। কোন্ পদার্থের কিরূপ ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে কতই তাহা ভাবিতেন। চন্দ্রে কলঙ্করেখা ভাবুক কবি নূতন জগতে নূতন চক্ষে নূতন ব্যাপার দেখিলেন কেন এ কলঙ্ক কবির চিত্তে নূতন ভাব ভাসিয়া উঠিল। চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি আছে অতএব ক্ষয় রোগের লক্ষণ কাজেই মৃগ কোলে করিয়া না রাখিলে পীড়ার প্রতিকারের উপায় কি? তাই চন্দ্র মৃগ ধারণ করিয়া থাকেন তাই জগতের নয়নানন্দ সুধাংশু কলঙ্কদোষে দূষিত!

যেখানে যেমন পদার্থের অবয়বের সঙ্গে যেমন ঘটনা সঙ্গত হইতে পারে

সেখানে সেই প্রকার ঘটনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাড়বাগ্নি, ইন্দ্রধনু, মেঘ-গর্জ্জণ বিদ্যুৎ প্রভৃতি সকল আশ্চর্য্য বিষয়ের একটী কবি কল্পিত কারণ দেখা যায়। পূর্ব্বে পদার্থ বিশেষের উপর এক একটী কল্পনার সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে তাহা এখন পুরাতন হইয়া গিয়াছে। পুরাতনের আদর থাকে না। আজকাল তাই কল্পনাদেবী শব্দ শাস্ত্র হইতে একটা নূতন সৃষ্টির পত্তন করিতেছেন।

শাব্দিকেরা বলেন, অনেকগুলি জাতি মূলে একটী অভিন্ন জাতি ছিল। কাল সহকারে তাহাদের ভাষায় অনেক বিভিন্নতা জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু অদ্যাপি অনেক শব্দের সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ আমি, তুমি প্রভৃতি সর্ব্বনাম; এক দুই প্রভৃতি সংখ্যা বাচক ও পিতা মাতা প্রভৃতি স্বসম্পর্ক বাচক শব্দ গুলির বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। যথা

সংস্কৃত	পারসীক	গ্রীক	লাটিন	ইংরাজি
পিতা	পদর	পাটর	ফাতের	ফাদার
মাতা	মাদর	মাটর	মুতের	মদর
ভ্রাতা	ব্রাদর	ফ্রাট্রিয়া	ক্রুদের	ব্রদর
ত্বম	তু	স্থ	টু	ইউ
দ্বি	দো	ডুও	ডুও	টু

পাঠকের গোচরার্থ এখানে কেবল এই কয়েকটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সংস্কৃত শব্দ এত কোমল, নমনীয় ও স্থিতি স্থাপক যে উহা ফিরাইলে ঘুরাইলে অনেক প্রকার রূপ ধারণ করিতে পারে মনুষ্যের কথা কি? পশু পক্ষীর বুলির সঙ্গেও সংস্কৃত শব্দের অনেক সাদৃশ্য দেখাইতে পারা যায়।

বাঙ্গালী	ইংরেজ	মেষ	ছাগ	গো	সংস্কৃত
মা	মামা	ম্যাঁ	ভ্যাঁ	হম্বা	অম্বা

চাতকাদির বুলি পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। উপরে পিতা মাতা প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের অনুরূপ তদর্থ প্রতিপাদ্য অন্য অন্য ভাষায় যে সকল শব্দ লিখিত হইয়াছে সে সমুদয়ে অনেক বর্ণ ব্যতিক্রম হইয়াছে। সংস্কৃত পিতৃ, ইংরেজি ফাদর এস্থানে প স্থানে ফ ত স্থানে দ ও ঋ স্থানে র হইয়াছে। গ্রীক পাটর ত স্থানে ট ও ঋ স্থানে র হইয়াছে। সর্ব্বত্রই ইকারের লোপ হইয়াছে। সংস্কৃত ত্বম পারসীক তু—এখানে (ব) এই বর্ণের সম্প্রসারন হইয়া, উকার

হইয়াছে এবং অপর দুইটী ভাষাতে স ও টু হইয়াছে। যদি সর্ব্বত্র বর্ণ ব্যতিক্রম বর্ণ লোপ, বর্ণাগম, বর্ণবিপর্য্যয় গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ, নিপাতন এবং কৃদন্তের বাহুলক বিধির অনুসরণ করা যায়, তবে সংস্কৃত ভাষার সকল শব্দেরই ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে। সেটী সংস্কৃত ভাষারই গুণ। সংস্কৃত শব্দ গম্ভীর অথচ কোমল, আবার উহাকে রূপান্তরিত করিবার অনেক উপায় আছে, কাজেই নানা জাতীয় ভাষার শব্দের সদৃশ হইতে পারে। তবে আমরা এস্থলে এমন কথা বলি না যে কোন সংস্কৃত শব্দই অন্য ভাষায় প্রবেশ করে নাই। অবশ্য কার্য্যের অনুরোধে যখন ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পর ঘনিষ্ঠতা জন্মে, তখন এক জাতির ভাষার শব্দ অন্য জাতিতে প্রবেশ করে। মুসলমানদিগের রাজত্ব কাল হইতে আমরা অনেক যাবনিক শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। আবার এখন ইংরেজ-দের সময় কত ইংরাজি শব্দ আমরা অহরহ কথাবার্ত্তায় ব্যবহার করি। ইংরে-জেরা আমাদের দেশ পরিত্যাগ করিলে এখানে আর ইংরেজ থাকিবে না কিন্তু অনেক ইংরাজি শব্দ থাকিয়া যাইবে। ইংরেজেরা স্বদেশে চলিয়া যাইবেন—মনে করিয়াছ কি তাঁহারা কেবল ভারতের রত্নরাজি লইয়াই সাগরের হৃদয় আলো করিতে করিতে ভাসিয়া যাইবেন?—তা নয়। এদেশের অনেক শব্দ তাঁহাদের অনুগমন করিবে।

যদি সকল জাতির ইতিহাস ধ্বংস হইয়া যায় তবে পাঁচশত বৎসরের মধ্যে কোনও বৈদেশিক বিদ্যাবিশারদ অবতীর্ণ হইয়া সপ্রমাণ করিবেন হিন্দু ও ইংরাজ মূলে এক অভিন্ন জাতি ছিল।

শ্রীঅন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস।

হুগলি জেলার অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রামে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ পরমহংস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা খুদিরাম চট্টোপাধ্যায় দিয়ার নামে অপর এক গ্রামে বাস করিতেন। তথাকার জমীদার তাঁহাকে একটা মোকদ্দমায় সাক্ষী মানিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে তিনি সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন। জমিদার মহাশয় এই অপরাধে তাঁহাকে উক্ত গ্রাম হইতে উঠাইয়া দিবার ভয় দেখান।

ধর্ম্মভীরু ও শান্তস্বভাব খুদিরাম এইরূপে অপমানিত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দিয়ার পরিত্যাগ করিয়া দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত কামারপুকুর গ্রামে বাসস্থান নিরূপিত করেন।

খুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার পত্নী সারদাদেবী প্রকৃতই সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। একদা চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার ঔরসে ভগবান বিষ্ণু মানবরূপে জন্ম পরিগ্রহণ করিবেন।

খুদিরামের তিন পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে রামকৃষ্ণ সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন গদাধর; রামকৃষ্ণ পরবর্ত্তী সময়ের নাম।

গদাধর বাল্যকাল হইতেই ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য ক্রিয়াগুলি অতিশয় নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতেন। কথকদিগের নিকট হইতে পুরাণ-গীত শ্রবণ করিতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত। এমন কি ছয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি সমুদায় পুরাণ ও ইতিহাসের গল্পগুলি শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার স্মরণশক্তি, বস্তুবিচারের ক্ষমতা ও ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আস্থা দেখিয়া সকলেই তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিতেন। গ্রামে পৌরাণিক যাত্রাদি হইলে তিনি শ্রবণমাত্র সমস্ত নাটকখানি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন ও সমবয়স্কদিগকে নাটকীয় বিভিন্ন ব্যক্তি-বর্গের অংশ শিক্ষা দিয়া নাটক খানির পুনরাবৃত্তি করিতেন। সঙ্গীত বিদ্যায়ও তাঁহার যথেষ্ট যত্ন ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলির গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে গ্রামে তিনি একমাত্র বিচারক ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি নিজেও সুন্দর মূর্ত্তি গঠনে ও ভগ্ন মূর্ত্তির সংস্কারে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে অদ্যাবধি তাঁহার দ্বারা সংস্কৃত এক মূর্ত্তি রহিয়াছে।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কলিকাতায় একটী বিদ্যালয় (টোল) ছিল। তিনি সেই টোলে অধ্যয়ন করিবার জন্য প্রবিষ্ট হন, কিন্তু কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াই শিক্ষাপ্রণালীর উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া টোলের পাঠ পরিত্যাগ করেন। টোলে সুদীর্ঘ ধর্ম্মবক্তৃতা ও ধর্ম্মের প্রশংসা এবং সাংসারিক ব্যাপারে সেই শিক্ষার প্রভাবের একান্ত অভাব দেখিয়া এবং ঐ প্রকার শিক্ষার পরিণাম অন্নবস্ত্র সংস্থানের চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে বুঝিতে পারিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া-ছিলেন।

কিছুদিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত কালী-মন্দিরে পৌরহিত্য পদ গ্রহণ করেন। রাণী রাসমণি শূদ্রানী বলিয়া গদাধর তাঁহার

ভ্রাতাকে উক্ত কার্য্য গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য সাধ্য মত চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীঃ যে দিন মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় সেই দিন রামকৃষ্ণ অগ্রজের সহিত দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত মন্দির বলিয়া সেখানে তিনি কিছুমাত্র আহার করিলেন না। সন্ধ্যার পর ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণ যুবক এক পয়সার মুড়ি ক্রয় করিয়া জঠরানল নিবৃত্তি করিলেন ও তৎপরে কলিকাতায় গমন করিলেন।

তথায় ছয়মাস অবস্থিতির পর তিনি ভ্রাতৃস্নেহ বশতঃ দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিলেন। এবারে স্থির হইল তিনি গঙ্গাতীরে রন্ধন ভোজনাদি করিবেন ও মন্দিরে বাস করিবেন। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে তিনি মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হইলেন। এখন আর তাঁহার ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা সম্বন্ধে জ্ঞান পূর্ব্বের ন্যায় কঠোর ছিল না। মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালীকে তিনি মাতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন ও যথার্থই মাতার ন্যায় দেখিতেন। দৈনিক পূজা সম্পন্ন হইলে তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া যপ, মন্ত্রোচ্চারণ, ঈশ্বরের গুণগান প্রভৃতি করিতেন। কখনও কখনও তিনি তাঁহার মাতাকে যে ভাবে চাহিতেছেন ঠিক সেই ভাবে পাইতেছেন না বলিয়া ক্রন্দন করিতেন। প্রত্যহ এইরূপ করিতে করিতে তাঁহার কল্পনা ক্রমে উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তৎকারণ বশতঃ তিনি সময়ে সময়ে সমাধিস্থ হইতেন। তাঁহার পিতামাতা পুত্রের এই অবস্থা দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন এবং বিবাহ দিয়া তাঁহাকে সংসারসমুদ্রের আবর্ত্তে ফেলিয়া দিলে তিনি প্রকৃতিস্থ হইবেন স্থির করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা রামকৃষ্ণকে স্বগ্রামে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহার কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত একটী পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকার সহিত বিবাহ দিলেন। এই বালিকাটী দেব ভাবাপন্ন বলিয়া রামকৃষ্ণের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

তিনি বলিতেন যে স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের মধ্যে কেহ কেহ দেব-ভাবাপন্ন ও কেহ বা আসুরিক ভাবাপন্ন এবং কে কোন ভাবাপন্ন তাহা তাহাকে দেখিলেই জানিতে পারা যায়। একদা একটী সম্ভ্রান্ত বংশীয়া স্ত্রীলোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন ইনি দেব ভাবাপন্না, এবং তাঁহার বাক্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করিবার জন্য শিষ্যমণ্ডলীর সম্মুখে এই স্ত্রীলোকটীকে পুষ্পচন্দন দিয়া অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকটী এই অর্চ্চনার ফলে সমাধিস্থ হইয়া তাঁহাদিগের দিকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় যেরূপে হস্ত প্রসারণ করিতে হয় সেইরূপে হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ বিবাহের পর পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে মাতার নিকট আসিলেন ও পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার পূজা বন্দনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্বের ভাব কিঞ্চিন্মাত্রও না কমিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পূজা করিবার সময় চিন্তা করিতে হয় উপাস্যদেবতা হইতে তাঁহারা বিভিন্ন নহেন; রামকৃষ্ণ এই চিন্তায় এত বিভোর ও আত্মহারা হইতেন যে তিনি পূজার জন্য আহরিত পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা নিজ অঙ্গ ভূষিত করিতেন। রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বাবু তাঁহার এই ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু সে তিরস্কারে কিছুমাত্র ফল হয় নাই। মথুরানাথ বাবু পরে স্বপ্ন দেখেন যে রামকৃষ্ণ সাধারণ মনুষ্য নহেন। তিনি সেই সময় হইতে তাঁহাকে শিবজ্ঞানে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন ও পৌরহিত্য কার্য্যে রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র হৃদয়কে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে ইচ্ছামত কার্য্য করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন।

এই সময় রামকৃষ্ণ দ্বাদশ বৎসর কাল কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েন। এই সুদীর্ঘ সময়টা তাঁহার অতিশয় কষ্টে কাটিয়াছিল। তিনি ক্ষণেকের নিমিত্তও শান্তি উপভোগ করিতে পারেন নাই। এমন এক সময় উপস্থিত হইয়াছিল যখন তাঁহার শরীরের মধ্যে একটা ভয়ানক জ্বালা বোধ হওয়াতে তাঁহার মনে হইত যেন তিনি দিবারাত্রি তপ্ত অঙ্গারে পুড়িতেছেন। সমস্ত দিন সিক্তবসন দ্বারা মস্তক আবৃত রাখিয়া তিনি গঙ্গায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া থাকিতেন কিন্তু তাঁহার যন্ত্রণার অবসান হইত না। তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা উপযুক্ত বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসা করাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যান। চিকিৎসকেরা ব্যাধির নিরাকরণ করিতে পারেন নাই, কাজেই নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ সত্ত্বেও তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অবশেষে ঢাকার একজন বৈদ্য বলিলেন রামকৃষ্ণ ব্যাধিগ্রস্ত নহেন, তিনি একজন প্রকৃত যোগী, আয়ুর্ব্বেদোক্ত অথবা অন্য চিকিৎসা শাস্ত্রোক্ত কোন ঔষধেই তাঁহার ব্যারামের প্রতিকার হইবে না।

এই সময়ে একটী ব্রাহ্মণ স্ত্রীলোক দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই বলেন তিনটী যোগীর উপকার সাধন তাঁহার জীবনের ব্রত; এই তিন জনের মধ্যে দুই জনের সাক্ষাৎকার লাভ ইতঃপূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল, তৃতীয় ব্যক্তির সহিত অদ্য সাক্ষাৎ হইল। রামকৃষ্ণকে দেখিয়াই স্থির করিলেন যে

সাধারণতঃ লোকের যেরূপ ব্যাধি হইয়া থাকে তাঁহার ব্যাধি সে প্রকৃতির নহে। শ্রীরাধা ও শ্রীচৈতন্য এই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ঈশ্বরের বিরহ এ ব্যাধির কারণ এবং ইহার প্রকৃত ঔষধ পুষ্পমাল্যধারণ ও চন্দনলেপন। তিনি রামকৃষ্ণের প্রতি এই ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে অচিরাৎ রোগমুক্ত করিলেন ও যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে নানাপ্রকার শিক্ষা দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দিনপরে রামকৃষ্ণের তোতাপুরী নামক বৈদান্তিক যোগীর সাক্ষাৎ লাভ হয়। তোতাপুরী তাঁহাকে গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট দেখিয়া উপযুক্ত শিষ্য বিবেচনায় জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি তাঁহার নিকট হইতে যোগশাস্ত্র শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন কি না। রামকৃষ্ণ "মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আপনাকে বলিব" বলিয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন ও কিয়ৎকাল পরে প্রত্যাগত হইয়া বলিলেন তিনি যোগ শিক্ষা করিবেন। তোতাপুরী তাঁহাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি শিক্ষা করাইলেন। রামকৃষ্ণের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া তিনি যার পর নাই আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। যে শিক্ষা তিনি চত্বারিংশ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া লাভ করিয়াছিলেন তাহা রামকৃষ্ণ তিন দিনে আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন।

তোতাপুরী প্রস্থান করিলে নির্ব্বিকল্প সমাধি অভ্যাস করিতে করিতে রামকৃষ্ণ একদিন রক্ত বমন করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার এক আত্মীয়ের সহিত কোন সূত্রে কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য হওয়াতে সেই আত্মীয় তোমার অচিরাৎ রক্তস্রাব হউক বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তির বাক্‌সিদ্ধি আছে বলিয়া প্রসিদ্ধি ছিল। রামকৃষ্ণ এই ব্যাপার স্মরণ করিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন। এমন সময় এক মহাপুরুষ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে তাঁহার কোন ভয় নাই, ঈশ্বর তাঁহাকে লোকহিতব্রতে নিয়োগ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার রক্তস্রাব হইল, রক্তস্রাব না হইলে তিনি অনন্তকাল সমাধিস্থ হইয়া থাকিতেন ও মরজগতের কোন উপকারেই আসিতেন না।

দ্বাদশ বৎসরকাল কঠোর তপস্যার পর রামকৃষ্ণ অভূতপূর্ব্ব শান্তিলাভ করিলেন। এখন আর তাঁহার ভেদজ্ঞান পরিলক্ষিত হইত না। যে সাধুপুরুষ তাঁহাকে নির্ব্বিকল্প যোগশিক্ষা দেন, তিনি একদিন তাঁহার সম্মুখস্থিত অগ্নিস্তূপ হইতে অপর এক ব্যক্তি অগ্নি গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। পরমহংস তাঁহাকে বেশ সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে ক্রোধ প্রদর্শন করা তাঁহার উচিত হয় নাই। ভেদজ্ঞানের তিরোভাব

হেতুই অপরে কেহ তাঁহাকে গুরু বলিয়া বন্দনা করিলে তিনি বড় কুণ্ঠিত হইতেন। কেবল যখন তিনি সমাধিস্থ হইতেন সেই সময়ে তাঁহার আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান হইত।

তাঁহার স্ত্রীর বয়ঃক্রম যখন সপ্তদশ কিম্বা অষ্টাদশ বৎসর তখন তিনি পদব্রজে বিংশ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে দক্ষিণেশ্বরে আইসেন। রামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার সে অবস্থায় কোন স্ত্রীলোককে পত্নী বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। চিন্তামণি দেবী বলিলেন তিনি পারিবারিক সুখ সচ্ছন্দতার অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকট আসেন নাই, তিনি কেবল মাত্র তাঁহার পদসেবা করিবার অভিলাষী, তাঁহার আহারীয় প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্য সমূহ করিবেন ও চরণপ্রান্তে বসিয়া জ্ঞান এবং ভক্তি শিক্ষা করিয়া জীবন চরিতার্থ করিবেন। রামকৃষ্ণ প্রীত হইয়া স্ত্রীকে আপনার নিকট থাকিতে অনুমতি দিয়া কৃতার্থ করিলেন।

কেশবচন্দ্র সেন দক্ষিণেশ্বরের অনতিদূরে ঈশ্বরের প্রীতিকর কার্য্য সকল সাধিত করিবার অভিপ্রায়ে নির্জ্জনে বাস করিতেছিলেন অবগত হইয়া রামকৃষ্ণ তাঁহার সহিত একদিন সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। উভয়ে উভয়ের সহিত আলাপ করিয়া অতিশয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। কেশব এই সময় হইতে প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট আসিতেন। তাঁহার নববিধান রামকৃষ্ণের সহিত ধর্ম্মালোচনারই ফল।

রামকৃষ্ণ মথুরানাথ বাবুর সহিত তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়া প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান গুলির সাধুপুরুষদিগের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। বারাণসীর তৈলঙ্গ স্বামী, বৃন্দাবনের গঙ্গামাতা প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তীর্থপর্য্যটনকালে বৈদ্যনাথের সন্নিকটস্থ এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন যে তথাকার অধিবাসীগণ অতিশয় নিঃস্ব। তাহাদিগের অন্নবস্ত্রের অভাব দূর না হইলে তিনি সে স্থান হইতে যাইবেন না সঙ্কল্প করিলেন। মথুরাথনাথ বাবু গ্রামের প্রত্যেককেই বস্ত্র দিয়াছিলেন ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোজন করাইয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণের কতকগুলি অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। তিনি যখন যাহা ইচ্ছা করিতেন তাহাই পাইতেন। একদা দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে এক নিভৃত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া মনে করিলেন যদি উপাদান পাই তাহা হইলে এই স্থানটীতে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া নির্জ্জনে সাধনা করিয়া জীবন সার্থক করি। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার মনের মত কুটীর নির্ম্মাণোপযোগী রশি, বাঁশ প্রভৃতি উপাদান সমূহ প্রবাহ বাহিত হইয়া তটে আসিয়া লাগিল। রাণী রাসমণির দুহিতাদ্বয়ের তাঁহার আশ্রমে আগমন সম্বন্ধেও এইরূপ একটা গল্প শ্রুত হওয়া যায়।

তাঁহার আর একটী অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি যাহাকে স্পর্শ করিতেন তাহার চিন্তাস্রোত চিরদিনের জন্য ফিরিয়া যাইত। অপবিত্রমণা ব্যক্তিবর্গ তাঁহার কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে তাহাদের হৃদয় পবিত্রতায় আপ্লুত হইত।

মণিকাঞ্চনের উপর তিনি আজীবন বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। মথুরানাথ বাবু একদা তাঁহাকে পঞ্চবিংশতি সহস্র রৌপ্যমুদ্রা দান করিতে চাহিলে তিনি কোন মতেই তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। অপর এক সময়ে তিনি রামকৃষ্ণকে একখানি বহুমূল্য শাল উপহার দিলে পরমহংস প্রীত হইলেন দেখিয়া তাঁহার বড় আনন্দ হইল, কিন্তু পরমূহূর্ত্তে রামকৃষ্ণ শালখানি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যবর্গকে বলিতেন যে তিনি প্রথমাবস্থায় গঙ্গাতীরে ধূলা এক হস্তে ও মুদ্রা অপর হস্তে লইয়া বলিতে থাকিতেন "মুদ্রা ধূলা, মুদ্রা ধূলা" ও পরক্ষণেই এই দুই বস্তু একত্রে মিশ্রিত করিয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিতেন। শেষ দশায় তাঁহার এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল যে স্বর্ণ বা রৌপ্য এমন কি লৌহ স্পর্শ করিলে তাঁহার হস্ত কিছুক্ষণের নিমিত্ত স্পন্দিত হইতে থাকিত।

এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে দেখান হইয়াছে যে তিনি ব্রহ্মণ্যগৌরবপূর্ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে যে ব্রাহ্মণ স্ত্রীলোকের কথা উক্ত হইয়াছে, তাঁহার ও তোতাপূরীর নিকট তিনি যোগশিক্ষা করেন। ইহার পর তিনি চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম অভ্যাস করিয়াছিলেন। তিনি অনেক সময়ে শ্রীরাধা অথবা শ্রীচৈতন্যের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদিগের চক্ষে দর্শন করিতেন। মহম্মদ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মও তিনি অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং যীশু প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অভ্যাস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিন দিন ধরিয়া তিনি কেবলমাত্র যীশুখ্রীষ্টের এবং তাঁহার অমানুষিক প্রেমের বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন।

রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক যে সমস্ত কবিতা ভক্তগণ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে

সেগুলি সাধারণ লোকের পাঠ করা বিধি নহে বলিয়া তাঁহার মত ছিল। তিনি বলিতেন যতদিন পর্য্যন্ত ব্রজকিশোরী অথবা নবদ্বীপচাঁদের ভাবে আমরা অনুপ্রাণিত হইতে না পারি, ততদিন পর্য্যন্ত ঐ কবিতাগুলি আমাদের মনে কুভাবের বীজ বপন করিতে পারে।

শ্রীপ্রাণধন ভড়।

কে আমায় ভালবাসে।

(১)

জগতের এক কোণে আছি দীনহীন
যাতনায় কাঁদি নিশিদিন ;
যত্ন আশে ফিরে চাই কেন না সান্ত্বনা পাই ?
কেন এই দুরাশ নিরাশ ?
হতাশ—আশ্বাস দাও, কর দয়া ফিরে চাও ;
কাছে এস কেবা ভালবাস !

(২)

মুখের ও ভালবাসা কপট মমতা
জুড়াবেনা হৃদয়ের ব্যথা ;
ছল ওই আঁখিজল ভাসাবেনা হৃদিতল,—
এ হৃদয় কঠোর কঠিন ;
স্বার্থে ঢাকা দয়া মায়া জুড়াবেনা জীর্ণকায়া ;
নাহি চাহি সোহাগ মলিন !

(৩)

সত্য যদি ভালবাস আনহ হৃদয়
দেখিব ও কিরূপ প্রণয় !
দেখিব নিঃস্বার্থ কিনা ; সমস্বরে হৃদিবীণা
একতারে বাজেবা কেমন ;

নহে কেন মিছা আর, ছিঁড়ে ফেল হৃদি-তার,
নাহি চাহি বেসুর জীবন !

(৪)

বিশাল ধরার মাঝে এমন কি নাই
হৃদয়ের হৃদি-যেথা পাই ?
এ জীবন দাবানলে সিঞ্চিয়া প্রেমের জলে
জুড়াইব হৃদয়-পিয়াস,
এমন যদ্যপি নাই— তবে এ সংসার ছাই ;
মিছে কেন করি হেথা বাস ?

(৫)

আজীবন কপটতা ঘিরেছে আমায়
হৃদয়েরে জ্বালাইতে চায় ;
হৃদয় রে ! কতকাল সহিবি রে এ জঞ্জাল,
বহিবি এ বিষাক্ত নিশ্বাস ?
কপট মায়ায় আর ভুলাওনা বারবার,
এস কেবা সত্য ভালবাস।

(৬)

বিশাল জগৎ মাঝে কিবা আছে একা ?
জড়েও সে প্রণয়ের দেখা !
আমি যে জগৎ যুড়ি হৃদয় খুঁজিয়া মরি,
নাহি পাই খুঁজি কতকাল ;
খুঁজিতে খুঁজিতে হায় জীবন বহিয়া যায়,
বল বল কেবা বাস ভাল !

(৭)

কাঁদাওনা আর মোরে এস নামি হেথা
কোথা হৃদি ! আছ তুমি কোথা ?
হৃদয়ে হৃদয় মিশে ঘুরিব প্রণয়াবেশে ;
একতানে সম্পদে বিপদে

গাহিব জীবন গান, একীভূত দু'টী প্রাণ
জল যথা গাঁথা জলে নদে!

(৮)

শূন্য হৃদয়ের মাঝে শূন্য আশাগুলি
ভাসিতেছে নিজ সুখ ভুলি!
নিদাঘে দিবার বুকে যথা ভাসে মহাদুঃখে
কাদম্বিনী সুগম্ভীর ভাষ।
তেমতি নিরস আশ আমার রে বারমাস;—
এস এস কেবা ভালবাস।

শ্রীনিতাইচাঁদ শীল।

মৃত্যুর পর।

কুম্ভক, সমাধি ও রাজযোগ।

আমরা প্রসঙ্গ ক্রমে অনেকবার "রাজযোগ" শব্দ উচ্চারণ করিয়াছি। এক্ষণে রাজযোগ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছি। "রাজ" শব্দ শ্রেষ্ঠত্ব বাচক যেমন হংস—রাজহংস তেমনি যোগ—রাজযোগ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যোগ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ৪ প্রকার যোগ আছে হট, মন্ত্র, লয় ও রাজযোগ ইহার মধ্যে অর্থাৎ এই সকলের মধ্যে রাজযোগই শ্রেষ্ঠ। হট যোগ দেহ শাসনে আনে, রাজযোগে মনকে প্রাণকে শাসনে আনে। যাঁহারা হট যোগ সাধন করিয়া মনে করেন আমাদের যোগের সমাপ্তি হইয়াছে আমাদের বিবেচনায় তাঁহাদের বুদ্ধিরও সমাপ্তি হইয়াছে। যোগীগণ শাস্ত্রকারগণ হট যোগকে রাজযোগের উপায় স্বরূপ বলিয়াছেন। হট যোগ যেন সোপান শ্রেণী রাজযোগ যেন দ্বিতলের গৃহ। যোগীগণ আবার ইহাও বলিয়াছেন যে হট যোগ বিনা রাজযোগ হয় না এবং রাজযোগ বিনাও হট যোগ হয় না। এ কথাও সত্য। কারণ যোগীগণ হটযোগের সঙ্গে রাজযোগ কতক কতক মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন অর্থাৎ যথা যথা ধ্যান বিধি আছে। আবার রাজযোগও হট আশ্রয় করিয়াছেন কেন না যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধ্যান

ধারণা ও সমাধি গ্রহণ করিয়াছেন। পাঠ ও ভাবী যোগীকে সাবধান করিয়া দিবার জন্যই আমরা এ কথা খুলিয়া বলিলাম। রাজ যোগই শ্রেষ্ঠ যোগ ইহার উপর আর যোগ নাই এই মত সর্ব্ববাদী সম্মত হইলেও শিবসংহিতায় রাজযোগের পর রাজাধিরাজ যোগ বলিয়া আর একটি যোগের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে যথাসময়ে আমরা তাহা বিবৃত করিব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ঘেরণ্ডসংহিতা শিবসংহিতা প্রভৃতি হট যোগ নিরূপক গ্রন্থ কিন্তু এই ঘেরণ্ডই রাজযোগ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন।—

আদীশ্বরায় প্রণমামি তস্মৈ
যেনোপদিষ্টা হটযোগবিদ্যা।
বিরাজতে প্রোন্নতরাজযোগ
মারোঢ়ুমিচ্ছন্ বিধিযোগ এব॥

হটযোগ বিদ্যার যিনি উপদেষ্টা সেই আদীশ্বর ভগবান্ ভবানীপতিকে প্রণাম করি। উপদিষ্ট এই হটযোগ উন্নত রাজযোগ আরোহণের সোপান স্বরূপ বিরাজ করিতেছে।

প্রচলিত প্রথামত ৪ প্রকার যোগ উক্ত হইল কিন্তু কোন কোন গ্রন্থকারের মতে যোগ দুই প্রকারের অভাবযোগ ও মহাযোগ। অভাব যোগে যোগী আপনাকে শূন্য ও সর্ব্ব প্রকার গুণ শূন্য মনে করিয়া চিন্তা করেন। আর মহাযোগে যোগী আপনাকে আত্মা ও পূর্ণ ব্রহ্মের সহিত অভেদ মনে করিয়া চিন্তা করেন।

রাজযোগ কি জানিতে হইলে এই সকল গ্রন্থ দেখিতে হইবে। পাতঞ্জল যোগসূত্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, যোগি যাজ্ঞবল্ক্য, কূর্ম্মপুরাণ; ঘেরণ্ডসংহিতা ও শিবসংহিতায় প্রসঙ্গ ক্রমে রাজযোগের কথা বলা হইয়াছে।

ঘেরণ্ড সংহিতা বলিয়াছেন—

মনোমূর্চ্ছাং সমাসাদ্য মন আত্মনি যোজয়েৎ
পরাত্মনঃ সমাযোগাৎ সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ॥

"মনোমূর্চ্ছা" নামক কুম্ভক অনুষ্ঠান করিয়া সাধক আপনার মনকে পরমাত্মায় সংযুক্ত করিবে। এইরূপে মন ও পরমাত্মার সংযোগ বশতঃ সমাধি হইয়া থাকে। ইহাকেই রাজযোগ সমাধি কহে।

ঘেরণ্ড কয়েক প্রকার সমাধির উল্লেখ করিয়াছেন, ধ্যানযোগ সমাধি,

নাদযোগ সমাধি, রসানন্দযোগ সমাধি, লয় সিদ্ধিযোগ সমাধি, ভক্তিযোগ সমাধি এবং রাজযোগ সমাধি। শাম্ভবী মুদ্রা দ্বারা ধ্যান যোগ সমাধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, খেচরী মুদ্রা অবলম্বনে নাদ যোগ সমাধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভ্রামরী কুম্ভক অবলম্বনে রসানন্দ যোগ সমাধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভক্তি অবলম্বনে ভক্তি যোগ সমাধি, যোনি মুদ্রা অবলম্বনে লয় সিদ্ধি যোগ সমাধি এবং মনোমূর্চ্ছা কুম্ভক অবলম্বনে রাজযোগ সমাধি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ব্বে আমরা সমাধির প্রকার দেখাই নাই। এখন একটু রাজযোগের কথা থাকুক। আমরা একটু পিছাইয়া গিয়া কুম্ভক ও সমাধির কথাটা একটু বলি তার পর রাজযোগের কথা বলিব। নহিলে সমাধির প্রকার বুঝা যাইবে না। আর রাজযোগেও যখন যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি আছে।

সহিত কুম্ভক।

বায়ু ধারণের নাম কুম্ভক, প্রাণায়ামে বায়ু ধারণ করিতে হয়। প্রথমে পূরক, পরে কুম্ভক, পরে রেচক। বীজ মন্ত্র শূন্য যে প্রাণায়াম তাহাকে নিগর্ভ ও বীজযুক্ত প্রাণায়ামকে সগর্ভ প্রাণায়াম বলে। সেইরূপ কুম্ভকও দুই প্রকার সগর্ভ ও নিগর্ভ অর্থাৎ বীজযুক্ত কুম্ভক ও বীজশূন্য কুম্ভক। কুম্ভক ঘেরণ্ডের মতে ৮ প্রকার—১। সহিত, ২। সূর্য্যভেদ, ৩। উজ্জারী, ৪। শীতল, ৫। ভস্ত্রিকা, ৬। ভ্রামরী, ৭। মূর্চ্ছা ও ৮। কেবল বা কেবলী কুম্ভক।

সগর্ভ প্রাণায়াম এইরূপে করিবে। পূর্ব্ব বা উত্তর মুখ হইয়া সুখাসনে বসিবে, ও উড্ডীয়ান বন্ধ করিবে। রজোগুণাত্মক রক্তবর্ণ অকাররূপী ব্রহ্মাকে ধ্যান করিয়া অং এই বীজ সাধক ১৬ বার জপ করিতে করিতে বাম নাসাপুটে বায়ু পূরণ করিবে। তার পর উধার রূপী সত্ত্বগুণযুক্ত কৃষ্ণ বর্ণ হরির ধ্যান করত উং বীজ জপ করিতে করিতে অর্থাৎ ৬৪ বার উং জপ করিতে করিতে বায়ু ধারণ করিয়া কুম্ভক করিবে, তারপর তমোগুণযুক্ত মকার রূপী মহেশ্বর ধ্যান করিয়া ৩২ বার মং বীজ জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাশা পুটে বায়ু রেচন করিবে, তার পর ঐরূপ বীজ পূর্ব্বোক্ত সংখ্যক বার জপিতে জপিতে দক্ষিণ নাসায় বায়ু পূরণ ও পরে কুম্ভকে ধারণ ও পরে বাম নাসায় রেচন করিবে। এইরূপে ক্রমাগত অনুলোম বিলোম ক্রমে প্রাণায়াম কর।

যখন কুম্ভক করিবে তখন বাম নাসা কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা ও দক্ষিণ নাসা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিবে। প্রাণায়াম ৩ প্রকার (মাত্রানুসারে) ২০ মাত্রায়—উত্তম প্রাণায়াম, ১৬ মাত্রায় মধ্যম আর ১২ মাত্রায় অধম। অধমে ঘর্ম্ম হয় মধ্যমে মেরুদণ্ড কম্প অর্থাৎ মেরু মধ্যস্থ নাড়ী কম্প (এই নাড়ী গুহ্য হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত) হয়। উত্তম প্রাণায়ামে সাধক আসন বা ভূমি ত্যাগ করিয়া শূন্যে উঠিতে পারেন। প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে সাধকের খেচরী সিদ্ধ হয় অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলে গগণ বিহারী হইতে পারেন। তিনি নীরোগ হন তাঁহার পরাশক্তি জাগরিত হওয়ায় তাঁহার দিব্য জ্ঞান সুখ ও আনন্দ লাভ হয়। প্রাণায়ামের সহিত কুম্ভক বলিয়া ইহার নাম বোধ হয় সহিত কুম্ভক।

সূর্য্য ভেদ কুম্ভক।

জালন্ধর বন্ধ কর দক্ষিণ নাসায় বায়ু পূরণ কর; যতক্ষণ কেশ ও নখ হইতে না ঘর্ম্ম নির্গত হয় ততক্ষণ কুম্ভক কর। কুম্ভকের সময় প্রাণাদি বায়ুকে পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা ভিন্ন করত নাভিমূল হইতে সমান বায়ুকে তুলিতে হইবে।

[বায়ু ৫টী বহিঃস্থ ও ৫টী অন্তরস্থ প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান অন্তরস্থ। নাগ কূর্ম্ম কৃকর দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় বহিঃস্থ। হৃদয়ে প্রাণ, গুহে অপান, নাভিতে সমান, কণ্ঠে উদান, আর সমস্ত দেহে ব্যান বায়ু প্রবাহিত। উদ্গারে নাগ, উন্মীলনে কূর্ম্ম, ক্ষুৎকারে (হাঁচি) কৃকর, জৃম্ভনে দেবদত্ত, আর ধনঞ্জয় সর্ব্বদেহে প্রবাহিত। ধনঞ্জয় বায়ু মৃত দেহেও থাকে।]

পরে বাম নাসা দ্বারা রেচন করিবে, পুনরায় দক্ষিণ নাসায় পূরণ করিবে, সুষুম্নায় কুম্ভক করিয়া বাম নাসায় রেচন কর বারম্বার এইরূপ কর। ইহাই সূর্য্য ভেদ কুম্ভক। ইহা দ্বারা জরার ধ্বংস হয় ও কুলকুণ্ডলিনী জাগরিতা হন।

উজ্জারি কুম্ভক।

বহিঃস্থ বায়ু নাসাদ্বয় দ্বারা এবং অন্তঃস্থ বায়ু হৃদয় ও গলদেশ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া বদনে ধারণ করিয়া কুম্ভক কর পরে মুখ প্রক্ষালন করিয়া জালন্ধর মুদ্রার আচরণ কর। ইহাই উজ্জারী, ক্ষয় কাশ, কফ, জ্বর, প্লীহা, অজীর্ণ আমবাত এই সব রোগ এই কুম্ভক দ্বারা দুরীভূত হয়।

শীতলী কুম্ভক।

জিহ্বা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ কর ও কুম্ভক দ্বারা উদর পূর্ণ কর ক্ষণ কাল ধারণের পর নাসিকা দ্বারা রেচন কর। ইহাই শীতলী; অজীর্ণ, শ্লেষ্মা ও পিত্ত জাত রোগ বিনষ্ট হয়।

ভস্ত্রিকা।

কামারের জাঁতা (ভস্ত্রিকা) দ্বারা যেমন বায়ু আকর্ষণ হয় সেইরূপ নাসা দ্বারা কর। ২০ বার এইরূপ করিয়া কুম্ভকে বায়ু ধারণ কর। পরে আবার নাসা দ্বারা বায়ু রেচন কর ভস্ত্রিকার ন্যায় রেচন করিবে। ইহাই ভস্ত্রিকা ইহা তিনবার করিয়া করিতে হয়—করিলে কোন রোগ হয় না।

ভ্রামরী কুম্ভক।

দুই প্রহর রাত্রি গত হইলে সাধক নিঃশব্দ স্থানে যাইবেন। সাধক স্বীয় হস্ত দ্বারা কর্ণদ্বয় বন্ধ করিয়া পুরক ও রেচন করিবে। এইরূপ করিলে দক্ষিণ কর্ণে নানা প্রকার শরীর মধ্যস্থ শব্দ শুনা যাইবে। যথা, প্রথমে ঝিল্লীরব, পরে বংশী শব্দ পরে মেঘের শব্দ ঝর্ঝরী বাদ্য ধ্বনি পরে অলি দলের গুন গুন শব্দ, শেষে ঘণ্টা কাঁসর, তুরী ভেরী, মৃদঙ্গ, আনক, দুন্দুভি ইত্যাদি বাদ্য ধ্বনি শুনা যাইবে। পরে হৃদয় মধ্যস্থ অনাহত পদ্মের দ্বাদশ দল মধ্য হইতে উত্থিত শব্দ ও তাহার প্রতিধ্বনি কর্ণে শুনা যাইবে। তখন চক্ষু বুজিলেই সাধক সেই অনাহত পদ্মের মধ্যস্থ প্রতিধ্বনির মধ্যে জ্যোতি দর্শন করিবেন। সেই জ্যোতি পরব্রহ্ম যোগীর চিত্ত সেই ব্রহ্মে লয় পাইলেই ভ্রামরী কুম্ভক সিদ্ধ হয় এই কুম্ভক সিদ্ধির পরেই সাধকের সমাধি সিদ্ধি হয়।

মূর্চ্ছা কুম্ভক।

প্রথমে ভ্রামরী কুম্ভক কর। তার পর চিত্তবৃত্তি নিরোধ করত ভ্রূ মধ্যে আজ্ঞা চক্রস্থ শুভ্র পথে চিত্ত সংযোজিত কর ও সেই পথ মধ্যস্থ পরমাত্মায় মনের লয় কর। ইহাতে পরমানন্দের উদ্ভব হইবে। ইহাই মূর্চ্ছাকুম্ভক।

কেবল বা কেবলী কুম্ভক।

নিশ্বাস বাহিরে যাইতে হং ও ভিতরে যাইতে সঃ এই শব্দ হয়। জীবে না জানিয়া অহরহ হংসঃ হংসঃ বলিতেছে অর্থাৎ সোহহং সোহহং বলিতেছে ইহাকে

এইজন্য অজপা জপ বলে। রামপ্রসাদের ষট্চক্রের গানে আছে—অজপা হইলে রোধ তবে জন্মে তার বোধ গুঞ্জে মত্ত মধুরত স্বরে গো, তারা আছ মা অন্তরে। ২১৬০০ বার, দিন রাত্রিতে, জীব এই জপ করিতেছে। হংস জপের স্থান জীব দেহে হইতেছে মূলাধার অনাহত পদ্ম আর নাসা যুগল বা যোগের ভাষায় ইড়া পিঙ্গলা নাড়ী। স্বাভাবিকে এই নিশ্বাস ১২ অঙ্গুলি বাহিরে যায়। শয়নে ১৬, আহারে ২০, পর্য্যটনে ৪০, নিদ্রায় ৩০, মৈথুনে ৩৬ ব্যায়ামে ইহা অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। স্বাভাবিক বহির্গমন ১২ আঙ্গুলের কম করিতে পারিলে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। জীব যত দিন জীবিত থাকে (অর্থাৎ দেহে যত দিন প্রাণ বায়ু থাকে) ততদিন অজপা জপ হয়। প্রাণ বায়ু শরীর মধ্যে গমন করিলেই কেবল কুম্ভক হয় অর্থাৎ যে কুম্ভকে রেচক পুরক নাই এমন "কেবল" কুম্ভক হয়। নাসাদ্বয় দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া কেবল কুম্ভক করিবে। প্রথম দিন ১ হইতে ৬৪ বার এই কুম্ভক করিবে। প্রতিদিন আট প্রহরে আট বার করিবে। না হয় পাঁচ বার করিবে প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় শেষ রাত্রিতে। যত দিন না কেবল কুম্ভক সিদ্ধ হয় অজপার পরিমাণ এক বা পাঁচ বার, ক্রমে বৃদ্ধি করিবে। ইহা সিদ্ধ হইলে সাধক প্রকৃত যোগীহন এবং ভূতলে তাঁহার অসাধ্য কোন কার্য্যই থাকে না।

প্রাণায়াম উত্তমরূপ অভ্যাস হইলে পরে কুম্ভক অভ্যাস করিতে হয়। আবার কুম্ভক উত্তম রূপ অভ্যাস হইলে সমাধি অভ্যাস করিতে হয় কিন্তু কুম্ভকের পরও সমাধির পূর্ব্বে যোগীগণ ধ্যানের উপদেশ দেন। যোগি যাজ্ঞবল্ক্য হইতে আমরা পূর্ব্বেই ধ্যানের বিবিধ প্রকার প্রদর্শন করিয়াছি। এক্ষণে ঘেরণ্ড হইতেও ধ্যানের স্বরূপ স্থুলভাবে প্রদর্শন করিতেছি। ঘেরণ্ড মতে ধ্যান দুই প্রকার স্থুল ও সূক্ষ্ম। তাঁহার মতে স্থুল ধ্যানের পর জ্যোতির্ধ্যান করিবে ও পরে সূক্ষ্ম ধ্যান করিবে। স্থুল ধ্যান হইতে জ্যোতির্ধ্যান শত গুণে শ্রেষ্ঠ আবার জ্যোতির্ধ্যান হইতে সূক্ষ্ম ধ্যান লক্ষ গুণে শ্রেষ্ঠ। স্থুল ধ্যান দুই প্রকারের (১) সাধকের নিজ হৃদয়ে অমৃত সাগরের মধ্যে রত্নদ্বীপে কল্পবৃক্ষেমূলে মহামাণিক্য নির্ম্মিত মণ্ডপে পর্য্যঙ্কের উপর গুরূপদেশ অনুসারে স্বীয় ইষ্ট দেবতার বসন ভূষণ বাহনাদি সমেত চিন্তা। (২) দ্বিতীয় ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রার মহাপদ্মের মধ্যস্থলে উহার নদবিন্দুময় পীঠে দুইটি হংস এবং পাদুকা ও দ্বিভুজ দ্বিনেত্র শ্বেতাম্বর-ধারী বামে রক্তবর্ণাশক্তি সহ শোভিত গুরুর ধ্যান।

এক্ষণে প্রথম স্থূলধ্যানটির একটু বিশদ বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে। হৃদয়ে অমৃতময় সাগর কল্পনা করিবে তাহাতে একটি রত্নময় দ্বীপ আছে সে দ্বীপের বালুকা-কণা-গুলি পর্য্যন্ত রত্নময় ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। দ্বীপের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কুসুম বিকসিত কদম্বতরু পরম রমণীয় শোভা বিস্তার করিতেছে। কেবল মাত্র কদম্বতরু নহে আরও বকুল, চম্পক, নাগকেশর স্থলপদ্ম পারিজাত মল্লিকা মালতী জাতী যূথী প্রভৃতি কুসুমিত তরুরাজিও লতা কদম্বের সৌরভে দশদিক আমোদিত ও অপূর্ব্ব শোভাময়। এই রত্নময় দ্বীপের মধ্যস্থলে একটি মনোরম কল্পপাদপ তাহার চারিটী শাখা চারি বেদময় ও ফল পুষ্প ভারে অবনত ও সুরভিময়। মধুব্রতগণ সুগন্ধে মত্ত হইয়া গুণ গুণ রবে গুঞ্জন করত ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া শাখা ও পুষ্পে বসিতেছে অলিগুঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আবার শাখাসীন কোকিলের রব আছে। এই কল্পতরু মূলে মহামাণিক্য নির্ম্মিত একটি মণ্ডপ সেই মণ্ডপে একটি পর্য্যঙ্ক তাহাতে সাধকের অভীষ্ট দেবতা স-ভূষণ-বাহন বিরাজ করিতেছেন। সাধক এইরূপ ধ্যান করিবেন।

দ্বিতীয় ধ্যান।

ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রার মহাপদ্ম মধ্যে আর একটি শ্বেতবর্ণ দ্বাদশ দল পদ্ম চিন্তা করিবে উহার দ্বাদশটী দলে দ্বাদশটি বীজ যথাক্রমে বিন্যস্ত হ স ক্ষ ম ল ব র য়ুং হ স খ ফ্রেং। ইহার কর্ণিকাতে অ ক থ এই বর্ণত্রয়ে রেখাত্রয় * এবং হ ল ক্ষ এই বর্ণ ত্রয়ে সংলগ্ন রহিয়াছে এবং মধ্যস্থলে প্রণব (ওঁ) বিদ্যমান। ঐ স্থলে নাদবিন্দুময় একটি পীঠ শোভিত ঐ পীঠের উপরে দুইটি হংস ও পাদুকা বিদ্যমান এবং ঐ স্থানে সাধকের গুরুদেব বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার বাম ভাগে রক্তবর্ণাশক্তি ও গুরুদেব স্বয়ং শুক্লাম্বরধারী, শ্বেতবর্ণ পুষ্পমাল্য শোভিত শ্বেতবর্ণ চন্দনলিপ্ত এবং দ্বিভুজ দ্বিনেত্র, এই ধ্যানই স্থূলধ্যান।

অনন্তর স্থূলধ্যানের পর সাধক জ্যোতিঃ ধ্যান করিবেন। ইহাও দুই প্রকারের। (ক) মুলাধারে অর্থাৎ লিঙ্গমূল ও গুহ্য দেশের মধ্যস্থলে সর্পাকৃতি কুলকুণ্ডলিনী বিরাজ করিতেছেন। জীবের জীবাত্মার এই স্থানে অবস্থিতি জীবাত্মার আকৃতি দীপ কলিকার ন্যায়। এই স্থানে জ্যোতিরূপী ব্রহ্মের যে ধ্যান সাধক করেন তাহাকেই জ্যোতিধ্যান বা তেজোধ্যান কহে। (খ) ভ্রূদ্বয়

* শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রীর অনুবাদ হইতে সংগ্রহ।

মধ্যে ও মনের উর্দ্ধভাগে প্রণবাত্মক শিখা-বেষ্টিত যে জ্যোতি বা তেজ, ব্রহ্ম জ্ঞানে তাহার ধ্যান।

সূক্ষ্ম ধ্যান।

কুণ্ডলিনী ধ্যানকে সূক্ষ্ম ধ্যান কহে। ঘেরণ্ড মতে শাম্ভবীমুদ্রা আচরণ করিয়া কুণ্ডলিনী ধ্যান করিতে হয়।

ঘেরণ্ড মতে সমাধি।

সমাধি ছয় প্রকার (১) ধ্যান যোগ সমাধি (২) নাদ যোগ (৩) রসানন্দ যোগ (৪) লয় সিদ্ধি যোগ (৫) ভক্তি যোগ (৬) রাজযোগ সমাধি।

(১) ধ্যানযোগ সমাধি। সাধক শাম্ভবী মুদ্রা আচরণ করিয়া আত্ম প্রত্যক্ষ করিবেন, সেই বিন্দুময় ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করণান্তর সেই বিন্দু মধ্যে স্বীয় মনকে সংযোজিত করিবে। তারপর শিরঃ স্থিত ব্রহ্মলোকময় আকাশে জীবাত্মাকে আনয়ন করিবে। আবার সেই জীব আত্মার মধ্যে ব্রহ্মলোকময় আকাশকে আনয়ন করিবে। তাহা হইলেই পরমাত্মা ও জীবাত্মার একত্ব সম্পাদিত হইল বা জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হইলেন। সাধক তখন নিত্যানন্দময় হয়েন। ইহাই ধ্যান যোগ সমাধি।

(২) সাধক খেচরী মুদ্রা আচরণ করিয়া স্বীয় জিহ্বাকে উর্দ্ধগামিনী করিবেন। ইহাতে যে সমাধি হয় তাহাকে নাদযোগ সমাধি বলে।

(৩) সাধক ভ্রামরী কুম্ভকের অনুষ্ঠান করিয়া ধীরে ধীরে শ্বাসবায়ু রেচন করিবে। এরূপ করিলে শরীরাভ্যন্তরে অলি গুঞ্জনের ন্যায় ধ্বনি উত্থিত হইবে, যে স্থান হইতে ধ্বনি উত্থিত হইবে সেইখানে স্বীয় মনকে নিয়োজিত করিবে। এইরূপে যে সমাধি সম্পন্ন হইবে তাহাকে রসানন্দ যোগ সমাধি কহে।

(৪) লয় সিদ্ধি যোগ সমাধি। সাধক যোনি মুদ্রার অনুষ্ঠান করিয়া আপনাকে শক্তি স্বরূপ বিবেচনা করিবে ও পরমাত্মাকে পুরুষ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া শৃঙ্গার রসে ভাবে মগ্ন হইবেন। তখন আনন্দের অবধি থাকিবে না ও আমিই সেই ব্রহ্ম এইরূপ মনে হইলে সমাধি হইবে। ইহাই লয় যোগ সমাধি।

(৫) সাধক ভক্তি করিয়া আপনার হৃদয় আকাশে স্বকীয় ইষ্টদেবকে বসাইবেন। ইহাতে পরমানন্দের উদ্ভব হইবে ও অশ্রুপাত ও শরীর রোমাঞ্চ হইয়া ক্রমে সমাধি হইবে। ইহাই ভক্তি যোগ সমাধি।

(৬) সাধক প্রথম মনোমূর্চ্ছা নামক কুম্ভকের অনুষ্ঠান করিবে ও পরে আপনার মনকে পরমাত্মায় সংযুক্ত করিবে। এই সংযোগের ফলে যে সমাধি সম্পাদিত হইবে তাহাই রাজযোগ সমাধি। "রাজযোগ সমাধি উন্মনী, সহজাবস্থা, প্রভৃতি যে কোন রূপ যোগ হউক না সমস্তই একমাত্র আত্মা লক্ষ্য করিয়া সাধিত হয়। * * অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই বিষ্ণুরূপ জানিবে। আত্মবিৎ ব্যক্তি সমস্ত পদার্থেই আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। পরমাত্মা ও ঘটস্থ আত্মা বা জীবাত্মার কোন প্রভেদ নাই * * সর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া সমাধি সাধন করা কর্ত্তব্য এই গুহ্য রহস্য সম্যকরূপে বিদিত হইলে মানবের আর পুনর্জন্ম হয় না।"

পাঠক মহাশয় দেখিয়াছেন আমরা প্রথমে যোগের অষ্টাঙ্গের বিবরণ দিয়াছি অর্থাৎ যম নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধ্যান ধারণা সমাধি। এই আটটি যোগের অঙ্গ তা' যে প্রকারের যোগই হউক না কেন, হট, মন্ত্র, লয় বা রাজযোগ যেরূপই যোগ হউক। তারপর আমরা হট যোগের যম নিয়মাদির বিশেষ বিবরণ দিয়াছি। এখন এই যে যোগের আটটি অঙ্গ তাহা কি হট কি রাজ উভয়েই সমান বলিয়া ঐ সকল যোগাঙ্গের এক্ষণে আর বিশেষ বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই। আমরা প্রথমে যে বিবরণ দিয়াছি তাহা রাজযোগেরই অনুমোদিত। শেষ উদ্দেশ্য সমাধি সেই সমাধির কথা বলিলেই সব চুকিয়া যাইবে। এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন যোগের গ্রন্থে রাজযোগ কিরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহাই দেখান যাইতেছে। ঘেরণ্ডের কথা বলিয়াছি এক্ষণে শিবসংহিতার কথা শ্রবণ করুন।

শিবসংহিতা মতে রাজযোগ ও তৎফল।

ব্রহ্মাণ্ডবাহ্যে সংচিন্ত্য স্বপ্রতীকং যথোদিতং।
তমাবেশ্য মহচ্ছূন্যং চিন্তয়েদবিরোধতঃ॥ ২০৮
আদ্যন্তমধ্যশূন্যন্তৎ কোটি সূর্য্য সমপ্রভং।
চন্দ্রকোটী প্রতীকাশমভ্যস্য সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥ ২০৯
এতদ্ধ্যানং সদা কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে,
তস্য স্যাৎ সকলা সিদ্ধির্ব্বৎসরান্নাত্র সংশয়॥ ২১০

ক্ষণার্দ্ধং নিশ্চলং তত্র মনোযস্য ভবেদ্ ধ্রুবং।
স এব যোগী মদ্ভক্তঃ সর্ব্ব লোকেষু পূজিতঃ॥ ২১১
তস্য কল্মষসংঘাত স্তৎক্ষণাদের নশ্যতি।
যং দৃষ্টা ন প্রবর্ত্তন্তে মৃত্যু সংসার বর্ত্মনি॥ ২১২

অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে পূর্ব্ব কথিত স্বপ্রতীকের ধ্যান করিবে এবং তাহাতে মনোনিবেশ পূর্ব্বক মহচ্ছূন্যের চিন্তা করিবে। ২০৮। এ শূন্য আদি অন্ত ও মধ্য রহিত, ইহার প্রভা কোটি সূর্য্য তুল্য আর ইহার প্রসন্নতা কোটি চন্দ্র তুল্য; এইরূপ ধ্যান করিলে সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২০৯। আলস্য ত্যাগ করিয়া দিনে দিনে যিনি এ শূন্যের ধ্যান অভ্যাস করেন এক বৎসরে তিনি সিদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। ২১০। ক্ষণার্দ্ধকাল যিনি মনকে স্থির করিয়া এই শূন্য ধ্যান করিতে সক্ষম হন তিনি প্রকৃত যোগী, তিনি প্রকৃত ভক্ত ও সর্ব্ব লোক পূজিত হন। ২১১। তাঁহার কল্মষ রাশি তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। যাঁহার দর্শনে মৃত্যুরূপ সংসারে আর প্রত্যাবর্ত্তন হয় না সেই ধ্যান যত্নসহকারে স্বাধিষ্ঠানে অভ্যাস করিবে ২১২।৩ ইত্যাদি। ইহার পর পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া মহাদেব বলিয়াছেন যে এই ধ্যানের ফল সম্যক্ রূপে বর্ণন করিতে তিনিও সক্ষম নহেন। যে সাধক ইহা অভ্যাস করেন তিনি ফল জ্ঞাত হইতে পারেন অধিক কি তিনি অণিমা লঘিমা আদি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভে সক্ষম হন। ইহাই রাজযোগের ফল এবং ইহা অতি গোপনীয় বলিয়া যোগিগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত।

রাজাধিরাজযোগ ও তৎফল।

স্বস্তিকঞ্চাসনং কৃত্বা সুমঠে জন্তুবর্জ্জিতে।
গুরুং সং পূজ্য যত্নেন ধ্যান মেতৎ সমাচরেৎ॥ ২১৭
নিরালম্বং ভবেজ্জীবং জ্ঞাত্বা বেদান্ত যুক্তিতঃ।
নিরালম্বং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিৎ সাধয়েৎ সুধীঃ॥ ২১৮
এতদ্ধ্যানান্মহাসিদ্ধির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
বৃত্তিহীনং মনঃকৃত্বা পূর্ণরূপঃ সয়ম্ভবেৎ॥ ২১৯

অর্থাৎ প্রাণিহীন সুমঠে স্বস্তিক আসন করত উপবেশন করিয়া সাধক সযত্নে গুরু পূজা করিয়া এই ধ্যানের অনুষ্ঠান করিবে। ২১৭। সুধী যোগী—বেদান্ত যুক্তি অনুসারে জীবকে নিরালম্ব মনে করিয়া পরে মনকে নিরালম্ব করিয়া ধ্যান করিবে।

এই সাধনাই সাধনা ইহা ছাড়া আর অন্য প্রকার সাধনার আবশ্যকতা নাই। ২১৮। নিঃসন্দেহে এইরূপ সাধনা (ধ্যান) করিলে মহা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। সাধক জানেন যে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া স্বয়ং পূর্ণ আত্মা স্বরূপ হইতে পারেন তাহাতে আর সংশয় নাই। ২১৯। যে যোগী নিয়ত এইরূপ ধ্যান করেন তাঁহার অন্তঃকরণে আর বাসনা নিচয়ের লেশ মাত্র থাকে না; কখনও আর তাঁহার মুখ হইতে "অহং" (আমি) শব্দ উচ্চারিত হয় না; জগতের বস্তুতেই তিনি আত্ম স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। ২২০-২২১। *

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য মতে ধ্যান ও সমাধি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যোগী যাজ্ঞবল্ক্য রাজযোগ প্রতিপাদক গ্রন্থ। রহস্যের কথা মনে না করিয়া ভাব বুঝাইবার জন্য ইহাকে যোগের মাদার টিঞ্চার বলা যাইতে পারে। সমাধির মধ্যে ধ্যানের যে অংশটুকু আছে যাজ্ঞবল্ক্য তাহা 'ধ্যান' নামক নবমাধ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। সমাধির শেষ উদ্দেশ্য যে মৃত্যু বা সমাধি মূলে প্রাণত্যাগ যাজ্ঞবল্ক্য সমাধি অধ্যায়ে তাহারই বিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন কেন না যোগীর সর্ব্বশেষ উদ্দেশ্য ভগবানে লীন হইয়া যাওয়া। জপ বল তপ বল সাধনা বল—সকলই এই শেষ উদ্দেশ্যর জন্য এই শেষের দিনের চিরসমাধি ব্যাপারের জন্য। প্রকৃত সমাধি হইলে—ব্রহ্মদর্শন ও সংস্পর্শ হইলে—জীবের আর সে সুধাসাগর ত্যাগ করিয়া কঠিন সংসার ভূখণ্ডে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করে না ইচ্ছা করিলেও ফিরিয়া আসিতে পারে না; রজ্জু যদি দগ্ধ হইয়া যায় তাহাতে কি আর বন্ধন কার্য্য চলে? কেবল মাত্র আকারে রজ্জু গাছটি থাকে তাহাকে নাড়িবার চাড়িবার বা তুলিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। এই কারণ সাধু মুখে শুনিয়াছি প্রকৃত সমাধি হইলে জীব একুশ দিনের অধিক আর বাঁচে না। অনুমান করি হয়ত বা সেই কারণে যাজ্ঞবল্ক্য যোগী সমাধি অধ্যায়ে সমাধি যোগে মৃত্যু বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ব্বেও একথা আর একবার বলিয়াছি।

যাজ্ঞবল্ক্য মতে চিত্ত মধ্যে আত্মার স্বরূপ চিন্তার নাম ধ্যান। তাঁহার মতে এই ধ্যানই জীবের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ। তাহার মধ্যে ধ্যান সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দুই প্রকার আমিই সেই পরম ব্রহ্ম সাধক এইরূপ যে ধ্যান করেন তাহার নাম নির্গুণ ধ্যান, সাধক কোন রূপ কল্পনা করেন না তবে ব্রহ্মের

* শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রীর পুস্তক যোগাম্বুধি দেখুন ৪১৪।৪১৫ পৃষ্ঠা।

বিশেষণ গুলি, এই পরস্পর বিরোধী বিশেষণ গুলির চিন্তা করেন অথচ অনাদি অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম বিশ্বরূপ অথচ মূর্ত্তি রহিত সৎস্বরূপ, চিৎ স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ ইত্যাদি। স্বগুণ ধ্যানে সাধক মানসে স্বীয় শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে—পরমাত্মার রূপ দেখিয়া আমিই সেই পরমাত্মা এই জ্ঞানে পরমাত্মার মূর্ত্তি ধ্যান করেন। এই রূপ ভিন্ন ভিন্ন। কখনও লক্ষ্মীপতি নারায়ণ, কখনও দেব বৈশ্বানর কখনও আদিত্য মণ্ডলে দেব আদিত্য, কখনও ভ্রূযুগলে দীপ্তিমান জ্যোতিস্বরূপ পরমাত্মা, কখনও ভ্রূযুগলের মধ্যে মহাদেব, কখনও হৃৎপদ্মে চন্দ্র মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী অমৃতবর্ষী চন্দ্রকিরণ দ্বারা আবৃত পরমাত্মাকে—সাধক পরমাত্মা এই সকল রূপ মানসে দর্শন করিয়া তাহার ধ্যান করিয়া থাকেন। নির্গুণ বা স্বগুণ ধ্যান সম্পূর্ণরূপে অভ্যাস হইলেই সাধক সমাধি ধ্যানের অধিকারী হন, যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বক্ষ্যমাণ রূপে সমাধি ধ্যান বর্ণনা করিয়াছেন।

সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
ব্রহ্মণ্যেব স্থিতি র্বা সা সমাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ॥ ২
ধ্যায়েদ যথা যথাত্মানং তৎসমাধিস্তথা তথা।
ধ্যাত্বৈর্বাত্মনি সংস্থাপ্য নান্য আত্মা বশো ভবেৎ॥ ৩
এবমেব হি সর্ব্বত্র সৎপ্রসক্তস্ত যো নরঃ।
তথাত্মা সোঽপি তত্রৈব সমাধিঃ সমবাপ্নুয়াৎ॥ ৪
সরিৎপতৌ নিবিষ্টাম্বু যথাভিন্নত্বমাপ্নুয়াৎ।
তথাত্মাভিন্ন এবাত্র সমাধিঃ সমবাপ্নুয়াৎ॥ ৫
এতত্ত্যক্তং ভবত্যত্র গার্গি ব্রহ্মবিদাং বরে।
কর্ম্মৈব বিধিবৎ কুর্ব্বন কাম সঙ্কল্পবর্জ্জিতং॥ ৬
বেদান্তেষ্বপি শাস্ত্রেষু সুশিক্ষিত মনাস্তথা।
গুরুণা যোপদিষ্টার্থং যুক্তোপোতিং বরাননে॥ ৭
বিদ্বদ্ভিঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞৈবিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
নিশ্চিতার্থেস্থ তস্মিংস্তু সুশিক্ষিত মনাঃ সদা॥ ৮
যোগ মেবাভ্যসেন্নিত্যং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
ততস্তাভ্যন্তরৈশ্চি হ্রৈর্বাহ্যৈর্ব্বা কাল সূচকৈঃ॥ ৯
বিনিশ্চত্যাত্মনঃ কাল মন্যৈর্বা পরমার্থবিৎ।
নির্ভয়ঃ সুপ্রসন্নাত্মা ভূত্বা তু বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১০

সকর্ম্ম নিরতঃ ক্ষান্তঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
প্রদায় বিদ্যাং পুত্রস্য মন্ত্রঞ্চ বিধিপূর্ব্বকং ॥ ১১
সংস্কারাণ্যাত্মনঃ সর্ব্বমুপদিশ্য তথানঘে।
পুণ্যক্ষেত্রে শুচৌদেশে বিদ্বদ্ভিশ্চ সমাবৃতে ॥ ১২
ভূমৌ কুশান্ সমাস্তীর্য্য কৃষ্ণাজিন মথাপিরা।
তস্মিন্ সুবদ্ধপর্য্যঙ্কোমন্ত্রে কলেবরঃ ॥ ১৩
আসনে নান্যধীয়াস্তে প্রাঙ্মুখো বা প্যুদঙ্মুখোঃ।
নবদ্বারানি সংযম্য গার্গস্মিন্ ব্রহ্মণঃপুরে ॥ ১৪
উন্নিদ্র হৃদয়াম্ভোজ প্রাণায়ামৈঃ প্রবোধিতে।
ব্যোম্নি তস্মিন্ প্রভারূপে নিরূপে সর্ব্বকারণে ॥ ১৫
মনোবৃত্তিং সুসংযম্য পরমাত্মনি পণ্ডিতঃ।
মূর্দ্ধ্যাধ্যায়াত্মনঃ প্রাণং ভ্রুবোর্মধ্যে তদানঘে ॥ ১৬
কারণে পরমানন্দে আস্থিতো যোগধারণং।
ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মব্যাহরন্ সুসমাহিতঃ ॥ ১৭
শরীরাং সন্তজেদ্ বিদ্বান নৈবৈ দ্বিজোত্তমঃ।
যস্মিন্ সমভ্য মেদ বিদ্বান্ যোগে নৈবাত্মদর্শনং ॥ ১৮
তদেব সংস্মরেদ বিদ্বান্ ত্যজত্যন্তে কলেবরঃ।
তং তমেবের্ভ্যগৌ ভাবমিতি ব্রহ্মবিদোবিদুঃ ॥ ১৯

অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমতাবস্থাকে সমাধি কহে, যখন জীবাত্মা প্রত্যগভাবে পরমাত্মায় অবস্থান করে তখন সেই অবস্থার নাম সমাধি। যিনি যে যে ভাবে ধ্যান করেন তিনি সেই সেই ভাবেই সমাধি প্রাপ্ত হন। আত্মাকে বশীভূত করিবার আর অন্য উপায় নাই অর্থাৎ ধ্যানে জীবাত্মাকে পরমাত্মায় সংস্থাপন করা ব্যতীত আর উপায় নাই। সর্ব্বত্র এইরূপই দেখা যায় যে যাহার আত্মা যাহাকে নিতান্ত আসক্ত তাহার আত্মা তথা অবস্থান করে আর সেইখানেই সমাধি প্রাপ্ত হয়। সাগর প্রবিষ্ট হইলে যেমন নদ নদী প্রভৃতি জলরাশির স্বতন্ত্র অবস্থিতি থাকে না সমুদ্রের জলের সহিত একত্ব সাধিত হয় সেইরূপ সমাধি অবস্থায় জীবাত্মা ও পরমাত্মায় একত্ব সম্পাদিত হয়। হে ব্রহ্মবিদাবরে গার্গী এরূপ কথিত হইয়াছে যে বাসনা বর্জ্জিত হইয়াও বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও। বেদান্তাদি শাস্ত্র সমূহে সুশিক্ষিত হইয়া ও সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ

পণ্ডিতগণের সহিত পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া সেই সকল শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মে নিশ্চিতার্থ হইয়া জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ সাধনে নিত্য ব্যাপৃত থাকিবে। তারপর যখন পরমার্থজ্ঞ যোগী বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ও অন্যান্য কাল সূচক চিহ্ন দ্বারা মৃত্যু নিকট জানিতে পারিবেন তখন তিনি পূর্ব্বের ন্যায় নির্ভয় সুপ্রসন্নাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, সকর্ম্মনিরত ক্ষমবান, সর্ব্বভূতহিতেরত থাকিয়া বিধিপূর্ব্বক স্বীয় পুত্রকে আপনার বিদ্যা ও মন্ত্র দান পূর্ব্বক, নিজের সংস্কার সমূহ উপদেশ করত, বিদ্বান ব্যক্তিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া পুণ্যক্ষেত্রে ও শুচি প্রদেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তথা ভূমির উপর কুশ বা কৃষ্ণাজিন বিস্তার করিয়া তাহার উপর পর্য্যঙ্ক বন্ধন পূর্ব্বক উত্তর বা পূর্ব্ব মুখ হইয়া বসিবেন এবং একাগ্র চিত্তে মন্ত্রযোগে শরীরকে নিবদ্ধ করিবেন। পরে এই ব্রহ্মপুর শরীরাভ্যন্তরে নবদ্বার নিরুদ্ধ করিয়া প্রাণায়াম বিকসিত হৃদয় মার্গ মধ্যে যে আকাশ রহিয়াছে তদ-ভ্যন্তরের জ্যোতি স্বরূপ নিরাকার সর্ব্বকারণ পরমাত্মাতে মনোবৃত্তি সংযম করিয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণ বায়ুকে ধারণ করিবেন। হে অনঘে, বিদ্বান ব্যক্তি পরমানন্দ কারণভূত ব্রহ্মে নিমগ্ন হইয়া ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম মন্ত্র জপ করিতে করিতে যোগধারণ বলে সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন এবং এই সমাধি অবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করিবেন। ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে যিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়া আত্ম দর্শন অভ্যাস করেন শরীর ত্যাগ কালেও তিনি সেই ভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকিবেন এবং যে ভাবকে আশ্রয় করিয়া অন্তকালে শরীর ত্যাগ হয়, লোকে সেই ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এইক্ষণে গীতার কথা। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে ৫।৬।৭ প্রভৃতি হইতে ১৩ শ্লোক পর্য্যন্ত এই ভাবই কথিত হইয়াছে—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্‌ত্যক্তা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতিসমদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫
যং যং বাপি স্বরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেতৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবং ভাবিতঃ ॥ ৬ ॥
হইতে ১৩র পরমাং গতিম্ পর্য্যন্ত।

আর ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ১১ শ্লোক হইতে অর্থাৎ শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসন-মাত্মনঃ হইতে ২৮ শ্লোক পর্য্যন্ত রাজযোগ সম্মত সমাধির কথা বলিয়াছেন। এই সকল শ্লোক পূর্ব্বে প্রয়োজন বিশেষে উদ্ধৃত করা হইয়াছিল বলিয়া আর

এখন উদ্ধৃত করা গেল না। যদিও পূর্ব্বোক্ত শ্লোক কয়টীর বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা গেল কিন্তু সমস্ত গীতাই রাজযোগ প্রতিপাদক।

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবও অতি সহজ কথায় সমাধি বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিতেন মন সদা সর্ব্বদা প্রথম তিন ভূমিতে থাকে লিঙ্গ গুহ্য নাভি—এই তিন স্থানই মনের বাসস্থান, সাধক তখন সংসারে কামিনী কাঞ্চনে আবদ্ধ হয়, তারপর যখন সাধক আপনার মনকে হৃদয়ে বাসস্থান দিতে সক্ষম হন তখন সাধকের জ্যোতি দর্শন হয়। সে জ্যোতি ঈশ্বরের। সাধক তখন অবাক হইয়া মনে করে এ আবার কি জ্যোতি? তারপর সাধকের মন যখন কণ্ঠে বাস করে তখন ভগবানের কথা ছাড়া সাধকের আর কিছু ভাল লাগে না। তারপর মন যখন ভ্রূ মধ্যে বাস করে তখন সচ্চিদানন্দ রূপ দর্শন হয়। সাধক তখন সেই রূপকে স্পর্শ করিবার জন্য ব্যাকুল হন কিন্তু ছুঁইবার উপায় নাই যেন লণ্ঠনের মধ্যে আলো আর পতঙ্গ তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আলোর কাছে যাবার যো নাই কাঁচে ঠেকিয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। তারপর সপ্তম ভুমি অর্থাৎ সহস্রার এখানে মন গেলে জীবের অহং থাকে না জীব ব্রহ্মে এক হইয়া যায়। বেদে আছে যে এই সপ্তম ভূমিতে মন গেলে সমাধি হয়। সে অবস্থা কি মুখে বলা যায় না। তিনি বলিতেন সে কালের লোকে বলিত কালাপানিতে জাহাজ গেলে আর ফেরে না। নূনের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গিয়ে গলে গেল। সমাধি অবস্থায় মনের নাশ হয় আর সমাধি হয়। সাধক মুখে সে অবস্থা বর্ণনা করিতে পারে না। এইরূপ সমাধি হলে সাধক ২১ দিনের অধিক বাঁচে না।

হুগলীর কথা।

শনির দৃষ্টি।

জেলা হুগলীর অন্তর্গত বলাগড় থানার মধ্যে দীঘসুই গ্রাম। কেহ কেহ বলেন মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের দীর্ঘসূত্রতা নিবন্ধন এই নাম হইয়াছিল পরে কাল ক্রমে দীর্ঘসূত্রের অপভ্রংশ দীর্ঘসুই চির প্রসিদ্ধ। ইহার অল্প দূরে চন্দ্রহাটী ও নসরাই। নসরাই ৺ গঙ্গাতীরে এবং পূর্ব্বে ৺ গঙ্গা ও কুন্তী নদীর (যাহাকে

মগরা রেলওয়ে ষ্টেশনের পশ্চিমেই পুলের নীচে দেখিতে পাওয়া যায়) সঙ্গম স্থান বলিয়া ইতিহাস প্রসিদ্ধ ছিল। কাহারও কাহারও মতে বেহুলা সুন্দরী বাঁকা নদী হইয়া ফুলটী নদী হইয়া কুন্তীতে পড়েন ও পরে তাঁহার কলার ভেলা নসরাই আসিয়া ৺ গঙ্গাবক্ষে ভাসমানা হয় ও পরে একটু পরেই গহরপুর প্রাপ্ত হয়। দীর্ঘসুই গ্রামে অনেকগুলি টোল ছিল অনেক বড় বড় ভট্টাচার্য্য এইখানে বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। ৺ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের গুরু রাম চন্দ্র বিদ্যাসাগর এই খানেই অবস্থিতি ও অধ্যাপনা করিতেন এবং জগন্নাথ জজ পণ্ডিত হইলে রাম চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন এত করিয়া লেখা পড়া শিখাইলাম চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছু হ'ল না জগন্নাথ লেখা পড়া শিখিল না কেবল একটি জ্যেঠা হইল। যে ব্যাপার উপলক্ষে রামচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন সে ব্যাপারের পরিচয় বারান্তরে দিব।

দীর্ঘসুই গ্রামে সুধী ছিলেন, জমীদার ছিলেন, তালুকদার ছিলেন, সাধক ছিলেন, ভাল ভাল আচার্য্য ব্রাহ্মণ এবং জ্যোতিষী ছিলেন, সওদাগর ছিলেন, বড় চাকুরে ছিলেন, বড় বড় চাষী ছিলেন, আর ছিল লাঠিয়াল, সড়কীওয়াল, কীরিচওয়াল, ঢালী খড়গী, রায়বাঁশী, আর ছিল বহু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, ঠ্যাঙ্গাড়ে ও ডাকাত। যখন বাঙ্গালার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রেল জাল পাতা হয় নাই, যখন লৌহ পথে লৌহ তুরঙ্গম বাষ্প তাড়নায় বিকট চীৎকার করিতে করিতে না ছুটিত যখন তড়িৎ ধরিয়া লোকে তার ফাঁদে রাখিতে পারিত না যখন চপলা-ভঙ্গে লোক কথা কহিতে পারিত না, যখন চঞ্চলা চপলা স্থিরা সন্দেশ ও তাম্বুল-করঙ্ক-বাহিনী হয় নাই তখন পূর্ব্বদেশ হইতে পশ্চিম দেশ যাত্রীর বা পশ্চিম দেশ হইতে পূর্ব্বদেশ যাত্রীর, এক সের সাহের রাস্তা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। মোগলের আমলে এ অঞ্চলের লোক দলে দলে পশ্চিমে ছুটিত আবার ইংরেজের আমলে সে অঞ্চলের লোক এ অঞ্চলে দলে দলে ছুটিতে লাগিল। কি দেশী কি বিদেশী, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি ধনী কি নির্ধন, কি বিদ্বান কি মূর্খ, কি শান্তিপ্রিয় গৃহস্থ কি যুদ্ধ প্রিয় সৈনিক সকলেই এই সের সাহের রাস্তা দিয়া গমনাগমন করিত। মগরার অব্যবহিত পশ্চিমে কাবার পুকুর বলিয়া একটি পুষ্করিণী আছে আর এক ক্রোশ পশ্চিমে চিতের মার দীঘী আছে। এই দুইটী পুষ্করিণী তীরে লক্ষ মানব মুণ্ড প্রোথিত আছে আজিও হুগলী হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত যে কোন সহরের লোক কাবার পুকুরের ও চিতের মার পুকুরের নাম শুনিলে শিহরিয়া উঠেন

এই দুই পুকুরের প্রায় আধ ক্রোশ উত্তরে দীর্ঘস্থই গ্রাম। তখনকার দিনে সেকালে এই দুই পুকুরের নামে লোকের কি হইত তাহা আর বলিয়া যশ লইতে হইবে না। এই দুই পুকুরের নিকটস্থ গ্রাম বলিয়া দীর্ঘস্থইকে জানিবার লোকের আর একটা কারণ ছিল। রীতিমত দল না বাঁধিয়া রজনীতে কেহ এই পথ অতিক্রম করিতে সাহস করিতেন না। কখন কখনও দলকে দলই রাক্ষসগণের কবলিত হইত। দশ বৎসর পূর্ব্বেও এখানে লোক কাঁচা মাথা দিয়াছে। কাবার পুকুরের তীরে একজন সাহেব এখন মেষপাল রক্ষা করিয়াছেন। মেষদিগের জন্য বিস্তৃত খোঁয়াড় প্রস্তুত হইয়াছে ও তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ও অনেক লোক নিযুক্ত হইয়াছে। চীতের মার পুকুরের তীরে কিন্তু এখন কিছু হয় নাই। এখানে একটী চটি আছে বটে কিন্তু সে দোকান দিনেই খোলা পাওয়া যায়।

কথায় কথায় কোথায় ভাসিয়া যাইতেছি। সে যাহা হৌক আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি তখন এখানে ভারী মারীভয় ছিল। অপরাহ্নে একটু বেলা থাকিতে এখানে পঁহুছিলে লোকে নিকটবর্ত্তী মামুদপুর গ্রামে বা দীর্ঘস্থই প্রভৃতি গ্রামে গিয়া রাত্রি যাপন করিত।

সিরাজউদ্দৌলা যখন ইতিহাস কথিত ও কল্পনা চিত্রিত লোক পীড়নে সমুৎসুক, যখন জগৎশেঠ, রাণী ভবাণী, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র "খাল কেটে কুমীর আনিবার" চক্রান্তে গাঢ় মগ্ন তখন সেই সময়ে দীর্ঘস্থই গ্রামে একজন আচার্য্য ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণচন্দ্র আচার্য্য। তিনি জ্যোতিষী ছিলেন ও তাঁহার গণনা অভ্রান্ত বলিয়া লোকে প্রচার করিত। তাঁহার বংশের বর্ত্তমান পুরুষের নাম অঘোর আচার্য্য, অঘোরের পিতার নাম চুনি লাল আচার্য্য, কৃষ্ণ চন্দ্র আচার্য্য চুনিলালের প্রপিতামহ ছিলেন। একদা আচার্য্য ব্রাহ্মণ আপন আবাসে বসিয়া আছেন নিকটে একজন পান্থ বসিয়া আছেন। শেষোক্তের বাটী নদীয়া কৃষ্ণনগর অঞ্চলে। দুইজনে বসিয়া নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন এমন সময় পান্থ আচার্য্যের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিলেন দেখুন দেখুন— কি কল্লে টিকটিকীটা। আচার্য্য দেখিলেন। দেখিলেন একটা টিকটিকী ব্যস্ত হইয়া মেটে ঘরের ধারীর পার্শ্বস্থ একটি বাঁশের খুঁটী বহিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ক্রমাগত উঠিতেছে, ও নামিতেছে আর মধ্যে মধ্যে অল্প কাল পরেই ডাকিতেছে। আচার্য্য মহাশয়ও দেখিলেন পান্থও দেখিলেন। তখন পথিক ব্যস্ত হইয়া

নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে টিকটিকীর ঔৎসক্যের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আচার্য্য মহাশয় তৎক্ষণাৎ গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। গণনা শেষ হইলে আচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "টিকটিকীর আজ অত্যন্ত আনন্দের দিন। আজি উহার বিবাহ হইবে। কানপুর হইতে একজন লোক আসিতেছেন তাহার কাছে একটী ছাতা আছে। সেই ছাতির মধ্যে একটি টিকটিকী আছে। সেই টিকটিকী ইহার প্রণয়াস্পদ। তাহারই শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে ও ঔৎসুক্য চাপিয়া না রাখিতে পারিয়া উঠ বোস বা নাবা উঠা করিতেছে ও মধ্যে মধ্যে বিরক্তি সূচক ধ্বনি প্রচার করিতেছে। পশু পক্ষী সরীসৃপদিগেরও যে ভাষা আছে অনেক তান্ত্রিক সাধু এই সকল ভাষা বুঝিতে পারেন। তন্ত্রমতে সাধনা করিলে পশুপক্ষী প্রভৃতির ভাষা বুঝিতে পারা যায়। ইহা একটা বিদ্যা বৈত নয় অনুশীলন করিতে হয় *। আপনি বসিয়া থাকুন কোথাও যাইবেন না। ব্যাপারটা কত দূর গড়ায় বসিয়া বসিয়া দেখুন না, আমোদ পাইবেন।"

এই সমস্ত কথা শুনিয়া পথিকের কৌতুহল দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। কিন্তু ব্যাপার দেখিবার জন্য নিতান্ত মনোযোগ সহকারে টিকটিকীর গতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

দুই ঘণ্টার পর এক জন নূতন পথিক আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আচার্য্য মহাশয় ও পূর্ব্বোক্ত পথিকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। উভয়েই নিতান্ত উৎসুক হইয়া দেখিলেন বগলে ছাতি আছে কি না। ছাতা দেখিয়া পথিক নবাগত পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন "মশাই কোথা থেকে আসচেন?" উত্তর হইল "কানপুর হইতে।" পথিক আর কি সহ্য করিতে পারে? বলিল "মহাশয় আমার একটু প্রয়োজন আছে আপনি আপনার ছাতিটা একবার খুলুন দেখি?" আগন্তুক আশ্চর্য্য হইল। "কেন কেন" বলিতে বলিতে যেমন জোরে ছাতিটা খুলিয়াছে, আর অমনি টপ্ করিয়া একটা টিক্‌টিকী ছাতা হইতে মাটীতে পড়িয়া গেল। তখনই ছাতা বাহন টিক্‌টিকী ডাকিয়া ছুটিয়া ধারীর খুঁটির মূলে উপস্থিত হইল। ওদিকে খুঁটির টিক্‌টিকী তর তর করিয়া নামিয়া আসিল। আগন্তুককে দেখিল। তখন উভয়েই ডাকিল। পরস্পর মুখ চুম্বন করিল তখন উভয়ে মহানন্দে খুঁটির উপরে উঠিয়া গেল।

* এক জন সাহেব বানরের ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য আফ্রিকায় বসিয়া আছেন। বানরের ভাষা আবিষ্কার ত করিয়াছেনই অধিকন্তু তিনি সেই ভাষা সাহায্যে বানরের সহিত কথা কহিতে পারেন।

আগন্তুক গল্প শুনিলেন তখন দুই পথিক গালে হাত দিয়া ভাবিতে বসিলেন।

অগ্নি কি চাপিয়া রাখা যায়। আচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্রের যশোরাশি দিগদিগন্ত ছুটিল। গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আর কি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? অতি সমাদরে অতি যত্নে কৃষ্ণচন্দ্রকে আহ্বান করিয়া স্বীয় রাজধানীতে লইয়া গেলেন সেখানে সভাপণ্ডিতগণের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রকে স্থান দিলেন। জ্যোতিষী কৃষ্ণচন্দ্র এই নামে তিনি সর্ব্বপরিচিত হইলেন।

একদা সময়টা কিরূপ যাইতেছে গণনা করিবার প্রয়োজন হওয়ায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র জ্যোতিষীকে গণনা করিতে আদেশ করেন। জ্যোতিষী গণনা করিয়া জানাইলেন যে তাঁহার দুঃসময় উপস্থিত প্রায়। অতি অল্পদিন পরে তাঁহার (মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের) উপর শনির দৃষ্টি হইবে।

মহারাজ তখন নানা সাংসারিক বিঘ্ন বিপদ বিপত্তি বাধায় কষ্ট পাইতেছিলেন। এই কথা শুনিয়া একেবারে ম্রিয়মাণ হইলেন এবং শনির দৃষ্টির প্রকোপ নিবারণের জন্য কৃষ্ণচন্দ্রকে আয়োজন করিতে বলিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র যথা সাধ্য আয়োজন করিয়া যাগ যজ্ঞের দিনক্ষণ স্থির করিয়া, হঠাৎ বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যের নিমিত্ত একবার কৃষ্ণনগর হইতে দীর্ঘসূই যাইতে বাধ্য হইলেন মহারাজা কি করেন নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই আচার্য্যকে ছাড়িয়া দিলেন।

আচার্য্য আসিয়া ক্ষিপ্র হস্তে আবশ্যকীয় কার্য্যটি করিতেছেন শেষ হইলেই কৃষ্ণনগর যাত্রা করিবেন ও ধার্য্যদিনে শনির তুষ্টি সাধন মানসে আবশ্যকীয় যজ্ঞ অপরাপর ব্রাহ্মণগণের সহায়তায় আরম্ভ করাইবেন। ও দিকে কৃষ্ণনগর হইতে প্রায় প্রত্যহই পত্রবাহক লোক আসিতেছে কথা আর কিছু নয় শীঘ্র আইস। একদিন দুপুরবেলা স্নানের সময় কৃষ্ণচন্দ্র আচার্য্য তৈল মর্দ্দন করিতেছেন এমন সময় একজন অপরিচিত লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আচার্য্যের পশ্চাতে দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন। আগন্তুক কহিলেন "মহাশয় আমি কৃষ্ণনগর হইতে আসিতেছি। আপনি শীঘ্র না যাওয়াতে মহারাজা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন; শনিযাগের জন্য তিনি নিতান্ত ব্যাকুল;—তাঁহার আর দিন যায় না। আপনাকে অতি শীঘ্রই যাইতে হইবে। আর একটী গণনা করিয়া দিতে হইবে। মহারাজ জানিতে চাহেন যে, এই মুহূর্ত্তে (অর্থাৎ যখন আমি আপনার সহিত কথা

কহিতেছি।) শনি কোথায়? আরও কথা এই যে আপনি এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না—এই খানে বসিয়াই আপনাকে সেই গণনাটী করিয়া দিতে হইবে।

কৃষ্ণচন্দ্র আচার্য্য মহারাজের আদেশ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। ভাবিলেন এ আবার কি খেয়াল। যাহা হউক রাজ-আদেশ, অবহেলা করিবার যো নাই। অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া গণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষণকাল গণনা করিয়াই চুপ করিয়া বসিলেন।

আগন্তুক। আপনার গণনা শেষ হইয়াছে?

কৃষ্ণচন্দ্র। আজ্ঞা হাঁ।

আগ। ফল কি? শনি কোথায়?

কৃষ্ণচন্দ্র। আর কি বলিব? গণনার সময় শনিদেব আমারই পশ্চাতে উপস্থিত ছিলেন। দেব, আমাকে ক্ষমা করুন।

শনি। তা'ও কি হয়? তুমি আমাকে কৃষ্ণনগর হইতে তাড়াইবার জন্য আড়ে হাতে লাগিয়াছ। রাজাকে রক্ষা করিবে, খুব নাম-যশ হইবে এখন আপনাকে রক্ষা কর।

কৃষ্ণ। আমি কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছি ও করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম।

শনি। আমারও তাই। আমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবার জন্যই রাজার নিকট নিয়মিত দিনে উপস্থিত হইব। তুমি তাহার বাধার দিকে। সম্মুখ শনি দেখিলে তোমার নিশ্চয় মৃত্যু হইত। কিন্তু যখন তুমি আমাকে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিয়াছ তখন আর নিস্তার নাই। অঙ্গ হানি হইবেই হইবে। কোন্ অঙ্গ দিতে প্রস্তুত বল।

কৃষ্ণ। প্রভো! আমায় ক্ষমা করুন।

শনি। আচ্ছা যতটা পারি রক্ষা করিয়া যাইব। তোমার অপর অঙ্গ হানি করিব না। তুমি চাহিয়া দেখিয়াছ তোমার চক্ষু হানিই হউক।

কৃষ্ণ। প্রভো! তাহা হইলে ত আমি অন্ধ হইব।

শনি। না তা হইবে না, তোমার একটী চক্ষু লইব। বল কোন্ চক্ষু দিবে? আমি শীঘ্র যাইব, যাহা হউক তোমার গণনায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি আর সেই জন্যই একটী মাত্র চক্ষু দিয়া পার পাইলে।

কৃষ্ণ। যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন।

তখন চক্ষুর পলক না পড়িতে আগন্তুক বাষ্পার্ণবে মিশিয়া গেলেন। যেন উপিয়া গেল সেই মূহুর্ত্ত হইতে কৃষ্ণচন্দ্র আচার্য্যের দক্ষিণ চক্ষু দৃষ্টি হীন হইল।

* * * *

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র আচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্রকে এই ঘটনা উপলক্ষে ১০০ বিঘা লাখরাজ দান করেন, এবং একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া, ঘটনাটি স্মরণ করিবার জন্য, কৃষ্ণচন্দ্রকে দান করেন। ঐ পুষ্করিণীর নাম আচার্য্য পুকুর—ইহা এখনও বর্ত্তমান। আচার্য্য পুকুর অনেকটা মজিয়া গিয়াছে। ইহার বর্ত্তমান জলকর প্রায় বার বিঘা হইবে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচন।

ভারতী—২৮ বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১১। এই বিষয়গুলি আছে—প্রকৃতি (পদ্য), প্রতিজ্ঞা পূরণ (ক্ষুদ্র গল্প), কাবুলীওয়ালা, বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ, বোম্বাইয়ের বোরা জাতি, মহারাজ রাজবল্লভ ও তাঁহার সমকালবর্ত্তী বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ, রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ ও তৎসংক্রান্ত সভা দ্বয়ের বিবরণী, উর্ব্বশী ও তুকারাম, আমাদের উচ্চ শিক্ষা (প্রশ্ন), ঐ (উত্তর), সাময়িক কথা।

"প্রকৃতি" পদ্যটী কিছু হয় নাই, না গঠনে না প্রাণ প্রতিষ্ঠায়। প্রথমে গঠনের কথা "সঙ্গী কে"—"সঙ্গীতে"র সহিত মিল। এটা না হয় ভারতচন্দ্রের খাতিরে ছাড়িয়া দিলাম। "শুন্‌লো রাজার ঝি, তোরে কইতে এসেছি" কিন্তু সর্ব্বত্র এরূপ চলিবে কেন? বর্জ্জনকে বিধি করিলে চলিবে কেন। মুক্ত—ভক্ত, তৃপ্তি—সুপ্তি, বস্ত্র—হস্ত, দীপ্তি—শক্তি সর্ব্বত্র এইরূপ, প্রকৃতিকে বলা হইতেছে "তোমার উদার হৃদয় প্রকৃতি সকলের তরে মুক্ত" তারপর এই ভাবটিই ফেনান। "প্রতিজ্ঞা-পূরণ" গল্পটি আরম্ভ বেশ, পাল ভরা নৌকার মত চলিতেছিলও বেশ, কিন্তু হঠাৎ যেন পাল নামাইতে গিয়া নৌকা খানি উল্টাইয়া পড়িল, যেন তেন প্রকারেণ গল্পটি শেষ করিয়া দেওয়া হইল। "কাবুলীওয়ালা" লেখক দীনেশচন্দ্র সেন। দীনেশ বাবু কাবুলীর প্রেমে গর্ গর্ মাতোয়ারা। যেন গাহিতেছেন :—

কাবুলী কুরু করুণা দীনে আঙ্গুর-বনচারী।
সুদীর্ঘ-বপু-শোভন মোহন-লগুড়ধারী॥
(কাবুলী কাবুলী কাবুলী বল মন আমার)

কুসীদ-খোর পল্লী-বিহর শীত-ভয়-ভঞ্জন।
নয়ন-বাঁকা বাঁকা-টুপি-রাখা বাঙ্গালি ভীতি-বর্দ্ধন,
নেমকরুটি ভক্ষণ, "কায়দা বোগ্‌দাদী" পঠন॥
ছোট-আদালত-গমনকারী, হারিসন-রোড-বিহারী,
(কাবুলী কাবুলী কাবুলী বল মন আমার)

আমরা বলি Amen.

ইহা অপেক্ষা আরও কথা কহিয়াছেন কৈকেয়ী—কাবুলিনী, গান্ধারী কাবুলিনী বলিয়াছেন. অর্থাৎ গোটা রামায়ণের জন্মদাত্রী কাবুলিনী কৈকেয়ী,—আর গান্ধারীর শত পুত্র লইয়া গোটা মহাভারতের জন্মদাতা তস্যা ভ্রাতা শকুনি। অপিচ, কাবুলিনীর আদর্শে বাঙ্গালীর দশ হস্তে দশ প্রহরণ ধারিণী দুর্গা। দুনিয়ায় কাবুলী ছাড়া কিছু নাই—পেস্তা, বাদাম, বেদানা, আঙ্গুর। হরি হরি—এক কাবুলী হইতেই আমাদের সব। "বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ" প্রবন্ধে সতীশ বাবু অপরাপর কথার মধ্যে দীনেশ চন্দ্র সেনের কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এখানেও দীনেশ বাবু। ইহার মত "যে সকল বিষয় বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা হইতে পৃথক্ সেই সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করা বাঙ্গালা বৈয়াকরণের কর্ত্তব্য।" আর যে ভাষায় আমরা প্রতি মূহূর্ত্তে কথাবার্ত্তা কহি সেই ভাষায় সাহিত্য লেখা উচিত। আমাদের যতদূর স্মরণ হয় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে সিভিলিয়ান বীম্‌স্ সাহেব এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন। "চাঁদি ডুবু ডুবু দেখে ঝুর লুসে কুপো কাৎ তার পর ঝুঁজ্‌কো বেলায় খ্যাজনা দেবার জন্য তিন লাফে পগার পার" সাহিত্যে কেমন শুনায়? "বোম্বাইয়ের বোরা জাতি"। বোরা জাতির "কথা"ও সেই সঙ্গে তায়েবজী পরিবারের কথা আসল কথা তায়েবজী পুত্রই প্রথমে এটর্ণি হন ও বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হন তারপর উমেশ বন্দ্যো বাঙ্গালা হইতে ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যান। "রাজা রাজবল্লভের সময় হিন্দুসমাজ"—লেখক বলিয়াছেন রাজা রাজবল্লভ একজন রিফরমার ছিলেন। রাজবল্লভের অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা বিধবা হইলে রাজবল্লভ বঙ্গে বিধবা বিবাহ চালাইতে চেষ্টা করেন। লেখক বলেন অনেকগুলি পণ্ডিত তাঁহার মতের স্বাপক্ষে অনুকুল মতও দিয়াছিলেন কিন্তু রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কুটিলতায় নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ বিপরীত মত দেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে একজন মিথ্যাবাদী রূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। "রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ" অর্থাৎ স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধটী যে রবি বাবু দুইটী সভায় পাঠ করেন তাহার বিবরণ ও

শ্রোতাগণের মত প্রকাশ। এ পোড়া দেশে ঐ প্রবন্ধ পাঠ, পাঠেই পর্য্যবসিত হইবে ইহাই মনে হয়। কোন ফল হইবে তাহা ত মনে হয় না। আমাদের বচন ছাড়া আর কিছু নাই যদি থাকে তবে সে ভিক্ষা বৃত্তি। "উর্ব্বশী ও তুকারাম" ক্রমশঃ নাটক চলিতেছে। "আমাদের উচ্চশিক্ষা"—ইউনিভার্সিটী বিলের কথা নানা ভাবে। লঙ্কার আগুণ নিবিয়াছে আর লাঙ্গুলের অগ্নি লইয়া খেলা কেন? ইহাকে কি রাজনৈতিক প্রবন্ধ বলিব? যাহা হউক স্থানে স্থানে ভারতীতে ভাষার দোষ দৃষ্ট হইল—এ বিষয়ে শিথিলতা ভাল নহে।

সাহিত্য—১৫শ ভাগ শ্রাবণ ১৩১১। শ্রাবণে (কবিতা), ফিরোজ সাহ তোগলক্, দর্শনশাস্ত্র ও মহাভারত, ইংরেজবর্জ্জিত ভারতবর্ষ, বারভূঞা ইশা খাঁ, বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ (১৩১০ সালের), প্রায়শ্চিত্ত (গল্প) সহ-যোগী সাহিত্য, বর্ষা (কবিতা), মাসিক সাহিত্য সমালোচন, বিবিধ।

দুইটি কবিতাই আমাদের ভাল লাগে নাই। ঝিলের উপর বিশ্বভূপালের সম্বোধনে নানা কথা শুনিতে শুনিতে একেবারে দ্বিতীয় প্যারায় যেন খাদে "আজি প্রাতে মেঘ গে'ছে কেটে" সহসা শুনিলাম। রহস্য রচনায় এরূপ সম্ভব হইতে পারে কিন্তু কবিতাটি রহস্য রচনা নহে। যেন দুগ্ধে গোমূত্র ফোঁটা পড়িয়াছে। দ্বিতীয় কবিতাটি বর্ষা। কবি প্রকৃতিকে বলিতেছেন তুমি যাদুকরী—তুমি বর্ষার সাজ খোল বসন্তের সাজ পর। বর্ষায় বসন্তের সাজ পরিবার অনুরোধ কেন? শরতের সাজ বলিলেও কতকটা বুঝা যাইত। ফিরোজ সাহ তোগলক্ ও ইশা খাঁ দুইটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। যেমন চিরকাল হইয়া আসিতেছে অনুবাদের উপর নির্ভর। নিখিলনাথ রায়ের নামেও আমাদের ভাগ্যে কিছু মিলিল না। ইতিহাস লিখিবার যে নবনীতি য়ুরোপে উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহার অনুসরণ করিলেও অনেকটা ফল হইতে পারে, বাধ্য হইয়া সংগ্রহকারকে অনেকটা খাটিতে হয়। পরিশ্রম না করিলে কি কোন কাজ সফল হইতে পারে? কিন্তু বাঙ্গালী খাটিতে চাহেন না। তাহার উপর আবার সাময়িক পত্রের জন্য প্রবন্ধ যেমন তেমন একটা হইলেই হইল। সম্পাদক রকমের খাতিরে ছাপিলেন, পেসাদারী পাঠক ছাড়া অপর পাঠক প্রবন্ধটি বাদ দিয়া পড়িলেন। ফল হইল—বঙ্গে ইতিহাস চর্চ্চা। রামদাস সেন মহাশয় ত অনেক দিন লোকান্তে গমন করিয়াছেন; বলি, তাঁহার মত করিয়া কয়জন লেখক এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন? ঐতিহাসিক

প্রবন্ধ লিখিতে পারিলে লোকে নাটক নবেল ফেলিয়া তাহা পাঠ করিবে। বিজ্ঞ সম্পাদকগণ মনে করিলে এসম্বন্ধে অনেকটা উপকার করিতে পারেন। দেশের লোকেও দু হাত তুলিয়া তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করিবেন।

"ইংরাজবর্জ্জিত ভারতবর্ষ" ইহাকে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ না ভ্রমণবৃত্তান্ত কি বলিব? সিংহলের প্রোথিত নগর অনুরাধপুরের আংশিক বিবরণ। লিখিবার গুণে মনে হয় যেন কাব্য পাঠ করিতেছি, মনেও হয় না যে অনুবাদ। লেখক শ্রীজ্যোতিরীন্দ্র নাথ ঠাকুর, বড় নাম বড় লেখক কিন্তু তবু যেন প্রবন্ধে একটা কাক জ্যোৎস্নার মলিনতা ও অস্পষ্টতা। "সন্ধ্যার দিকে, গ্রামের বিরলতা ও অরণ্যের নিবিড়তা ক্রমশই বাড়িতে লাগিল।" "অরণ্যের এই মহা নিস্তব্ধতার মধ্যে, নৈশ জীবনের স্পন্দন ও বিকাশ বেশ অনুভব করা যায়।" "আবার পথের সেই বৈচিত্রহীন শূন্যতা,—আবার সেই নিস্তব্ধতা—যাহা কেবল ঝিল্লীর আনন্দরবে মুখরিত।" দুই একটা ভাষার নমুনা দিলাম, পাঠক মহাশয় বিচার করিতে পারিবেন।

"সন্ধ্যার দিকে" ব্যাপারটা কি বুঝিয়াছেন Towards evening. ভারতীর "বেপথুবতী" রমণীর ন্যায়। "প্রায়শ্চিত্ত" গল্পটি নূতন নহে ঠিক এই ভাবের একটি গল্প ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল—তিন বৎসর পূর্ব্বে হইতে পারে। আমরা তাহার সমালোচনাও করিয়াছিলাম। "বিবিধ"—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যারায় সাহিত্য-সংবাদ আছে। বিলাতে সাহিত্য-পত্রে এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়া থাকে। অমুক গ্রন্থকার একখানি উপন্যাস লিখিতেছেন, অমুক একখানি উপন্যাস ছাপাইতেছেন ইত্যাদি। "এথিনিয়ম" পত্র এই পথের প্রদর্শক। রীতি মন্দ নহে।

বামাবোধিনী—শ্রাবণ, ১৩১১। ৪২ বর্ষ। ৪৯২ সংখ্যা। ৪২ বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশে একখানি পত্রিকা চলিয়া আসিতেছে ইহা মনে হইলে এদেশের জন্যও আশা হয় যে এখনও দেশ একেবারে উৎসন্ন যায় নাই। একটা ভাব, একটা উৎসাহ, একটা অধ্যবসায় লইয়া বরাবর ৪২ বৎসর যে জাতির একজনও থাকিতে পারে সে জাতির ভবিষ্যৎ কখনই অন্ধকারময় নয়। ইহা সত্য কথা। এবার এই সকল প্রবন্ধগুলি আছে। সাময়িক প্রসঙ্গ, ভারতীয় পুণ্যনদী, পাপের পরিণতি, বিজ্ঞান রহস্য, শতরঞ্চ ক্রীড়া, ইংরাজী প্রবচন, জন্মদিনের উপহার (পদ্য), জাপানী পরীর গল্প, বঙ্গ সাহিত্য (পদ্য), গর্ভিণীর কর্ত্তব্য, নারী সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদায় (পদ্য), নূতন সংবাদ, পুস্তকাদি

সমালোচনা, বামারচনা অর্থাৎ বীণাপাণি দুঃখিনীর তনয়া, শোকোচ্ছাস, হাস্থর আদর, শোকার্ত্তের প্রার্থনা। শশিপদ বাবুর জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ১৮৪০ খৃঃ অব্দে বরাহনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ২০ বৎসর বয়সে এঁড়েদহ নিবাসী ভোলানাথ ঘোষালের কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি আপনার স্ত্রীকে লুকাইয়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। স্ত্রী অনেক শিখিয়াছে দেখিয়া বাটীর অপর মহিলারা ও ক্রমে পাড়াপরসীরা পাঠ আরম্ভ করিল ক্রমে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। ৺ দীননাথ নন্দীর পূজার দালানে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৬৫ খৃঃ শশিপদ বাবু কেশব সেনের বক্তৃতা শুনিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করায় স্কুলটি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইল। উমা চরণ নন্দীর গৃহে অনেক চেষ্টা করিয়া একটি ঘর পাইলেন সেখানে স্কুল হইতে লাগিল। মনোমোহন ঘোষ, কুমারী কার্পেণ্টার, লর্ড নর্থব্রুকের কন্যা প্রভৃতি অনেক লোক এই স্কুল দেখিয়া অনেক সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। ১৮৭১ সালে শশিপদ বাবু সস্ত্রীক বিলাতগমন করেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন বঙ্গ মহিলা বিলাত যান নাই। ১৮৭৬ সালে তাঁহার সহধর্ম্মিণী পরলোক গমন করেন। পর বৎসর তিনি একজন বিধবাকে বিবাহ করেন। ১৮৮৭ সালে বরাহনগরে তিনি "বালিকা-নিবাস" ও "হিন্দু বিধবাশ্রম" প্রতিষ্ঠিত করেন। বেথুন কালেজের উন্নতির জন্যও অনেক পরিশ্রম করেন। "সাধারণ ধর্ম্ম সভা" শ্রমজীবী ও শ্রম-জীবিনী-দিগের জন্য খুলেন। তাঁহার কার্য্যের বিশেষত্ব এই যে পূর্ব্বে কেবল কুমারীদিগের শিক্ষার জন্যই হইয়াছিল বিধবা ও বিবাহিতা রমণীগণের জন্য কোন চেষ্টা হয় নাই। তিনিই এই মহৎ কার্য্যের সূচনা করেন। এখন তিনি জরাগ্রস্ত। বিধবাশ্রম উঠিয়া গিয়াছে।

আমরা শশিপদ বাবুর জীবনীর সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম। আমাদের সহিত তাঁহার মতের মিল না থাকিলেও আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিব যে তিনি একজন সদাশয় মহানুভব ব্যক্তি। পরের জন্য যার প্রাণ কাঁদে সেই প্রকৃত বড় লোক। এরূপ লোক হিন্দু ধর্ম্মটা কি একবার বুঝিতে পারিলে তাহার জন্য যে প্রাণপণ করিতেন সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কালের গতিকে দিশাহারা হইয়াছিলেন, সে যাহাহউক এবার বামাবোধিনীর প্রবন্ধগুলি বৈচিত্রময় ও সুখপাঠ্য। ভরসা করি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বামাবোধিনীকে কলুষিত করিতে পারিবে না।

প্রদীপ—শ্রাবণ, ১৩১১। এই প্রবন্ধগুলি আছে—কবিবর হেমচন্দ্রের কবিতা ও বঙ্গভাষার উপর তাঁহার প্রতিপত্তি, পাস্তুর ইনষ্টিটিউট, বিশ্বামিত্র ও মেনকা (সচিত্র পদ্য), রামকেলী-মেলা, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর), দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য, প্রেমের আহ্বান, (ক্ষুদ্র গল্প), কাব্যের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য, পাহাড়ী বাবা (উপন্যাস), কবিতা গুচ্ছ, গ্রন্থপ্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা।

"সাহিত্যে" আর আর্ট প্লেট দেখিতে পাই না ছবিও নাই। সচিত্র প্রদীপেও চিত্রের অভাব। এবার কিন্তু রবিবর্ম্মার "মেনকা ও বিশ্বামিত্র" ছবিটী আছে ও তাহার উপর একটি কবিতা আছে। বিলাতে যেমন Illustrated London News, Graphic, Black and White, Light and Shade প্রভৃতি ভাল ভাল ছবির কাগজ আছে আমাদের দেশে সেরূপ নাই। তবে কোন কোন পত্রিকা ছবি দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাও এখন সারাণি ভাঁটায় পরিণত। ভরসা করি প্রদীপ "চিত্রের" জন্য আয়োজন করিবেন। হেমচন্দ্রের কবিতা ও বঙ্গ ভাষার উপর তাঁহার প্রতিপত্তি—কাব্য কি, কবি কি হইতে আরম্ভ—ইহা এক নিশ্বাসে রামায়ণ। প্রবন্ধ লেখকের মতের সহিত আমাদের মতের মিল নাই। বোধ হইল কালীপ্রসন্ন ঘোষের বক্তৃতা শুনিয়া লেখক এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। মাঝে মাঝে তাঁহার কথার দোহাইও আছে। শেষে হারাণচন্দ্র রক্ষিতের কবিতা হইতে "গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা" উল্লেখ করিয়া কতকটা কবিতা তুলিয়া দিয়া লেখক প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ এবার প্রদীপে অতি কম।

বঙ্গদর্শন—৪র্থ বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১১, ৫ম সংখ্যা। এই বিষয়গুলি আছে গীতার দর্শন, কর্সিকাদ্বীপের একটি গল্প (অনুবাদ) স্বদেশী সমাজ, নৌকাডুবি (উপন্যাস)। গীতার দর্শন—লেখক সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন "অতএব দেখা যাইতেছে, সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্বে ঈশ্বরবাদ সমারোপিত করিয়া গীতা তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। সাংখ্য-দর্শনে কি সৃষ্টি, কি মুক্তি, কিছুতে ঈশ্বরের কোন সম্পর্কই নাই, সাংখ্যের লক্ষ্য যে কৈবল্যমুক্তি, তাহা লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়—জ্ঞান। কিসের জ্ঞান? সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান—প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ জ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞান যাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে, তাঁহার মুক্তি সুনিশ্চিত। এই জ্ঞান

দ্বারা পুরুষ যখন আপনাকে আপনি সম্যক্‌রূপে জানিতে পারে, তখন প্রকৃতি নর্ত্তকীর লীলা খেলা থামিয়া যায় সৃষ্টির বিরাম হয় তখনই জীব দুঃখের অধিকার ছাড়াইয়া কৈবল্যধামে উপনীত হয়। ইহাই সাংখ্য-প্রদর্শিত মুক্তি পথ। গীতা নির্দ্দিষ্ট মুক্তিপথ স্বতন্ত্র। ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সে পথে বিচরণ করিতে হয়। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া, জীবের মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই।" লেখকের সহিত আমাদের মতের মিল নাই। আমরা সাংখ্যকে নিরীশ্বর বলি না স্থানাভাবে দেখাইতে পারিলাম না। সময় পাইত দেখাইব। "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া রবি বাবু ত ধন্য হইলেন। শ্রোতারাও ধন্য হইয়াছে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, কাজে কিছু হইবে কি? এ যে সাহারার মরুভূমি।

বিজ্ঞাপন।

হুগলী-কাহিনী।

বা

হুগলী জেলার ধারাবাহিক ইতিহাস।

("পূর্ণিমা" হইতে পুনর্মুদ্রিত।)

আকার ডিমাই ৮ পেজী, আর্ট পেপারে একুশখানি সুন্দর হাফ্‌টোন্ ছবি-সমেত আড়াই শতাধিক পৃষ্ঠা। মূল্য ২৲। সুন্দর বাঁধাই ২॥০ পূর্ণিমা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

কয়েকখানি সংবাদপত্রের মত—

বঙ্গবাসী বলেন—"হুগলী-কাহিনী" লেখকের পূর্ণ গবেষণা পরিচায়ক; পরন্ত কৌতকোদ্দীপক। "হুগলী-কাহিনী"তে অনেক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। * * * এই হুগলী-কাহিনীতে অনেক কৌতকোদ্দীপক গূঢ় তত্ত্ব আছে।

২৬শে বৈশাখ, ১৩১০।

এডুকেশন গেজেট বলেন—"হুগলী-কাহিনী" সুন্দররূপে লিখিত হইতেছে। ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০।

বিকাশ বলেন—"হুগলী-কাহিনী" উপাদেয় হইতেছে। ৭ই শ্রাবণ, ১৩০৮।

ধর্ম্ম ও কর্ম্ম বলেন—"হুগলী-কাহিনী" যেমন ঐতিহাসিক ব্যাপারে পূ- তেমনি সরল ও মনোহর ভাষায় লেখা। শ্রাবণ, ১৩১০।

প্রথম সংস্করণ প্রায় নিঃশেষিত হইতে চলিল।

১২শ বর্ষ—৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা। আশ্বিন ও কার্ত্তিক—১৩১১।

পূর্ণিমা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম—

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল; শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এল;
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীমতী সুশীলমালতী দাসী;
শ্রীআনন্দময় শর্ম্মা প্রভৃতি।

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১। রাবণ	১১১
২। অমানিশি	১১৬
৩। গদাই পুরুত	১১৮
৪। শরতে শঙ্কর	১৩৭
৫। ওই আঁখিপানে [চারুচন্দ্র]	১৪৫
৬। মাসিক সাহিত্য সমালোচন	১৪৬

বাঁশবেড়িয়া,

পূর্ণিমা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

শাখাকার্য্যালয়—২৪ নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩১১।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। এক সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।
ঐ সুলভ সংস্করণ ১॥০ টাকা। ঐ সুলভ সংস্করণ ৵০ আনা।

ডাক্তার মেজরের ইলেক্ট্রো-সার্শাপ্যারিলা

চিকিৎসা-জগতে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে।

রক্তই মানবদেহের জীবনশক্তি, তাড়িত-শক্তিই জীবনশক্তির মূল।

প্রতিদিন নানা প্রকারে, বিশেষতঃ আহার বিহারে, অত্যাচার অনাচারে, নিশ্বাস প্রশ্বাসে মানবদেহে বিষ প্রবেশ করিয়া থাকে। এই বিষ ক্রমে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া দেহাভ্যন্তরস্থ তাড়িতশক্তির হ্রাস করে, এবং পরিণামে প্রায়ই সাধারণতঃ শোণিত সম্বন্ধীয় পীড়া উৎপন্ন হয়। যে ঔষধ ঐ রক্তদুষ্টির বিষ তিরোহিত করিয়া ঐ হ্রাসপ্রাপ্ত বৈদ্যুতিকশক্তির সামঞ্জস্য সম্পূর্ণরূপ রক্ষা করিতে পারে,

তাহাই প্রকৃত ঔষধ; এই—

"ইলেক্ট্রো-সার্শাপ্যারিলাই"

তাহার একমাত্র আদর্শ।

ইলেক্ট্রো-সার্শাপ্যারিলার মূল্যাদি; সর্ব্বপ্রকার মুদ্রিভারষতাত ব্যবস্থাপত্র সংবলিত ৮ দিন সেবনোপযোগী প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৲ টাকা; ৩ শিশি ৫৷৹ টাকা; ৬ শিশি ১০৷৹ টাকা; ডজন ২০৲ টাকা; প্যাকিং ও মাশুল ইত্যাদি যথাক্রমে ৵৹; ৵৶৹; ১৷৹; ৷৵৹। পাইকারগণের পক্ষে দর স্বতন্ত্র।

সংখ্য অযাচিত প্রশংসাপত্র ঔষধের অব্যর্থতার, অকৃত্রিমতার ও অলৌকিকতার জ্বলন্ত প্রমাণ, জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে, আবেদন করিলেই তাহা বিনা মাশুলে সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়।

ডবলিউ মেজর এণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা।

রাবণ।

অমিততেজস্বী লঙ্কাধিপতির উৎপত্তি অতিপ্রকৃত। বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয় ও বিজয় ব্রহ্মশাপে তিনবার ধরাতলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা প্রথম জন্মে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু রূপে, দ্বিতীয় জন্মে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ রূপে এবং তৃতীয় জন্মে দণ্ডবক্র ও শিশুপাল রূপে জন্মগ্রহণ করেন। সেই বৈকুণ্ঠদ্বারী জয় দ্বিতীয় জন্মে রাবণ রূপে অবতীর্ণ হইয়া যে সকল কার্য্য করেন তাহারই আলোচনা আমাদিগের অদ্যকার বিষয়।

কীর্ত্তিবাসের মতে বৈশ্রবণ নিকষার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের বয়োপ্রাপ্তি-কালে যে পুত্র সমুদ্‌ভুত হয় সেই পুত্রই রাবণ নামে বিখ্যাত। জন্ম প্রাপ্তির পরক্ষণ হইতেই রাবণ আত্মবিস্মৃত হইলেন এবং পিতামাতার চরিত্রানুযায়ী তাঁহার মনোবৃত্তি সমূহের গঠন হইতে লাগিল। এই কাল হইতেই তিনি তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন এবং সহস্র বৎসর তপস্যার পরে ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। রাবণ বর প্রার্থনা করিলেন "আমাকে অমর করিয়া দিউন্" ব্রহ্মা কহিলেন "উহা অসম্ভব। তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমায় এই বর দিলাম যে তুমি ত্রিভুবন বিজয়ী হইবে। দেবাসুর তোমার দাস হইবে। সমগ্র ধরিত্রী তোমার বহুকাল ভোগ্যা হইয়া থাকিবে।"

এই ঘটনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে রাবণ রক্ষোকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তদানীন্তন রাক্ষসদিগের প্রবৃত্তিনিচয় প্রাপ্ত হয়েন। বিশ্বজয়ের আকাঙ্ক্ষা, অমর হইবার আকাঙ্ক্ষা, সাধারণ জাগতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইবার তীব্র অভিলাষ, সমর বাঞ্ছা প্রভৃতি প্রবৃত্তি একটা উচ্চদরের অন্তঃকরণেরই পরিচয় দেয়। রাজবংশে যাহার জন্ম সে যদি রাজধর্ম্মে অনুরক্ত না হয়, রাজধর্ম্ম এবং রাজনীতির রক্ষণার্থে সে যদ্যপি যত্নশীল না হয়, তাহা হইলে তাহার রাজবংশে জন্মগ্রহণের মর্য্যাদা কোথায়?

ব্রহ্মার বর প্রভাবে এবং পিতা বৈশ্রবণের তেজঃ প্রভাবে রাবণ কালক্রমে অমিত তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। দিগ্বিজয়ে স্পৃহা জন্মিল। রাবণ দেশজয় করিতে আরম্ভ করিলেন। লঙ্কাধিপতি কুবেরের সমগ্র ঐশ্বর্য্য তিনি স্ববলে কাড়িয়া লইলেন এবং তাঁহাকে লঙ্কা হইতে দূরীভূত করিলেন। কুবের কৈলাশ পর্ব্বতে আশ্রয়-

গ্রহণ করিলেন। রাবণ স্বর্ণপ্রসবিনী লঙ্কার সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। কথিত আছে যে রাবণ সহস্রাধিক পত্নীর পাণি গ্রহণ করেন এবং তিনি এক লক্ষ পুত্রের পিতা এবং এক কোটি পৌত্রের পিতামহ হইয়াছিলেন। ফলতঃ রাবণ বহু পরিবার পরিপোষণ করিতেন এবং বহু প্রজার চিন্তা আপন মুকুটে আবৃত করিয়া রাখিতেন।

এই সময়ের এক অতিপ্রকৃত ঘটনা রামায়ণে বিবৃত আছে। কথিত আছে যে রাবণ ঐশ্বর্য্যশালী নরপতি হইতে দীনতম তপস্বী পর্য্যন্ত সকলেরই নিকট কড়ায় গণ্ডায় রাজস্ব আদায় করিতেন। একদিন তিনি কতিপয় ভিক্ষুতপস্বীর নিকট রাজস্ব যাচ্ঞা করিলেন। তাহারা বিপন্ন হইল। কপর্দ্দকশূন্য ভিক্ষুক কি কোথায় পাইবে? তাহারা নখাঘাতে আপন আপন বক্ষ চিরিয়া বিন্দু বিন্দু শোণিত রাজাকে উপহার দিলেন—এই ধর রাজা তোমার রাজকর দীন ভিক্ষুর বক্ষশোণিত। নরকাগ্নি শিখার মত তোমার রাজস্ব গ্রহণের লালসা এই শোণিতে নির্ব্বাপিত হউক। রাবণ স্মিতমুখে ব্রাহ্মণের বক্ষশোণিত কর বলিয়া গ্রহণ করিলেন। গৃহে গিয়া প্রিয়তমা মহিষী মন্দোদরীকে সেই শোণিত পান করিতে দিলেন। এই শোণিত পানে মহিষী সত্ত্বতী হইলেন এবং অসময়ে দক্ষিণোদর ভেদ করিয়া তাঁহার সুরূপা এক কন্যা জন্মাইল। মন্দোদরী তাহাকে ভেলকে স্থাপন করতঃ সমুদ্রে ভাসাইয়া দিলেন। সেই ভেলক তরঙ্গ তাড়িত হইয়া জনকের রাজ্য মিথিলায় উপনীত হইল এবং কালে মৃত্তিকায় আবৃত হইয়া রহিল। বহুকাল পরে রাজর্ষি জনকের হল কর্ষণে এই মৃত্তিকা ভেদ হয় এবং জনক মন্দোদরী কন্যাকে আপন কন্যারূপে প্রাপ্ত হয়েন।

রাবণের এই আসমুদ্র করগ্রাহী প্রবৃত্তি ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। তিনি আপন কর্ত্তব্য এবং রাজার প্রাপ্য এই উভয় বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়াই উল্লিখিতরূপ নির্ম্মমতায় বিজড়িত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। রাজকর্ত্তব্যের অনুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে অনেক সময়ে নির্দ্দয় হইতে হইয়াছিল। মনুষ্য মাত্রকেই এই প্রকার ঘটনাচক্রে তাহার ইচ্ছার বিরোধী কতকগুলা অবস্থায় বাধ্য করে—এবং তাহার জীবনে ও কার্য্যকলাপে বিশিষ্ট ব্যতিক্রম ঘটাইয়া থাকে। জীবনের উদ্দেশ্য দৃঢ় থাকিলেও মনুষ্যকে ঘটনাচক্রে অবস্থান্তর প্রাপ্ত করায়। ইহার উপর তাহার কোন হাত নাই।

ইহার পর রাবণ ত্রিপুর বিজয়ে অগ্রসর হইলেন। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বলে

রাবণ সর্ব্বত্র জয়লাভ করিতে লাগিলেন, পুত্র মেঘনাদ সুরপুর জয় করিলেন। আদর করিয়া রাবণ পুত্রের নাম দিলেন ইন্দ্রজিত।

এপর্য্যন্ত রাবণ নিশ্চিন্ত মনে আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া আসিতেছিলেন। এই সময়ে হল কর্ষণে সীতার উদ্ভব হইল। কালক্রমে তিনি বিবাহ যোগ্যা হইলে তাঁহার স্বয়ম্বর সভা রচিত হইল। তথায় এক সুবৃহৎ ধনু সংস্থাপিত হইল এবং আদেশ হইল যে ব্যক্তি ঐ ধনুর্ভঙ্গে কৃতকার্য্য হইবেন তিনিই সীতার করগ্রহণে নির্ব্বাচিত হইবেন।

রাবণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। একে একে অনেকেই আপনাপন অযোগ্যতা প্রতিপন্ন করিলেন। রাবণের বাহুবল বিংশতি বাহুর বল সদৃশ হইলেও তিনি ধনুরুত্তোলনে অকৃতকার্য্য হইলেন। তাঁহার জীবনে অনুষ্ঠিত কর্ম্মে তিনি এই প্রথম অকৃতকার্য্য হইলেন। তিনি রাজা—বাহুবলে অদ্বিতীয়; আজি একখানা ধনু ধারণের বল তাঁহাতে রহিল না—এ কি কম লজ্জার কথা? এই লজ্জার কথা দেশে দেশে ঘোষিত হইবে। রাবণ পথে রথারোহণে যাইবেন আর পথের বালকগুলা তাঁহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া এই লজ্জার কথা কহিবে। "ঐ লঙ্কা দিগ্বিজয়ী রাবণরাজ আসিতেছেন। মহাবীর—একখানা ধনু ভাঙ্গিতে পারেন নাই।" তখন তাঁহার মুখ লুকাইবার স্থান থাকিবে না। লজ্জায় ক্রোধে মর্ম্মাহত হইয়া রাবণ স্বপুরে নিবৃত্ত হইলেন।

আর কিছু দিন কাটিল। পঞ্চবটী বনে রাম পিতৃ সত্য পালনার্থ জনক তনয়া ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে তপস্বীবেশে আগমন করিলেন। সুর্পণখা লক্ষ্মণের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী হইলে লক্ষ্মণ তাহার সমুচিত ব্যবস্থা করিলেন। সুর্পণখা লঙ্কায় গিয়া আপন অগ্রজকে সকল কথা জানাইল। রাবণের পূর্ব্ব প্রধূমিত প্রেমবহ্নি আজি জলিয়া উঠিল। জলন্ত পাবক শিখার লোভে তিনি কালফাঁদে উড়িয়া পড়িলেন। মায়া মৃগ জাল পাতিয়া তিনি ভিক্ষুর বেশে সীতা হরণ করিলেন, তাঁহার গৃহাকাশে কালধূমকেতু সমুদিত হইল।

সীতার রোদনে জটায়ু অগ্রসর হইয়া রাবণকে সাবধান করিলেন। পরে যুদ্ধ করিয়া নিধন প্রাপ্ত হইলেন। রাবণ জটায়ুর পক্ষমূল ছেদন পূর্ব্বক সীতাকে বক্ষে ধারণ করিয়া "অন্তর্ব্যাকুল বিদ্যুদম্বুদ" সদৃশ শূন্যে উত্থান করিলেন।

পুরমহিলাগণ সতীর পীড়ন চক্ষে দেখিলেন। স্বয়ং নিকষা আসিয়া পুত্রকে কহিলেন—

"দেবতা গন্ধর্ব্ব নহে সীতা ত' মানুষী
কত বড় দেখিয়াছ তাহারে রূপসী।
রাক্ষস হইয়া কেন মানুষীতে সাধ
এখনি যে দেখিতেছি পাড়িবে প্রমাদ।
যে রাম কৃতান্তদণ্ড তুল্য দণ্ডধারী
কি বুঝিয়া আন তুমি সে রামের নারী।
আমার বচন শুন পুত্র লঙ্কেশ্বর
সীতা দেবী দেহ নিয়া রামের গোচর।"

ইহার উত্তরে রাবণ যাহা বলিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই "তুমি আমার মা—অন্য কেহ হইলে তাহার প্রাণবধ করিতাম।"

এই ঘটনা পাঠ করিয়া আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই যে রাবণ কঠিন প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি নিজে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন ভাল হউক মন্দ হউক সে কার্য্য কখন অসম্পূর্ণ রাখিতেন না। কর্ম্মবীরের ইহাই লক্ষণ। ভুল ভ্রান্তি মানুষ মাত্রেরই আছে। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে আর মহত্ব থাকে না—অধিকন্তু লোকের উপহাসাস্পদ হইতে হয়। যখন উপর্য্যুপরি রাবণকে "সীতা ফিরাইয়া দাও—নহিলে তুমি রামের বধ্য হইবে। সীতা জনক দুহিতা,—রাম রঘুনন্দন—তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন কর—তাঁহাদের ভয় কর। সীতা ফিরাইয়া দিয়া রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হও" ইত্যাকার কথা সকলে বলিতে লাগিল তখন রাবণের মুখে যে সদর্পোক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা সর্ব্বথা বীরজনোচিত।

"জানামি সীতাং জনকস্য সুতাং
জানামি রামং রঘুনন্দনঞ্চ
অহঞ্চ জানামি রামস্য বধ্য
তথাপি সীতাং ন সমর্পয়ামি।"

প্রাণ দিতেও প্রস্তুত তথাপি অনুষ্ঠিত কর্ম্মে অন্যথা হইবে না। এইরূপ ধারণা উচ্চ হৃদয়ের আদর্শ হইলেও রাবণ পূর্ব্ব হইতে বলদর্পে অন্ধ হইয়াছিলেন।

তাহার পর এই সীতা লইয়া রাবণের এক লক্ষ পুত্র ও এক কোটি পৌত্র ধ্বংশ প্রাপ্ত হইল। তথাপিও প্রত্যাবর্ত্তন নাই। কি প্রতিজ্ঞা। কি একাগ্রতা।

এইরূপ প্রতিজ্ঞা এই একাগ্রতা না থাকিলে মানুষ কখন উন্নত হইতে পারে না। এইরূপ একাগ্রতা উন্নতি বিধায়ক হইলেও সম্যক্ জ্ঞান পূর্ব্বক চালিত না হইলে মহা অনিষ্টের সূত্রপাত করে। রাবণের অদৃষ্টে এই ভ্রম জন্মিল তাই এই মহা অনিষ্ট তাঁহার অতুলনীয় রাজত্ব ছারখার করিয়া দিল।

আর এক শক্তি—ভুবনমোহিনী উন্মাদকারিনী সর্ব্বসংহারিনী শক্তি রূপতৃষ্ণা। রাবণের অতুলনীয় কীর্ত্তি—অনন্ত রত্ন প্রসবিনী লঙ্কা—শক্রলেশ শূন্যা রাজলক্ষ্মী—সকলই সেই রূপশিখায় ভস্মীভুত হইল যখন উপায় নাই তখন রাবণ বুঝিয়াছিলেন। হায়! সে প্রবুদ্ধি অনুতপ্তেরই ঘটে। যে কর্ম্ম নিরবচ্ছিন্ন তাহার ফল কোথায় যাইবে। বুদ্ধির দোষে ভ্রমের বশে একাগ্রতা কুপথে চালিত হইয়া যখন সর্ব্বনাশ ঘটাইল তখন রাবণ শোকে অভিভূত হইয়া বিলাপ করিয়া কহিলেন—

"সেবিনু শিবেরে আমি বহুযত্ন করি' লভিতে কি এই ফল?"

হায়! দুর্ব্বদ্ধি রাবণ! বুঝিলেনা যে শিব পূজার ফলে সর্ব্বনাশ হয় নাই। সর্ব্বনাশের অন্যান্য অনেক কারণ ছিল। হতভাগ্যের এইরূপই ঘটে। পূর্ব্বকৃত দুস্কৃতের ফল তাহারা ভ্রমবশতঃ অনুষ্ঠিত মঙ্গল কর্ম্মে আরোপ করিয়া সমগ্র মঙ্গলানুষ্ঠানের নিন্দা করে।

তাহার পর শেষ প্রবুদ্ধি। আপনার মৃত্যুঅস্ত্র দেখিয়া রাবণ বুঝিয়াছিলেন যে যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা হইতে পরিত্রাণ নাই। বুঝিলেন যে শুভাশুভ কর্ম্মের ফলদাতা রাজাধিরাজাপেক্ষাও উচ্চাসনে বসিয়া থাকেন। কর্ম্মসাগর মন্থনে ফলস্বরূপে যে বিষ উত্থিত হয় তাহা অপরিহার্য্য—তাহা হইতে পরিত্রাণ নাই। তখন নিরুপায় হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন।

মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে রামচন্দ্রকে যে সকল রাজনীতি—শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বথা উল্লেখ যোগ্য। রামচন্দ্র রাজকার্য্যে এখনো শিশু—এবং রাবণ একজন রাজনীতিবিশারদ প্রবীন রাজা।

অনুরুদ্ধ হইয়া শেষ সময় রাবণ যে সকল নীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটির প্রতি পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

প্রথম নীতি। শুভ কর্ম্মে—আলস্য পরিহার্য্য। আলস্য বশতঃ ফেলিয়া রাখিলে উহা আর হয় না।

দ্বিতীয় নীতি। পাপকর্ম্ম—বিলম্বে সম্পাদিত হইলে সর্ব্বনাশ ঘটে না।

অমানিশি

আঁধারের গায় ঠেকেছে আঁধার
ভুবন ভরিয়া আঁধার রয়,
জ্বলিছে জোনাকী গাছের পাতায়
ধীরি ধীরি গতি মলয় বয়।

গগনে কোথায় শশাঙ্ক ঘুমায়
বিরল আলোকে নক্ষত্র হাসে,
তরু তুলি মাথা দাঁড়ায়ে আঁধারে,
ঘোর অন্ধকার চৌদিকে ভাসে।

বাহিরে আঁধার হিয়ায় আঁধার
আঁধারে আঁধারে মিশিয়ে রয়!
আজি এ আঁধার ছড়াছড়ি যায়
আঁধারে বসুধা তমসাময়।

ভন্ ভন্ করে গায় মশাগণ
সুমধুর তানে শয়ন গৃহে,
প্রাণের ভিতর কত কথা উঠে
দর দর ধারা দুনয়নে বহে!

ডাকিছে পেচক ভগ্ন গৃহ ছাদে
কর্কশ কণ্ঠের উঠিছে ধ্বনি,
আসিতেছে চিন্তা ল'য়ে দীর্ঘশ্বাস
আমার কাছে দেখে একাকিনী।

চিন্তারে দেখিয়া নিদ্রা যে পালায়
রাখিয়া আমায় চিন্তার কাছে,
বৃশ্চিকের দল র'য়েছে যে চেয়ে
আমারি তরেতে চিন্তার পাছে।

অমানিশি তোরে বড় ভালবাসি
তাই থাকি চেয়ে তোমারি পানে,
হেরিয়া তোমার আঁধার মুরতি
কত স্মৃতি মম উঠিছে প্রাণে।

যারা ফোটাফুল আছে বৃন্তপরে
তাহারা হাসিবে জোছনা উদিলে—
আমি বৃন্তচ্যুতা দলিত কুসুম
জেগে রব ঐ আঁধার দেখিলে।

চন্দ্রমার আলো নাহি লাগে ভালো
জোছনায় হৃদি দহিয়ে যায়,
হৃদয়ের চাঁদ গিয়াছে ডুবিয়া
স্মৃতির আলোটি জ্বলিছে হায়।

বারমাস মম হৃদয় মাঝারে
উদয় হ'য়েছে কৃষ্ণ পক্ষ নিশি,
নাহিত—জোছনা ডুবেছে চন্দ্রমা
সকলি গিয়াছে আঁধারে মিশি।

কুহরেনা পিক ফোটেনাক ফুল
হাসেনাক লতা মধুর হাসি,
হৃদি কুঞ্জবন আগুনে পুড়েছে
আছে সুধু ছাই ভস্মের রাশি।

আশার লতাটী নিরাশা বিষেতে
হৃদয় মাঝারে জ্বলিয়া গেছে,
হাসির কুসুম শুকায়ে ঝরিল
শান্তির মলয় কোথা পলায়েছে।

তপ্ত দীর্ঘশ্বাস আছেত হৃদয়ে
তৃপ্তি কোথা আজি গিয়াছে চলি,
চিন্তা হল রাণী হৃদয় মাঝারে
পাছে দুঃখ কান্না আছে সকলি।

বেস বেস নিশি পরিয়াছ বেশ
আঁধার বসনে ঢেকেছ মুখ,
নিরখি তোমার এ রূপ সজনি—
উথলিছে হের আমারি বুক।

ক্ষণ পরে আমি হারাব তোমায়
তাই সখি মম হ'তেছে ভয়,
আমারে কাঁদাবে তোমারে সরাবে
রূপবতী ঊষা হইয়ে উদয়।

সখিরে আমার প্রভাত জীবন
আঁধার করেছে মেঘেতে ঢাকি,
আঁধার মাখিয়া সর্ব্বাঙ্গে সজনি—
আঁধারের কোলে পড়িয়া থাকি।

মনে পড়ে মোর প্রভাত জীবনে
হেসেছিল এক "তরুণ রবি"
কাল মেঘ দল ঢেকেছে তাহারে
হৃদে আঁকা মোর আছে সে ছবি।

তাই ভাল বাসি আঁধার যামিনী
হিয়ায় বাহিরে হয় মেশামিশি,
তোমারি আঁধারে তোমারে ধরিয়ে
এস তব কোলে ডুবে যাই মিশি॥

শ্রীসুশীল মালতী দাসী।

গদাই পুরুত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বন্ধু। There are more things in Heaven and Earth than Philosophy dreams of হাঁ এ সম্বন্ধে আমি একটি গল্প জানি। আমার এই বিশ্বাস্ যে মহাপুরুষগণ জীব তরাইবার জন্য সবিশেষ চেষ্টিত হইয়াছেন। জীবের

মঙ্গল সাধন করা ভিন্ন তাঁহাদের অধিকতর আনন্দদায়ক কার্য্য আছে কি না তাহা আমি জানি না অবশ্য আমি সাধনার কথা ত্যাগ করিয়াই বলিতেছি। কলি যতই প্রচণ্ড হইতেছে মহাপুরুষগণের কৃপা প্রস্রবণও ততই অধিকতর উন্মুক্ত হইতেছে। এ বিষয়ে আর এক সময়ে আপনার সঙ্গে আমার কথা হইবে। এখন গল্পটা বলি শ্রবণ করুন।

কলিকাতা রাজধানীতে নাই এমন বস্তু নাই—গল্প শুনিলেই পরে এ কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন। সহর কলিকাতায় একটি খৃষ্টান পরিবার বাস করেন। আপনার জানা আছে কি না জানি না প্রথম প্রথম এদেশের লোক যাহারা খৃষ্টান হইয়াছিলেন তাহাদের বড় বড় চাকরী হইয়াছিল। সাহেবেরা তাঁহাদিগকে সুনয়নে দেখিতেন এবং তাঁহাদের প্রতি হিন্দু সমাজের শত্রুতা স্মরণ রাখিয়া তাহাদের জীবন যাত্রা যাহাতে স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হয় তাহার উপায় করিয়া দিতেন, যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে মান সম্ভ্রমে তাহাদের দিন কাটিয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিতেন। সাহেব মহলে এই সকল দেশীয় খৃষ্টানের একটা পসার ও আধিপত্য ছিল। সাহেবেরা খুবই খাতির করিতেন। এদেশে যখন পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার পন্থা উন্মুক্ত হইল যখন দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত প্রথম প্রবাহিত হইল তখন সেই স্রোতে পড়িয়া অনেকে ভাসিয়া গিয়াছিলেন মাথা ঠিক রাখিতে পারেন নাই। না পারিবারই কথা, তৎকালিক লোকে একবারে পুতুল পূজার বিরোধী হইয়াছিলেন। ধর্ম্মকর্ম্মের মাথায় পা দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এক-বারে যাহা কিছু এদেশীয় সব মন্দ যাহা কিছু বিদেশীয় সব ভাল এই মত তাহাদের দাঁড়াইয়াছিল। ইটালীর ডিরোজীও সাহেব প্রভৃতি শিক্ষকগণ আবার অহরহ এই সকল উপদেশ দিতেন কাজেই চঞ্চলমতি যুবকগণ মস্তিক হারাইয়াছিলেন তাঁহারা সত্য সত্যই বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে ইংরাজের আচার ব্যবহার ধর্ম্ম কর্ম্ম সব গ্রহণ না করিলে আর আমাদের মঙ্গল বা নিস্তার নাই। তাই যুবকের দল প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়াইয়া মদ্য ও গোমাংস ভক্ষণ করিয়া এতদিনে ভারতের উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইল বা আরম্ভ হইল বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল স্রোতে সমাজ একেবারে আমূল আলোড়িত হইয়াছিল। প্রসঙ্গ ক্রমে বলিতে পারি যাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছিলেন তাঁহারা কিন্তু শত হস্ত দূরে অপসরণ করিয়া-ছিলেন। রামমোহন রায় প্রভৃতির মস্তিষ্ক বা হৃদয় খৃষ্টধর্ম্ম অধিকার করিতে পারে নাই। তাঁহারাও কিন্তু সভ্যতার স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিলেন এক reformed

religion (সংস্কৃত ধর্ম্ম) বা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। প্রথম সভ্যতা স্রোতে যখন উচ্ছৃঙ্খলতা ও নাস্তিকতা আসিয়া পড়িল তখন রাজাও ভয় পাইয়াছিলেন কেন না ধর্ম্মরাজ্যে অরাজকতা রাজনীতির দৃষ্টিতে রাজার পক্ষে মঙ্গলকর নয়। তাই যখন মিশনরীরা প্রজা ধরিয়া খৃষ্টান করিতে লাগিলেন শাসক তখন খুসী হইয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন ইংলণ্ডে যেমন সাক্ষণ নর্ম্মাণ মিলিয়া গিয়াছিল কালে ভারতেও তাহাই হইবে। তাই রাজসরকারে খৃষ্টানের খাতির ছিল। একদা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কালীঘাটের ৺ কালী মাতার পূজা দিতেন। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী শাসকের কালী পূজার আর কি অর্থ করা যাইবে—কেবল প্রকৃতি পুঞ্জকে সন্তুষ্ট রাখা বইত নয়। পুরাতন কাগজপত্রে দেখিতে পাওয়া যায় কোন কোন সাত্তিক খৃষ্টান এ পূজার যোগ দিতে অস্বীকার করিতেন মান্দ্রাজের সেনাপতি একবার বড় গোল বাধাইয়াছিলেন। যে কোম্পানি একদিন মিশনরীর উপর পাছে রাজনৈতিক গোলযোগ ঘটায় এই ভয়ে খড়্গ হস্ত ছিলেন সেই কোম্পানি আবার মিশনরীর উপর সস্নেহ নয়নে দেখিয়াছিলেন। ইতিহাসের পাঠক জ্ঞাত আছেন কি করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম মিশনরীর অন্নে ধুলা দেয় আবার কি করিয়া রামকৃষ্ণ পরমহংস সেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে যথার্থ পথ দেখাইয়া দেন ও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে টানিয়া লন; কি করিয়া নাস্তিকতা ছাড়িয়া লোকে খৃষ্টান হইত; খৃষ্টানী ছাড়িয়া ব্রাহ্ম হইত; আবার ব্রাহ্মধর্ম্ম ছাড়িয়া হিন্দু হইতে লাগিল। আমাদের এখন সে কথায় কাজ নাই। আমি বুঝাইতেছিলাম যে প্রাথমিক খৃষ্টানেরা রাজদ্বারে যথেষ্ট ধন মান ও সম্ভ্রম পাইতেন।

ধর্ম্মের এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্রোত দেখিয়াছে—এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়াছে এমন একটি খৃষ্টান পরিবার কলিকাতায় ছিল। সেই পরিবারের কর্ত্তা, বলাই বাহুল্য ধনে ধনী, মানে মানী, ও সম্ভ্রমে সম্মানিত হইয়াছিলেন। রাজদ্বারেও সম্মান যথেষ্ট। কর্ত্তা অনেক দেখিয়াছিলেন, অনেক শুনিয়াছিলেন, অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম ছাড়েন নাই। তবে তাঁহার মনের কথা কি—তাহা কে বলিবে?

একদিন কর্ত্তা বেলা দশটার সময় কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে যাইবার জন্য প্রস্তুত। বাহিরে রাস্তায় সজ্জিত শকটে সচাবুক শকট পরিচালক সতৃষ্ণ নয়নে দ্বারের দিকে চাহিয়া আছে; আড়দালীর দল ততোধিক সতৃষ্ণ নয়ন ও উদ্বেগ বিশিষ্ট; ইঙ্গিতে বিদ্যুতবেগে চলিয়া যাইবে। কর্ত্তা আসেন আসেন আসেন না। এমন সময়

অন্যমনস্ক ভাবে কর্ত্তা আসিয়া দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সহসা কোথা হইতে একটি বৃদ্ধা রমনী ভিখারিণী বেশে আসিয়া কর্ত্তার গন্তব্য পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। আড়দালীর দল হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল কিন্তু কর্ত্তা বাবু তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া ভিখারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি চাও?" ভিখারিণী বলিল "তুমি আমাকে দশটা টাকা এখনই আনিয়া দাও" কর্ত্তা বলিলেন "সে কি তুমি কে তোমাকে আমি দশ টাকা কেন আনিয়া দেব।" ভিখারিণী বলিল "বিলম্ব করিও না টাকা আনিয়া দাও বৃথা বিলম্ব করা, তোমাকে এখনই টাকা আনিয়া দিতে হইবে।" এই বলিয়া ভিখারিণী চুপ করিয়া ভূমিতে দৃষ্টিসংলগ্ন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কর্ত্তা অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু ভিখারিণী আর কোন উত্তর না দিয়া হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কর্ত্তা কোন অদৃশ্য শক্তি বলে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাটী ফিরিয়া গেলেন, উপরে গিয়া টাকার তোড়া খুলিলেন দশটি টাকা লইয়া আবার নামিয়া আসিলেন ও নিজ হস্তে ভিখারিণীকে সেই দশটি টাকা দিলেন। ভিখারিণী হাত পাতিয়া টাকা কয়টি লইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল "আমার সঙ্গে রাস্তার এক পার্শ্বে এস।" খৃষ্টান কর্ত্তাটি মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় বৃদ্ধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। চাকর নফর ব্যাপার দেখিয়া অবাক। সে যাহাহৌক একটু একান্ত স্থানে গিয়া বৃদ্ধা বলিল "সন্ধ্যার পর এই বৃক্ষতলে আমি আসিয়া থাকিব তুমি একাকী অন্ধকারে এই স্থানে আসিবে। তোমাকে লইয়া আমি কোন স্থানে যাইব।" এই বলিয়াই প্রত্যুত্তর না শুনিয়া বৃদ্ধা দ্রুত গমনে চলিয়া গেল। কর্ত্তাটি হতভম্ব হইয়া সেই খানে দাঁড়াইয়া গমনশীলা সেই রমণীর মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। অচিরে সেই মূর্ত্তি নয়ন পথ বহির্ভূত হইয়া গেল।

কর্ত্তা তখন ধীরে ধীরে আসিয়া শকটারোহণে আপনার গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন। সমস্ত দিন তিনি অন্যমনস্ক ও চিন্তামগ্ন। কত কি সারা দিন ধরিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কোন একটা মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলেন না। অপরাহ্নে বাটী ফিরিয়া আসিলেন। সহস্রবার প্রতিজ্ঞা করিলেন যে অজ্ঞাতকুলশীলের সঙ্গে যাইব না। কেন বৃথা দশ টাকা দিলেন এইজন্য আপনাকে শতবার ধিক্ দিলেন। কাহাকেও কিছু বলিতে পারিলেন না, চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারিলেন না, মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, কোন অদৃশ্য শক্তি বলে পরিচালিত হইয়া আবার যথা সময়ে বৃদ্ধা ভিখারিণীর উপদেশ অনুসারে একাকী সেই বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন

কেহই নাই। তবু ফিরিতে পারিলেন না সেই থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন সহসা সেই স্ত্রীমূর্ত্তি সেই বৃক্ষতলে উদয় হইল। আসিতে সঙ্কেত করিয়া বৃদ্ধা অগ্রে অগ্রে চলিল আর খৃষ্টান কর্ত্তাটি মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় বৃদ্ধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। এ গলি সে গলি এ রাস্তা সে রাস্তা করিয়া কত রাস্তাই অতিক্রম করিলেন। শেষে তিনি আর কোথা যাইতেছেন কিছু ঠিকানা করিতে পারিলেন না। মনে মনে করিলেন যেখানে যাই না কেন কলিকাতায় ত বাটী ফিরিয়া আসিবই আসিব। যাহাহউক অনেকক্ষণ পরে একটি অন্ধকার বিশিষ্ট সঙ্কীর্ণ গলিতে আসিয়া উভয়ে উপস্থিত হইলেন। স্ত্রীলোকটি আসিয়াই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন, দ্বিতল অতিক্রম করিয়া ত্রিতলে চলিলেন অর্থাৎ ছাদে একটা ঘর আছে, সেই ঘরে বৃদ্ধা থাকেন বলিয়া বোধ হইল। সেই খানে গিয়া বৃদ্ধা আপনি একখানি আসনে বসিলেন ও ভদ্রলোকটিকে আর একখানি আসনে বসিতে দিলেন। সেখানে বৃদ্ধা এ কথা সে কথার পর বলিলেন যে তোমার উপর মহাপুরুষগণের দয়া হইয়াছে। তোমার পারলৌকিক মঙ্গল করিবার তাঁহাদের ইচ্ছা। সেইজন্যই তোমাকে এখানে ডাকিয়া আনিয়াছি। মহাপুরুষগণের নিকট হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান নাই। তবে সাধনার পর্য্যায় বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে তাঁহারা ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার করিয়া থাকেন বটে কিন্তু শেষে সর্ব্বশেষে কিছুই নাই। তোমার দান সচ্চরিত্রতা, সত্যাবলম্বন ও পাপ কার্য্যে ভীরুতা ও পরোপকার প্রভৃতি গুণেই আমরা তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি। তোমার দ্বারা আমরা অনেকটা জীবের মঙ্গল সংসাধন করিতে সমর্থ হইব। এই পর্য্যন্ত বৃদ্ধা কথা কহিলে পর ভদ্রলোকটি মনে মনে করিতে লাগিলেন এ আবার ব্যাপার কি কিছু ত বুঝা যায় না মস্তিষ্ক ত ঠিক আছে। এইরূপ মনে মনে বিচার করিয়া তিনি ঘরটির চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন—দেখিলেন, রুদ্রাক্ষ মালা গৈরিক বসন কমণ্ডলু প্রভৃতি যোগিনীর সাজ সজ্জাই ঘরে রহিয়াছে আর জল রাখিবার কলসী ভাঁড়কোঁড় কয়েকটি ইত্যাদি। বৃদ্ধা ব্যাপার দেখিয়া বলিলেন অন্যমনস্ক হইও না, বলিয়া তিনি যেমন আপনার বস্ত্র-রচনা করিতে যাইবেন অমনি ভদ্র খৃষ্টানটী দেখিলেন যে বৃদ্ধার বাম হাতের একটি অঙ্গুলি নাই। বৃদ্ধা আর কিছু না বলিয়া উঠিলেন, ঘর হইতে দ্বাদশ খানি কলা পাতা লইয়া ছাদে স্থান করিয়া দিলেন এবং পাতে পাতে ঘর হইতে খাদ্য সামগ্রী লইয়া গিয়া পরিবেশন করিতে লাগিলেন। সমস্ত উদ্যোগ হইলে বৃদ্ধা স্থির হইয়া বসিয়া কি

ক্রিয়া করিলেন আর ভদ্রলোকটি স্তম্ভিত হইয়া ঘরে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, সেই ত্রিতলের উপরে কলিকাতা সহরে কোথা হইতে দ্বাদশটি শিবা আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে পাতে পাতে বসিয়া গেল ও খাইতে লাগিল। বৃদ্ধা বার বার পরিবেশন করিতে লাগিলেন। শেষে কার্য্য সমাপ্ত হইলে প্রণাম করিলেন তখন শিবাদল আবার চক্ষের পলকে কোথায় গেল। প্রায় পনর মিনিট ধরিয়া শিবা-সেবা কার্য্য সম্পন্ন হইল। তৎপরে বৃদ্ধা ফিরিয়া খৃষ্টান ভদ্রলোকটির নিকট আসিয়া বলিলেন—আপনি নিরীক্ষণ করিয়া আমার অঙ্গুলি দেখিতেছিলেন, হাঁ আমি শিবা বলি দিয়াছি। আর শিবা বলি দিবার কি ফল তাহা আপনি প্রত্যক্ষ কলিকাতা সহরে ত্রিতলে বসিয়া দেখিলেন। চক্ষে দেখিয়াছেন কি করিয়া অবিশ্বাস করিবেন। যাহা হউক আজ অন্য কথা আপনার মস্তিষ্কে স্থান পাইবে না—বলা বৃথা হইবে। চলুন আপনাকে স্বস্থানে রাখিয়া আসি। এই বলিয়া বৃদ্ধা ভদ্র খৃষ্টান ব্যক্তিকে আবার এ গলি সে গলি করিয়া তাঁর বাটীতে রাখিয়া গেলেন। ঐ বাটী পঁহুছিয়াই অদৃশ্য হইলেন।

বন্ধু এই গল্পটি বলিয়া ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন আমি সংবাদ পাইয়াছি খৃষ্টান ভদ্রলোকটি হিন্দুয়ানী সম্মত সাধন প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। ম্লেচ্ছ যবন বা বিধর্ম্মীর উপর মহাপুরুষগণের কৃপার উদাহরণ নিতান্ত বিরল নহে। শ্রীগৌরাঙ্গ যবন হরিদাসের উপর কৃপা করিয়াছিলেন একথা সকলেই জানেন। একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ রাজপুরুষ বন বিভাগে কর্ম্ম করিতেন তিনি একদা পাঞ্জাবের কোন জঙ্গলে পথশ্রান্ত ও তৃষ্ণাতুর হইয়া একজন ধ্যানমগ্ন সাধুর নিকট জল প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সাধু ধ্যানমগ্ন কিছুই উত্তর করেন নাই। ইংরেজ সাধুকে চাবুক মারিয়াছিলেন। সাধুর চাবুকের আঘাতে ধ্যান ভঙ্গ হইলে হাসিয়া সাহেবকে ও সাহেবের ঘোটককে পানীয় জল দিয়াছিলেন। সাহেব এই বিষয় আলোচনা করিয়া ও সাধুর ক্ষমা দেখিয়া মোহিত হন। উত্তরকালে এই সাধুর কৃপায় তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া রাজকার্য্য ও সংসার ছাড়িয়া দেন। তিনি অনেক দিন কাশীধামে বাস করিয়াছিলেন। সীমলা শৈলের, যেখানে সকৌন্সিল বড় লাট সাহেব নিদাঘ সন্তাপ দূর করিতে প্রতিবৎসর গমন করিয়া থাকেন, কিছু উপরে একটি নিভৃত স্থানে বহুদিন হইতে একজন সাহেব যোগী বাস করেন। ইনি খৃষ্টান ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন এবং এখন যোগাভ্যাসে রত

আছেন। মধ্যে মধ্যে সাহেবরা এই সাধুর বিষয় পাইয়োনীয়র পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। যাহাহৌক কলিকাতার সন্নিকটে একটি ঘটনা ঘটিয়াছে—তাহা বোধ হয় আপনার জানা নাই ও শুনিতেও আপত্তি হইতে পারে না তাহার বিষয় বলিতেছি।

কলিকাতার সন্নিকট একটি স্থানে একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইনি আদালতে কাজ করেন এবং এখনকার যাহা মান সম্ভ্রম মিউনিসিপাল কমিশনরী অনরেরী মাজিষ্ট্রেটী এই সবও তাঁর আছে। তাঁহার অনেকগুলি পরিবার এবং পুত্রেরাও সব বড় বড় চাকরী করেন। নাতি নাতকুড় লইয়া বহু পরিবার বেষ্টিত হইয়া এই ব্রাহ্মণ সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। ছেলেরা দূর দেশে চাকরী করে সময়ে সময়ে বাটি আসে কর্ত্তা বাটীতেই থাকেন ও সব দেখা শুনা করেন। একদা কর্ত্তার বৈঠকখানার পার্শ্বের সদর রাস্তা মেরামৎ হইতেছিল। রাত্রি ১০টার পর কর্ত্তা যখন বৈঠকখানা হইতে বাটি যাইবেন বলিয়া উঠিয়াছেন তখন এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটন হইল। বৈঠকখানার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানার উপর ঝুপঝুপ করিয়া প্রথমত বালী পড়িতে লাগিল তারপর ছোট ছোট কুল্লুই পড়িতে লাগিল দেখিতে দেখিতে ভাঙ্গা ইট ঝামা রাস্তায় দিবার জন্য যে সকল ভাঙ্গা ঝামা ছিল তাহা এই সকল বৃষ্টির জলের ন্যায় বৈঠকখানার ঘরে ও বিছানায় পড়িতে লাগিল। একটি সেজ জ্বলিতেছিল—সেজটি বিছানার উপরে ছিল। তাহার চতুর্দ্দিকে বড় বড় ইট পড়িতে লাগিল ঠিক যেন বড় বড় থান ইটগুলি সেজটির চতুর্দ্দিকে কে সাজাইয়া দিল। বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া কর্ত্তা বাহিরে আসিলেন, উঠানে অবিশ্রান্ত ইট পড়িতেছে। বাটীর অন্দরেও ঐরূপ ইট পড়িতেছে। সংসারটী বহু পরিবারযুক্ত তথাপি মেয়ে ছেলে একেবারে ভয়ে ম্রিয়মাণ হইয়া উঠিল। অথচ ঢিল কি ইট কাহাকেও লাগিতেছে না। কর্ত্তা পাড়ার পাঁচ জনকে ডাকিলেন। তাহারা কিছুই ঠিক করিতে পারিল না দ্বিতলের ছাদের উপর হইতে যেন ইটগুলি আসিতেছে কত অন্বেষণ করা হইল কিছুই দেখা যায় না—কেবল অবিশ্রান্ত ইট বৃষ্টি হইতেছে। ইটের আসিবার গতি লক্ষ্য করিয়া বার বার বন্দুক ছোড়া হইল কিন্তু কিছুতেই নিবৃত্তি নাই। সমস্ত রাত্রি এইরূপে গেল প্রাতঃকালে লোকে লোকারণ্য বাটীতে স্তূপাকার ইট। বাটীর কর্ত্তা বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পুলিসে খবর দিলেন।

সমস্ত দিন গেল কোন উপদ্রব নাই। আবার রাত্রিতে ১০টার পর উপদ্রব আরম্ভ হইল। আজ অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন অনেকে অনেক প্রকার আস্ফালন করিয়াছিলেন, ভূত ধরিব বলিয়াছিলেন কিন্তু যখন শ্রাবণের বারি ধারার ন্যায় অবিরল ইট বৃষ্টি হইতে লাগিল যখন নাকের ডগ দিয়া, কাণমুতা দিয়া, রগ দিয়া ইট ছুটিতে লাগিল, যখন পায়ের বুড়া আঙ্গুলের মাথার আধ ইঞ্চি তফাতে সোঁজোরে ইট আসিয়া পড়িতে লাগিল তখন সকলেরই তালু শুষ্ক হইল, ঘাম ছুটিল গাত্র কন্টকিত হইল এবং কাহারও মুখে আর বাক্য নিস্ফুরণ হইল না। কনিষ্টবলেরা ছাদ লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িল কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন ফল হইল না। পরন্তু বন্দুক ছোড়ার পরই ইটের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। এইরূপে অনেকক্ষণ কনিষ্টবেলেরা যুজিলেন কিন্তু অশরীরীকে কে কোথা যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারে? বিফল মনোরথ হইয়া যে যেদিকে পাইল সরিয়া পড়িল। শেষে কর্ত্তাটি দেখিলেন বন্ধু বান্ধবও বড় কেহ নাই। তখন অগত্যা অন্দরে চলিলেন। দুটা ত খাইতে হইবে। বলিতে ভুলিয়াছি কর্ত্তাটি রাত্রিতে অন্নাহার বা লুচি রুটি আদি গ্রহণ করেন না। তিনি ১॥০ সের আন্দাজ সুজির পায়েস বাটির কানাতে মুখ দিয়া চোঁ চোঁ করিয়া এক নিশ্বাসে গলাধকরণ করেন। বৃদ্ধের পক্ষে ইহাই সুবিধা—অন্তত কর্ত্তাটি তাই মনে করিতেন। আজ বাটীতে গিয়া আসনে উপবেশন করিয়া দেখিলেন সুজির বাটীর চতুষ্পার্শ্বে অকথ্য কতকগুলি বস্তু রহিয়াছে—হিন্দুর পক্ষে তাহা অকথ্য অস্পৃশ্য ইত্যাদি। রাম রাম স্মরণ করিয়া কর্ত্তাটি উঠিয়া পড়িলেন। সে দিন আর কিছু উদরে গেল না।

পরদিন কর্ত্তা জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাঁহার বাটীর দৌরাত্ম্যের বিষয় লিখিয়া পাঠাইলেন। কর্ত্তাটি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের জানিত লোক সুতরাং সাহেব পত্র প্রাপ্তির অনতি বিলম্বে পুলিস সাহেবকে পত্র লিখিলেন যে তিনি যেন স্বয়ং গিয়া এ বিষয়ের তদন্ত করেন এবং বদমায়েসগণের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিয়া দেন। পুলিস সাহেব একজন পুলিস ইন্স্পেক্টর, তিনি পত্র পাইয়া বদমায়েস ধরিবার জন্য স্বদল বলে সাজিতে আরম্ভ করিলেন এবং যথাকালে কর্ত্তার ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ দিকে সহর তোলপাড়। ইট পড়ার কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র। মাজিষ্ট্রেট সাহেব পূর্ব্ব হইতেই ইট পড়ার কথা শুনিয়াছিলেন। যখন কর্ত্তার পত্র পাইয়াছিলেন তখনই পুলিস ইন্স্পেক্টর সাহেবকে পত্র লিখিয়া দিয়াছেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহার মনে হইল আমারও এস্থলে যাওয়া উচিৎ। সুতরাং তিনিও

সজ্জিত হইয়া বন্দুকাদি সশস্ত্রে এবং ঘোটকারোহনে অকু স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। এ দিকে পুলিস ইন্স্পেক্টর সাহেবও ঘোটকে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ঘোটক হইতে অবতরণ করিয়া উভয়ে বাবুর বৈটকখানায় গিয়া বসিলেন ও কর্ত্তার সহিত নানাবিধ গল্প চলিতে লাগিল দেশী বিদেশী কত অশরীরী দৌরাত্ম্যের গল্প হইল। শেষে সাব্যস্ত হইল ওটা গল্প কথা ভূত বলিয়া কোন পদার্থ নাই। উদাহরণ স্বরূপ মাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন একটা মজা এই দেখিবেন যে ভূতের গল্পকারীকে যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি নিজে ভূত কখন দেখিয়াছেন কি না, তখনই ভূতের গল্পকারী বলিবেন যে যদিও তিনি দেখেন নাই তথাপি যিনি দেখিয়াছেন তাঁহাকে তাঁহার অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই আবার আপনি যদি অন্বেষণ করিয়া গল্পকারীর কথিত লোকের নিকট গিয়া উপস্থিত হন এবং ঐ প্রশ্ন তাঁহাকে করেন তাহা হইলে তিনিও ঐ কথা বলিবেন অর্থাৎ যদিও তিনি দেখেন নাই তথাপি তিনি এমন লোকের মুখে শুনিয়াছেন যে তাঁহাকে কোন মতে অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। আবার যদি অনুসন্ধান করিয়া এই তৃতীয় ব্যক্তির কাছে যান তিনি বলিবেন তিনি দেখেন নাই বটে তবে তাঁহার দাদা দেখিয়াছেন। সকল দেশে সকল সময়েই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। ভূতের গল্পকারীগণ কেহ কখনও ভূত দেখে না—কেবল শুনে। এ সকল গল্প মাত্র অশ্বডিম্ব (mare's nest)।" এই বলিয়া খোদ মাজিষ্ট্রেট সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ও সকলে সেই হাসিতে যোগ দিলেন। হাসির তরঙ্গে পাড়া ভাসিয়া গেল। কিন্তু কেহ যদি সুনিপুণ সমালোচক সেখানে থাকিতেন তবে তিনি অবশ্য ধরিতে পারিতেন যে পুলিস সাহেবের হাসিতে গভীরতা আদৌ নাই। সে হাসি কেবল মুখের হাসি, সে হাসি দেখন হাসি বা কাষ্ঠ হাসি, তাহাতে প্রাণের ভিতরের হো হো কিছুই নাই। বরঞ্চ মুখে কালিমা চক্ষুতে চঞ্চলতা ও অবিশ্বাস দেখা দিয়াছিল। কিন্তু খোদ সাহেব মাজিষ্ট্রেট পুঙ্গব যখন হাসিতেছেন তখন অধস্তন কর্ম্মচারী পুয়র হোয়াইটস্ বা দুঃস্থ শ্বেতকর্ম্মচারী দলের এক জনকে বাধ্য হইয়াই ত হাসিতে হইবে। একজন সুরসিক মার্কিন গ্রন্থকার একদা বলিয়াছিলেন যে ভদ্র লোকে ভদ্র লোকে পথে দেখা হইলে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া একটু মুচ্‌কে যে হাসি তাহা সর্ব্বনেশে হাসি (terrible smile)। অনেক ভাবিয়াও আমি এইরূপ হাসির সর্ব্বনেশেত্ব কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই কিন্তু আজিকার পুলিস সাহেবের যে হাসি

তাহাকে অনায়াসেই সর্ব্বনেশে হাসি বলা যাইতে পারে। সে যাহাহৌক দৌরাত্ম্যের বাটীর বাষ্পার্ণবে হাসির বীচি চক্র খেলিয়া খেলিয়া অত্যন্ত বিস্ফারিত হইয়া লয় পাইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঘড়ি খুলিলেন ও কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন দৌরাত্ম্যের সময় গত হইয়া গিয়াছে না? কর্ত্তা উত্তর করিলেন—হাঁ সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তখন সাহেব হাসিয়া আনন্দ হিল্লোলে পুলিস সাহেবের দিকে বক্র কটাক্ষ করিয়া বলিলেন আর কেন্ চলুন বাটী যাওয়া থাক্। কর্ত্তার দিকে ফিরিয়া সমস্বরে বলিলেন "বুড় ছোকরা (old boy) ভূতেরা সাহেব দিগকে ভয় করে। দেখ আমরা আসিয়াছি বলিয়া আজ কোন দৌরাত্ম্য করিল না।" আবার পুলিস সাহেবের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "ইনস্পেক্টর দেখা যাইতেছে ইহা বদমায়েস লোকের কার্য্য কিন্তু আপনার কনিষ্টবলগণের বদমায়েস না ধরিতে পারা সম্বন্ধে আপনি কি বিবেচনা করেন? বৃটীস রাজত্বে পুলিসের যথেষ্ট বদ্‌নাম আছে কিন্তু তাহার উপর আর বাড়াইবার চেষ্টা কেন? এসম্বন্ধে আপনি কনিষ্টবলগণের উপর কিরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন আমি যেন তাহা জানিতে পাই। সাধারণ জনগণেরও এ বিষয়ে আমাদের ইতিকর্ত্তব্যতার বিষয় জানা উচিত।" কর্ত্তার দিকে ফিরিয়া "তবে চলিলাম good evening"—এ দিকে কর্ত্তাটিও হতগৃধ্রজরদ্গবের স্থায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অথচ আনন্দিত হইয়া দুই হাতের অঙ্গুলি তর্পণের প্রথাক্রমে সেলাম সাহেবগণকে দিতে দিতে বৈঠকখানার বাহিরে আসিলেন। উঠানের লোক সরিয়া গেল। সহিস দুইজন অহঙ্কার বিস্ফারিত কায়াতে ঘোটক দুইটি আনিয়া সাহেবদিগের সম্মুখে ধরিল। এক এক লম্ফে যুগল মূর্ত্তি ঘোড়ায় সোওয়ার হইলেন ও সহিস প্রদত্ত টুপি লইয়া আপন আপন মস্তক আচ্ছাদন করিলেন। ঘোড়ার মুখ ঘুরাইয়া সদর দরজার দিকে করান হইল। সমবেত লোক কদম্ব তখন হেঁট হইয়া সাহেবদ্বয়কে সেলাম করিলেন। সাহেবদ্বয় টুপি স্পর্শ দ্বারা জানাইলেন যে সেলাম গ্রহণ বা গ্রাহ্য হইল তবে পুলিস সাহেব দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্বীয় মস্তকের টুপি উত্তোলন করিয়া সেই কথা জানাইলেন কিন্তু মাজিষ্ট্রেট পুঙ্গব কেবল মাত্র স্বীয় বামহস্তের তর্জ্জনী টুপিতে স্পর্শ করাইয়া সেই কথা সাধারণকে জ্ঞাপন করাইলেন। অমনি ঘোটকদ্বয় একটি একটি হ্রেষা সহকারে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। মাত্র এক পদ বা দুই পদ অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় পুলিস সাহেবের ঘোড়ার মাথার উপর (ঐ ঘোটকটিই অগ্রে ছিল) একটা প্রকাণ্ড পুঁটুলী কোথা হইতে

পড়িল। আর সেই সঙ্গে ঘোড়া লাফাইয়া উঠিল এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ঘোড়ার উপর পড়িয়া চাল সামলাইতে না পারিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। পুলিস সাহেবও চৌদ্দপোওয়া খোদ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ঘোড়াটিও বেকায়দায় একটা কোণে গিয়া পড়িল; ঘাড় গুঁজরাইয়া কোণে পড়ায় পতন নিবারিত হইল কিন্তু সাহেবের টুপি লইয়া কে যেন উঠানে ফুটবল খেলিতে লাগিল। আর সেই নাগাদ ছাদ হইতে চৌদ্দ ইঞ্চি গুলি স্বশরীরে ঘোটক বস্তুর সহিত সম্বন্ধ বিচার করিবার জন্য ঘোড়ার নিকটে পড়িতে লাগিল সাহেব দুইজন একেবারে—অধম, সহসা উঠিয়া ধূলা ঝাড়ায় ক্ষণকাল পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিলেন পরে মূহুর্ত্ত মধ্যে বন্দুক লইয়া ছাদ লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িতে লাগিলেন কিন্তু কার গুলি কে করে কার গুলি কোথা যায়। কিছুই হইল না অধিকন্তু চতুর্দ্দিক হইতে অনর্গল ইট পড়িতে লাগিল। আবার তাহার উপর বোধ হয় সাহেবদের মানের জন্যই হইবে নানা প্রকার ছেঁড়া জুতা ও চামড়া বর্ষণ হইতে লাগিল। বাটির অন্দর হইতে একটা নিদারুণ করুণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। কর্ত্তা প্রাণের মায়া ছাড়িয়া দিয়া ছুটিয়া বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন এবং কিছু কাল পরে সপরিবারে বাহির হইলেন। বাটীতে তিষ্ঠান ভার বলিয়া পরিবারগুলিকে পাড়ার অন্য একজন ভদ্রলোকের বাটীতে রাখিতে গেলেন। বলা আবশ্যক যখন পরিবারবর্গ এ বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে যায় তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ইট পড়িতে পড়িতে গিয়াছিল কিন্তু কর্ত্তার বাটির বাহির হইবার পর আর ইট পড়ে নাই। আরও ইট ছেলে পিলে কাহাকেও লাগে নাই। সাহেব দুই জন এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন প্রতি ইট ক্ষেপে চম্‌কাইতে লাগিলেন আর লজ্জায় ক্রমে ঘোরতর লাল হইয়া উঠিলেন। শেষে বাটীর বাহির দেখিতে হইবে বলিয়া বাহিরে গমন করিলেন। চারিদিক ঘুরিয়া দেখিতে আর সাহসও নাই প্রবৃত্তিও নাই যে থান ইটের হুড়া। সদর রাস্তায় একটু এদিক ওদিক করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব শরীর অসুখ বলিয়া সরিয়া পড়িলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব যাইবার সময় পুলিস সাহেবকে বলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং পুলিস সাহেব কিয়ৎকাল থাকিতে বাধ্য হইলেন। ক্রমে তিনিও সরিয়া পড়িলেন। যাইবার সময় কর্ত্তাকে বলিয়া গেলেন (অবশ্য চুপে চুপে) This must be the doings of some spirits. I do believe in their existence so you see Police is powerless. অর্থাৎ নিশ্চয়ই ইহা

অশরীরীর কার্য্য আমি এরূপ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। তবেই বুঝুন পুলিসের কোন ক্ষমতাই এস্থলে নাই। সাহেব যাইবার সময় বলিয়া গেলেন অতি প্রত্যুষে আসিবেন। কর্ত্তাটী তখন অচল দন্তপংক্তি বাহির করিয়া কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন রুই কাতলা ত গেল এখন আমি যাই কোথা? আমার যে পাঁক সেই পাঁক।

অশরীরী অত্যাচার এইরূপ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। সাহেবেরা আসিয়া দেখেন দাঁড়ান আশ্চর্য্য হন কিছু বুঝিতে পারেন না চলিয়া যান। মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই রাত্রি হইতে পীড়িত সুতরাং তিনি আসিতে পারেন নাই। পুলিস সাহেব নিত্য আসেন আর যাইবার সময় বলিয়া যান চাকরী বুঝি থাকে না। শেষে একদিন কর্ত্তাকে বলিলেন যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধে তাঁহাকে অনুপযুক্ত বলিয়া রিপোর্ট লিখিয়াছেন। বলিয়াছেন তাঁহারই কনিষ্টবলেরা এইরূপ অত্যাচার করিতেছে। সাহেব বলিলেন সাহেবে ত আর ভূত মানে না এইবার আমার চাকরী যাইবে।

* * * *

এক দিন প্রত্যুষে উঠিয়া কর্ত্তা দেখিলেন তাঁহার বাটীর অনতিদূরে অশ্বত্থ-তলায় বসিয়া আছেন—ধুনি জ্বালিয়া—দুইটী সন্ন্যাসী। একটীকে দেখিলে সহসা বাল যোগী বলিয়া বোধ হয় দেহে যেন যৌবন লাবণ্য ক্রীড়া করিতেছে মুখ দেখিলে বা দেহ দেখিলে কিছুতেই বয়স ধরিবার যো নাই মস্তক মুণ্ডিত। সঙ্গে আর এক জন সন্ন্যাসী তাঁহার বয়স অনেক হইয়াছে শ্বেত শ্মশ্রু শ্বেত ভ্রূ প্রভৃতি দেখিয়াই অশীতিপর বৃদ্ধ বলিয়াই বোধ হয় তবে শরীরে যথেষ্ঠ বল সাহস স্ফূর্ত্তি আছে, উদ্যম আছে, নাই কেবল জরার শিথিলতা। দুই জনেই অতি প্রত্যুষে স্নান সারিয়াছেন দুই জনেই ধ্যান মগ্ন—গভীর সমাধিতে দুইজন দেহ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তখন পর্য্যন্ত সেখানে কোন লোক জন জমে নাই। কর্ত্তাটি শনৈ শনৈ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন—মনঃসংযোগে দেখিয়া জানিলেন একজন—বাল যোগীর মত যিনি—তাঁহার পরিচিত। মধ্যে মধ্যে অর্থাৎ ৪।৫ বৎসর পর এই সন্ন্যাসী মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া কয়েক দিন ধরিয়া থাকেন এবং আবার কোথায় চলিয়া যান। পূর্ব্বে তাঁহার সহিত এই সন্ন্যাসীর আলাপ হইয়াছিল এবং নানাবিষয়ে আলাপ হইয়াছিল এবং শাস্ত্রালোচনাও হইয়াছিল সেই আলাপের ফলে সন্ন্যাসী আমাদের কর্ত্তাটিকে স্নেহ করিতেন এবং

আমাদের কর্ত্তাটি গুরুর মত তাঁহাকে মান্য করিতেন। বলা উচিত সন্ন্যাসী ভিক্ষুক নন তিনি কিছুই চান না ও লন না। তিনি কখন কি আহার করেন তাহা সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে কেহই জানে না।

সাধুদ্বয়ের ধ্যানাবস্থা দেখিয়া কর্ত্তাটি কিছু বলিলেন না। তবে সেইখানে অদূরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে দৌরাত্মের জন্য দৈব আশ্রয় করিবেন, আর তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে দৈব আশ্রয় ভিন্ন প্রতিকারের পথও নাই। অনেকক্ষণ পরে বৃদ্ধ সাধুটির ধ্যান ভঙ্গ হইল। ধ্যান ভঙ্গ হইলেও তিনি কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা না কহিয়া চুপ করিরা চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন। এ দিকে অনেকক্ষণ পরে আমাদের বাল যোগীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। অমনি কর্ত্তাটি সোৎসাহে গিয়া সাধুর পদরেণু চুম্বন করিলেন। সাধু স্বাগত জিজ্ঞাসাদির পর কহিলেন "দেখিতেছি তোমার বড়ই কষ্ট হইয়াছে। সেই জন্য মাতার অনুমতি লইয়া তোমারই কাছে আসিলাম। তিনি অনুমতি না দিলে কি আসিতে পারি। তিনি যে আমাদের সব আমাদের যে মা! মাতার শাসন বড় শাসন। তবে তাঁহার শাসন দেখিলে আমরা এতটুকু বুঝিতে পারি যে আমাদের তিনি ভুলেন নাই—সে বড় সংসারিক লোকের পক্ষে কম কথা নহে।

কর্ত্তা।—আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন তাহা অতি সত্য কথা কিন্তু তা বলিয়া গৃহস্থ সহ্য করিতে পারে কৈ। সংসারে মৃত্যু সংঘটন হইলে মাতার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া কই সাংসারিক জীব আনন্দ প্রকাশ করিতে পারে? আপনি শ্রীমুখে যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহা আমার মত পাষণ্ডের মনে হয় সাধু জীবনের কথা।

সাধু।—কথার বাঁধুনি তোমার খুব আছে। চিরকালই আছে কিন্তু কাজে কিছু দেখি না তোমার উপর এখন কিরূপ অত্যাচার হইতেছে বর্ণন কর।

কর্ত্তা বর্ণনা আরম্ভ করিলেন কিন্তু সাধু অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া রহিলেন।

কর্ত্তা এক একবার মনে করেন থামিবেন আবার সাধুর ক্রোধের ভয়ে থামিতে পারেন না বলিয়া যান। যাহাহউক অনেকক্ষণ পরে সাধুর আবার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল—আবার তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন কিন্তু অতি অল্পক্ষণ শুনিয়াই বলিলেন "কি অপরাধ হইয়াছে বলিতে পার? একবার বাটী যাও গিয়া অমুক ঘরে—একটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়া—গিয়া দেখ দেখি দেবীর ছবিতে কি হইয়াছে।" এই বলিয়া সাধু চুপ করিলেন। কর্ত্তাও ছুটাছুটি ঘর দেখিতে গেলেন ঘর দেখিয়া আসিয়া বলিলেন দেখিলাম— কালীর ছবির পা পুড়িয়া গিয়াছে ছেলেরা সেইখানে পড়ে কেমন করিয়া অগ্নিশিখা লাগিয়া মাতার পা দগ্ধ হইয়াছে। দেব ইহা আমি এতদিন দেখি নাই এবং কেহ আমাকে বলেও নাই। এ যে ঘোর অপরাধের কথা।

সাধু।—হাঁ ঘোর অপরাধের কথা ঐ ছবিখানি এখনই ৺ গঙ্গায় বিসর্জ্জন করিয়া আইস। আগামী কল্য প্রশস্ত দিন কল্য তোমার বাটী কালী পূজা করিব। কুমার বাড়ী হইতে সদ্য কালী মূর্ত্তি গড়াইয়া আনিতে হইবে। মূর্ত্তি প্রমান হওয়া চাই। আর তোমাকে অনেকগুলি বস্তু যোগাড় করিতে হইবে।

কর্ত্তা।—আজ্ঞা আমি কাগজ কলম আনিয়া এখনই ফর্দ্দ লিখিয়া লইতেছি।

সাধু।—একটু অপেক্ষা কর। আরও কথা আছে। ইটগুলি ছাদের উপর হইতে আসে না?

কর্ত্তা।—(সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িলেন)।

সাধু।—তোমার ছাদের গৃহে পিতা সহ একদা বিধবা একটি কন্যা বাস করিত সে তোমার সম্পর্কীয়া। তাহার গতি হয় নাই। তিনি সতী ছিলেন। সতীর কষ্ট দেখিয়া মাতা রাগ করিয়াছেন। তিনি দূর দেশ হইতে পিতা সহ আসেন।

কর্ত্তা।—আমি কিছু ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

তখন সাধু চুপে চুপে কি কথা তাঁহাকে বলিলেন এই সময় সেখানে কতকগুলি লোকের সমাগম হইয়াছিল। কথা শুনিয়া কর্ত্তা বলিলেন সে অনেক দিনের কথা আমরা তখন বালক মাত্র, যাহা হউক কিসে কি হয় তাহা আমরা কেমন করিয়া জানিব? আপনি যেরূপ বলিবেন সেইরূপই করিব।

সাধু।—তোমাকে তিনি বার বার বলিয়াছিলেন যে তাঁহার গতি হয় নাই বার বার বলিয়াছিলেন যে গতি কর তুমি সে কথায় কর্ণপাত কর নাই নিজের সংসারের সুখ লইয়াই মত্ত। তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে না?

কর্ত্তা।—আমার স্পষ্ট কিছু মনে পড়ে না। তবে এই মাত্র মনে পড়ে আমি মধ্যে মধ্যে স্বপন দেখিয়াছিলাম। এইরূপ স্বপন দেখিয়াছিলাম যেন একটা বড় শ্মশানে গিয়াছি। সেখানে যেন অনেক গুলি চিতা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। ঘোর শ্মশানে যাহা আছে সে শ্মশানে সে সমস্তই দেখিয়াছিলাম।

আর দেখিয়াছিলাম আলুলায়িতা কেশা একটি রমণী। আমাকে যেন তিনি হাত নাড়িয়া শ্মশানের এক প্রান্তে ডাকিয়া লইয়া গেলেন আর যেন কত কি বলিলেন আমি কিন্তু তাহার বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারিলাম না। আমি এইরূপ স্বপ্নই কয়েকবার দেখিয়াছিলাম। শেষবারে—এখন মনে পড়িতেছে যেন বিভৎস মুখ প্রেতগণ আমাকে মারিবার জন্য তাড়া করিয়াছিল। যেন চিতার অগ্নি লইয়া আমার গাত্রে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ভয়ে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়।

সাধু।—হাঁ তাই বটে আর কি করিয়া বলিবেন যে গতি হয় নাই। সে কালের লোক হইলে ঐ ইসারা বুঝিতে ও ছুটিয়া গয়ায় যাইত। এখনকার দিন কাল আর ত সেকালের মত নাই এখন যে সব সাহেব হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তোমার এ সাহেবটি ভাল। (এই বলিয়া সাধু অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া একটি আগমনশীল সাহেব মূর্ত্তি দেখাইয়া দিলেন) ইঁহার ভক্তি বিশ্বাস আছে।

ক্রমে সাহেব নিকটে আসিলেন এই সময় সাধুর আদেশ ক্রমে কর্ত্তা ফর্দ্দের জন্য কাগজ কলম আনিতে বাড়ীর দিকে গেলেন। সাহেবটি আসিয়া দূর হইতে দুই হাতে হিন্দুর মত সাধুকে প্রণাম করিলেন।

সাধু হাসিয়া বলিলেন সাহেব বড় বিপদে পড়িয়াছ। তা তোমার ভয় নাই তোমার মঙ্গল হইবে। মাতার কৃপা তোমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। তুমি মনে মনে যাহা বাঞ্ছা করিয়াছ তাহা ঘটিবে।

সাহেব এবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। বলিলেন ঠাকুরজি আমার বড় বিপদ চাকরি থাকে না। উপরওয়ালা বড় চটিয়াছেন।

এমন সময় কর্ত্তা কাগজ কলম লইয়া ফিরিয়া আসিলেন কর্ত্তা কথাবার্ত্তায় শুনিলেন যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই সাহেবের বিরুদ্ধে—ইনি পুলিস ইন্সপেক্টর সাহেব অকর্ম্মণ্য বলিয়া উপরে রিপোর্ট করিয়াছেন। দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে পারেন নাই বলিয়া এইরূপ রিপোর্ট তাঁহার বিরুদ্ধে হইয়াছে।

কর্ত্তা বলিলেন আর ভয় নাই সাহেব তুমি নিশ্চিন্ত থাক সাধু আসিয়াছেন যাহা হয় একটা কিনারা হইবে।

কর্ত্তা ফর্দ্দ লিখিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। সাহেবও চলিয়া গেলেন। সেই দিন সন্ধ্যার সময় আবার উপদ্রব হইল। সাধু অনুরুদ্ধ হইয়াও দেখিতে আসিলেন না।

পরদিন পূজার সমস্ত আয়োজন হইল। কর্ত্তা মুক্ত হস্তে অকাতরে ধন বিতরণ করিতে লাগিলেন—এক চেষ্টা যাহাতে কার্য্য সফল হয়। সাধু যেরূপ যেরূপ বলিয়াছিলেন সমস্তই আয়োজন সেইরূপ হইল। গব্য ঘৃত, ১০৮ জবা, ১০৮ পদ্ম; হোমের জন্য যজ্ঞ ডুমুরের কাষ্ঠ; চক্রবিহীন বাছা বাছা ত্রিপত্র বিল্বপত্র, লাল করবী, অপরাজিতা প্রভৃতি যন্ত্র পুষ্প সমস্তই আহরিত হইল। সাধু নিজে সেদিন একবারও স্থান ত্যাগ করিলেন না। দেখা গেল মধ্যে মধ্যে তারস্বরে তিনি কালী স্তোত্র পাঠ করিতেছেন আর নয়নদ্বয় অশ্রুতে প্লাবিত হইয়া যাই-তেছে সে অশ্রু প্লাবন বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া চলিয়াছে। সমস্ত দিন উপবাস করিয়া থাকিয়া সন্ধ্যার পর স্নান করিয়া সাধু পূজায় বসিতে গেলেন। যাইবার সময় কর্ত্তাকে বলিয়া গেলেন যে সমস্ত বাড়ীটা ধূপধূনার ধূমে আচ্ছন্ন করিয়া দাও। বলিলেন অত্যাচার হইতে পারে। উপদ্রব যথেষ্ট হইবে। আমার বিবেচনায় তোমার বাটীর পরিবারবর্গকে স্থানান্তরিত করা উচিত। আর উপদ্রব যতই হউক না কেন ভয় খাইও না। আর আমি যতক্ষণ না নিজে ঘর হইতে বাহির হই ততক্ষণ আমাকে ডাকিও না। বলা উচিত যে ঘরে কন্যার মৃত্যু হইয়াছিল ও গতি বিনা কয়েক দিন পড়িয়াছিল সেই ঘরেই পূজার স্থান ও আয়োজন হইয়াছিল। কর্ত্তা উপদেশ অনুসারে সমস্ত কার্য্য করিয়া আসিয়া বলিলে সাধুজী ধীরে ধীরে তারা তারা কালী কালী করিতে করিতে উপরের পূজার ঘরে গমন করিলেন। যাইবার সময় কর্ত্তাকে বলিলেন যে মাকে ডাকিবার জন্য মাতার অনুমতি লইয়াছি। তোমার দুঃখ নিবারণ করিবার জন্য মাতার অনুমতি লইয়াছি। যেদিন প্রাতঃকালে তোমার সহিত দেখা হয় সেই দিনের রাত্রিতে মাতাকে সব কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিনি দয়া করিয়া বলিয়াছিলেন নতুবা আমি জানিব কোথা হইতে? যাহাহউক ভয় খাইও না এখন কালী বল আমি পূজায় চলিলাম। পারত যখন উপবাসী আছ বসিয়া বসিয়া কালী নাম জপ করিও।

এই বলিয়া সাধু পূজার ঘরে গিয়া ভিতর হইতে ঘরের কপাট বন্ধ করিলেন। ঘরের ভিতর আর দ্বিতীয় প্রাণী রহিল না এমন কি দ্বিতীয় সাধুও পূজার ঘরে যাইবার অনুমতি পাইলেন না। বাড়ী একেবারে ধূপধূনার গন্ধে আমোদিত। বাড়ীতে আর কেহই নাই কেবল কর্ত্তা দুইজন বিশ্বস্ত চাকরের সঙ্গে বসিয়া আছেন। সাধু পূজার ঘরে প্রবেশ করিবার পর এইরূপে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল।

তাহার পর যে দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইল তাহাতে পেটের প্লীহা চমকাইয়া যায়। একেবারে তুমুল ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি বাটীর চতুর্দ্দিকে ও ছাদে অগণিত অথচ মুহুর্মুহু বজ্রপাত হইতে লাগিল তাহা ছাড়া রেল গাড়ীর শব্দের ন্যায় একটা বিকট শব্দ বাটীর চতুষ্পার্শে হইতে লাগিল। আবার সেই সঙ্গে ইট বৃষ্টি যেমন আছে, তাহাত আছেই। আজ আবার বিষ্ঠা পর্য্যন্ত বৈঠকখানায় পড়িতে লাগিল। বিকট চেহারা সমস্ত উঠানে চীৎকার করিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তাহাদের পরস্পরে নাকি সুরের কথা গুলা পর্য্যন্ত কানে আসিতে লাগিল। কর্ত্তাটি ও চাকর দুইজন যেখানে ছিল সেইখানেই পড়িয়া রহিল নড়িবার চড়িবার শক্তি নাই। একেবারে ভয়ে মৃতপ্রায় তাহাতেই কি নিস্তার তাহাদের দেহের উপর পড়িতেছে না এমন বস্তু নাই। অন্য দিন ভূতের ঢিল লাগিত না কিন্তু আজ তাহার বিপরীত। কর্ত্তা পড়িয়া পড়িয়া দুই চারিটা মূর্ত্তি দেখিলেন তাহাতে অজ্ঞানপ্রায় হইলেন। বাইরকোষের মত চক্ষু এমন একটি মুণ্ড কিন্তু গলা পিট পা হাত প্রভৃতি ১৷৷০ হাত মধ্যেই সব ফুরাইল ঠিক যেন শিশুর দেহ। কাহারও একটা পা বাঁশের মত আর একটি সহজ পা। এইরূপ বহুতর দৃশ্য দেখিলেন আর আনিত দ্রব্যে বাটী স্তুপাকার হইল। জিনিষ পত্রে বাটী পুরিয়া গেল। চারিদিকের আলো উৎপাতের আরম্ভেই নিবিয়া গিয়াছিল। এইরূপ উৎপাত রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত হইল। ইহার মধ্যে আমাদের কর্ত্তা মহাশয়কে দুই-বার চাকরের মূর্চ্ছা অপনোদন করিতে হইয়াছিল। যাহাহউক রাত্রি ৩টার সময় ঝড় বৃষ্টি বাদল উৎপাত থামিয়া গেল প্রকৃতি প্রশান্তভাব ধারণ করিল। শেষ রাত্রিতে আর কোন উপদ্রব হয় নাই। কর্ত্তা বসিয়া বসিয়া কতক ঢুলিলেন কতক কালী নাম করিলেন। শেষ রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। সহসা চমকিত হইয়া দেখিলেন পূর্ব্বদিকে সাড় হইয়াছে। ঊষা দেবীর আগমন হইবে বলিয়া পূর্ব্বদিক বধূ তাড়াতাড়ি উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। কোথায় কোন মেঘখানি থাকিবে এই সব লইয়া তিনি ব্যস্ত আছেন। উদিকে পবন দেব উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন মেঘেরা কিরূপে সজ্জিত হইয়াছে। আমোদ করিয়া পবন একটা ফুৎকার দিলেন। পাতলা মেঘের দল অমনি ভয়ে ছুটিয়া দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে পলাইতে লাগিল, কি জানি যদি কালিকার রাত্রির ব্যাপার আবার হয়। কোথা হইতে কুসুম সৌরভ ও নানাবিধ সুগন্ধি নাসাগ্রের শিরা স্পর্শ করিতে লাগিল। কর্ত্তা দুর্গা নাম স্মরণ করিয়া বাহিরে

আসিলেন আকাশ পানে চাহিয়া চাহিয়া তাই দেখিলেন। পরে ঊষাগমন হইলে কর্ত্তাটি বলিলেন এমন ভয়ঙ্করী রজনী যে এমন সুন্দরী ঊষা প্রসব করিতে পারে ইহা ত স্বপনেও বিশ্বাস করিবার যো নাই। যাহাহউক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কর্ত্তা বসিয়া প্রভাতে পঠনীয় স্তবাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। সেই সময় উপরে পূজার ঘরও খোলা হইল কর্ত্তা খড়মের শব্দে বুঝিলেন সাধু নামি-তেছেন। সাধুকে দেখিয়া কর্ত্তা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। সাধুও স্মিতমুখে দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া মন খুলিয়া কর্ত্তাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন বলিলেন কথা পরে হইবে। সমস্ত মঙ্গল স্নান করিয়া আসিয়া সকল কথা কহিব।

স্নান ও বিশ্রামান্তে সাধু সকল ব্যাপার কর্ত্তাকে গোপনে জানাইলেন। বলিলেন আমি অনেক স্তব স্তুতি করিয়া এই বর লাভ করিয়াছি যে অদ্য হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে আর তোমার বাটী উৎপাত হইবে না। দক্ষ ছবির অপরাধ মাতা ক্ষমা করিয়াছেন কিন্তু সতীর গতি না করার অপরাধ এখনও শমিত হয় নাই। সতী মৃত্যুকালে ত্রিপাদ দোষ অর্থাৎ পুষ্করা পাইয়াছেন। পুষ্করা পাইলে বাস্তু বৃক্ষটি পর্য্যন্ত থাকে না, ধ্বংস হইয়া যায়। মৃতার সংসারের কথা কি বলিতেছি, গ্রাম পর্য্যন্ত ধ্বংস হইয়া যায়। কেবল মাত্র জগদম্বার অপার করুণার গুণে আপনি এখনও বহু পরিবার বেষ্টিত হইয়া সুখে ও সচ্ছন্দে বাস করিতে-ছিলেন। কিন্তু মাতাও আর সতীর অসহ্য যাতনা চক্ষে দেখিতে পারেন না, আর সহ্য করিতে পারেন না। পুষ্করা কাটাইবার যে সমস্ত প্রকরণ আছে মাতার অপার করুণার গুণে আর সে সমস্ত করিতে হইবে না কেবল মাত্র গয়ায় গিয়া মৃতার পিণ্ড দিতে হইবে। প্রেত শিলার কার্য্যান্তে রামশিলা ও তৎপরে ৬ গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিতে হইবে ইহা হইলেই সব শান্তি হইবে। আপনার উপর মাতার অপার করুণা। কর্ত্তা বলিলেন—দেব সকলই আপনার প্রসাদে। আমার কি সাধ্য মাতাকে সন্তুষ্ট করি। যাহা করিলেন তজ্জন্য আমার আত্মা ভবদীয় পাদপদ্মে চিরবিক্রীত হইয়া রহিল।

সেই সময় পুলিসের ইন্‌স্পেক্টার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধুজী হাসিয়া বলিলেন আজি রাত্রিতে আসিয়া একবার দৌরাত্ম্য দেখিয়া যাইবেন আর যদি দৌরাত্ম্য না হয় তবে উপরওয়ালাকে জানাইবেন যে দৌরাত্ম্য প্রশমিত হইয়াছে। আর যদি আমার কথায় বিশ্বাস হয় এখনই লিখিয়া উপরওয়ালাকে জানাইতে

পারেন যে উৎপাত বন্ধ হইয়াছে আর নাই। পুলিস সাহেব বলিলেন আমি এ সকল বিষয় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি ও এখনই উপরে সংবাদ লিখিব যে উৎপাত শেষ হইয়াছে। তারপর সাহেব বলিলেন যে একটি বড় চাকরী খালি হইয়াছে। আমার নিজের চাকরী লইয়াই টানাটানি তাহার উপর বড় চাকরীর জন্য লোভ করিতেছি। সাধু বলিলেন ও সব কথা কাল শুনিব। কাল যখন হাসিতে হাসিতে আসিয়া আমাকে সুসংবাদ জানাইবে তখন শুনিব। পুরাণ চাকরী যায় কি নূতন বড় চাকরী হয় কাল তাহা দেখা যাইবে। এখন আপনি বিদায় হউন আমি বিশ্রাম করিব। তবে আপনার ভক্তিতে মা বাঁধা পড়িয়াছেন। আমার মায়ের কাছে হিন্দু খৃষ্টান নাই। আপনি যে হিন্দুয়ানী বিশ্বাস করিয়াছেন এই যথেষ্ট। ভগবানকে ডাকা প্রাণের খেলা ইহা লোক দেখান কাজ নয়—এব্যাপার প্রাণে প্রাণে গোপনে গোপনে। আর আমার মাকে যাই বলিয়া ডাকুন তিনি তাই মঞ্জুর করেন পিতা বলুন, ভ্রাতা বলুন, মাতা বলুন, সখা বলুন, যাই বলুন ডাকের মত ডাক হইলেই তিনি সাড়া দেন। আপনি যেমন প্রাণে প্রাণে ভগবানকে ডাকেন সেইরূপই ডাকিবেন এই বলিয়া সাধু সাহেবকে বিদায় দিলেন।

সেদিন রাত্রিতে সাহেব আসিয়া পাহারা দিলেন কোন উৎপাত আর হইল না। সাহেব সাধুর কথায় বিশ্বাস করিয়া উৎপাত শেষ হইয়াছে বলিয়া রিপোর্ট করিয়াছিলেন, তাহাতে মাজিষ্ট্রেট অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া একটি বড় চাকরীর অর্থাৎ জেলা পুলিসের কর্ত্তা করিবার জন্য লেখেন। সেই সময় সেই চাকরী খালি থাকায় পুলিস সাহেবকেই ঐ চাকরী প্রদত্ত হয়। চাকরীটির বেতন মাসে ৫০০্। পরদিন প্রাতে একটি রূপার থালায় ৫০০্ টাকা সাজাইয়া সাহেব সাধুর নিকট আসিয়া উপস্থিত। বলিলেন আপনার ভবিষ্যৎবাণী ফলিয়াছে। আমার বড় চাকরী হইয়াছে, মাসিক বেতন ৫০০্ অনুগ্রহ করিয়া এক মাসের বেতনের টাকা নজর গ্রহণ করুন, কেন না বেশ বুঝিতেছি, আপনি উপদ্রব শমিত না করিলে আমার কিছুই হইত না বরং চাকরী পর্য্যন্ত যাইত।

সাধু হাসিলেন। কর্ত্তা বলিলেন আপনার জানা উচিত ছিল যে উনি কিছুই গ্রহণ করেন না। অনেক বকাবকির পর সাহেব বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। যেমন টাকা তেমনিই ফিরিয়া আসিল সাহেব বুঝিলেন প্রকৃত হিন্দু সন্ন্যাসী কি ব্যাপার। সাহেব সেইদিন হইতে সেই সাধুর শিষ্যরূপে পরিগণিত

হইলেন। সাধুর অপরাপর শিষ্যের অভাব মোচনে সাহেব সর্ব্বদা যত্নশীল এবং অকাতরে ধনের সদ্ব্যয় করিয়া থাকেন।

এদিকে কর্ত্তার বাটীর উপদ্রব উপশমিত করিয়া সাধু পশ্চিম চলিয়া গেলেন। আর বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি পাঁচ বৎসরের মধ্যে কর্ত্তার এমন অবকাশ হয় নাই যাহাতে গয়া গিয়া পিণ্ড দান করিয়া আসেন। পাঁচ বৎসর পরে সুতরাং আবার উপদ্রব আরম্ভ হয়। যাহাহউক আমাদের যে টুকু প্রয়োজন সেটুকু হইতেছে—বিধর্ম্মীর উপর হিন্দু সন্ন্যাসী ও দেবদেবীর কৃপার কথা। সেই কথা বুঝাইবার জন্য এই গল্পের অবতারণা। বন্ধু আমাকে বলিলেন আপনি বিধর্ম্মী ও বিদেশী হইতে পারেন তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমি যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি তাহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে আপনার উপর আপনার গুরুর কৃপা হইয়াছে। ভগবানের কাছে যাইতে হইলে একজন গুরু চাই ইহা সকল ধর্ম্মেরই কথা। আপনি যদি ভগবান পাইতে চান আপনাকে একজন গুরুর শরণাপন্ন হইতে হইবে। নতুবা দ্বিতীয় উপায় নাই। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি শীঘ্রই আপনার গুরু মিলিবে। যে সকল লক্ষণ দেখিতেছি তাহাতে ভুল হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

আমি বলিলাম যদি গুরু মিলে তাহা হইলে বুঝিব তাহাতে আপনার হাত আছে। এইরূপ কথাবার্ত্তার পর আমরা শ্মশান ত্যাগ করিয়া উভয়ে তারকেশ্বরে ফিরিয়া আসিলাম।

শরতে শফর।

শারদীয়া পূজার অবকাশে দেশ ছাড়িয়া বিদেশে বেড়াইতে যাওয়ার আমি পক্ষপাতী নহি। কোথায় সম্বৎসর পরে মাতার রাতুল পদারবিন্দে সগঙ্গাজল জবা-বিল্বপত্র দিব, কোথা শত অপূর্ণ বাসনা স্মরণ করিয়া উষ্ণশ্বাস সহকারে মণ্ডপে মুণ্ড কুটিব, কোথা বছরের জ্বালা ত্যাগ করিয়া তিনটা দিন—অন্ততঃ তিনটা দিন কোনক্রমে শান্তি ভোগ করিবার চেষ্টা করিব, কোথা বহুদিন বহুবৎসর পরে প্রবাসী বাল্য বন্ধুকে সোহাগে আদরে বিশ্বাসে হৃদয়ে আবেগভরে আলিঙ্গন করিব, কোথা বিজয়ার দিন শত্রুকেও মিত্র করিয়া হৃদয়ে টানিব,

কোথা দূর প্রবাস ছাড়িয়া অন্ততঃ কয়টা দিনের জন্য জন্মভূমি জননীর ফল্গুপ্রেম প্রবাহে অভিসিক্ত হইব—না চলিলাম, সব ছাড়িয়া, পাষাণে বুক বাঁধিয়া মোট ঘাট মাথায় ফেলিয়া তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি, পূজাকে যেন হাত দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া রেল-ষ্টেসনে টিকিট কিনিতে চলিলাম। এ চিত্র স্মরণ করিলেও আমার যন্ত্রণা হইত এবং এখনও হয়। কিন্তু যে সেটার উপর চটা তার অদৃষ্টে প্রায় সেইটাই ঘটিয়া থাকে। বিধির মনে যাহা আছে তাহা কে খণ্ডাইবে বল দেখি? আমার তাই হইল, পূজায় পশ্চিম বেড়ানর উপর আমি গররাজী তাই আমাকে ঠিক ঐ সময়ে পশ্চিম যাইতে রাজি হইতে হইল। মাগো, এর পর যে বাঙ্গালায় কি হইবে তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। হাঁ মা মধুপুরে কি তোর পূজা হয়? কলির হনু থাকিলে আমরা সাধের মধু-বন ভাঙ্গিতে অনুরোধ করিতাম।

যাহা হউক অদৃষ্টকেই সার ভাবিয়া ও তাহার দোহাই দিয়া বাহির হইলাম। সঙ্গী বন্ধুরও মুখে কথা নাই আমারও মুখে কথা নাই, যেন একটা ভয় আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। কতবার পশ্চিম গিয়াছি কতবার ভ্রমণ ও কার্য্য উপলক্ষে দূরদূরান্তর গিয়াছি কিন্তু কখনও এমনটি হয় নাই। একটা অনির্ব্বচনীয় ভয়ে হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল। বন্ধুকে বলিলাম ও টিকিট খরিদাদির ভার নিয়া মনে মনে দুর্গতি হারিণী দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলাম। পূজার ছুটিতে যাইতেছি তবু কন্‌সেশন টিকিট কিনিলাম না—মনে হইল ওটা একটা বন্ধন, কেন শুধু শুধু বন্ধনের ভিতর থাকি। স্বাধীনতা যতটা থাকে ততটাই ভাল; ইচ্ছা করিয়া আর একটা ফাঁস গলায় দেওয়া কেন? যাহা হউক লগেজ ওজনাদি কার্য্য শেষ করিয়া বন্ধুবর টিকিট করিয়া আনিলেন। শুনিলাম একবারে হরিদ্বারের টিকিট কিনিয়াছেন, বুঝিলাম আউদ-রোহিলখণ্ড রেলপথ সাহায্যে যাইতে হইবে। হৃদয় টিকিট দেখিয়া নাচিয়া উঠিল মনের অবস্থা ভাল না হইলেও মানসে হিমালয়ের চির-বরফ-মণ্ডিত চূড়াগুলি ভাসিয়া উঠিল সত্য সত্যই হিমাচল—অচল নন্দিনীর পিতৃভবন হিমাচল—দেখিতে আজি চলিয়াছি। কল্পনায় নগাধিরাজের শ্বেত শৃঙ্গগুলি দেখিয়া মনে একটা আনন্দের আবেগ আসিল। কিন্তু তখনই হর্ষ বিষাদ উপস্থিত হইল। তাড়িত সংবাদ আসিল মেল ট্রেনে আজি আর প্যাসেঞ্জার লওয়া হইবে না। হাবড়া হইতেই তাহা পরিপূর্ণ হইয়া আসিতেছে তাহাতে তিল ধারণের স্থান নাই। সাধের শফরে

ছাই পড়িল "মেলে" স্থানাভাব। তখনই প্লাটফরমে দণ্ডায়মান সমিতি দাঁড়াইয়া গেল—সব্‌জেক্ট কি করা কর্ত্তব্য। তখনই আবার ট্রেন আগমন সূচক ঘণ্টা বা রেলধ্বনি হইল। প্রস্তাব করা অনুমোদন করা পোষক করা সে সব কিছুই হইল না—কেবল এই হইল যো আপ্‌সে আতা হায় ওস্‌কো রোখো মৎ। আপ্‌সে কোন্ আতা হ্যায় জানিতে ছুটিলাম—শুনিলাম লুপ প্যাসেঞ্জার! বিধির কি বিড়ম্বনা! কোথা কর্ডমেল না কোথা লুপ্ শ্লো প্যাসেঞ্জার। যদ্ বিধের্মনসি স্থিতম্। কিন্তু হাকিম নড়েত হুকুম নড়ে না। যথা সময়ে আমরা লুপ্ প্যাসেঞ্জার মাতার কুক্ষিতে প্রবিষ্ট হইলাম—এখানে ভিড় নাই—পাতলা। আমরা তিন জনে একখানি থার্ড কেলাস—শ্রীবিষ্ণু—হুঁ তাই বটে, থার্ড কেলাস ঘরে উপবিষ্ট হইলাম! আমরা লজ্জার মাথা খাইয়া থার্ড কেলাসের টিকিট লইয়াছিলাম। তবে গড়ীতে উঠিয়াও একেবারে নিরাপদ হইতে পারি নাই, মনকে বুঝাইতে হইয়াছিল। বন্ধু তারস্বরে থার্ড ক্লাস ভ্রমণের গুণ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি বলিলাম ওরূপ করিলে আমি লুপ্ লাইনের গুণ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইব। বন্ধু নিশ্চেষ্ট হইলে আমি বন্ধুকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলাম "কে না জানে ডিউক অব হাটিংটনকে গ্লাডষ্টোন—বিলাতের মহামন্ত্রী মহামতি গ্লাডষ্টোন সাহেব কি বলিয়াছিলেন? ডিউক বলিলেন Why do you travel third class গ্লাডষ্টোন্ উত্তর করিলেন Because there is no fourth, যাহারা ইংরেজী জানেন না তাঁহাদের জন্য এখন "অনূদিত" করিয়া দি। ট্রান্‌সেলেসানের বাঙ্গালা "অনুবাদ" বলিয়াই চিরকাল জানিতাম এখন কিন্তু দেশ "অনূদিত" শব্দে মুখরিত। আমার বিশ্বাস যে বাঙ্গালা লিখিতে গেলে যে কোন প্রকারে অনূদিত আর মুখরিত কথাটা লাগান চাই নহিলে সমালোচক ছাড়িবেন না। যাহা হউক এখন কথাটা এই ডিউক বলিলেন—মহাশয় আপনি তৃতীয় শ্রেণীতে চাপেন কেন? গ্লাডষ্টোন্ বলিলেন—চতুর্থ শ্রেণী নাই বলিয়া। বিলাতের মহামন্ত্রীর পক্ষে সবই খাটে, লাউ ডাঁটা খাইলে লোকে বলিবে 'সখ' আর আমি খাইলে লোকে বলিবে "দগ্ধোদরের তাড়না"। বংশী নিনাদ হইল শকটরূপিণী গোপিনীগণ এঞ্জিন শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। আমিও লুপ লাইনের প্রত্নতত্ত্ব ব্যাখ্যায় নিযুক্ত হইলাম। দূরে আমাদের কামরার শেষ প্রকোষ্ঠে কয়েক জন গোল করিতেছিল। সহসা গোল থামিল—রাম প্রসাদ সেনের একটি গীত কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।

মন্ তোর এত ভাবনা কেনে একবার কালীবলে বস্‌রে ধ্যানে।
আলো চাল আর পাকা কলা কাজ কি রে তোর আয়োজনে।
তুমি ভক্তি-সুধা খাইয়ে তারে তৃপ্ত কর আপন মনে॥
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো কাজ কি রে তোর সে রোসনাইয়ে।
তুমি মনোময় মাণিক জ্বেলে দাও না জলুক নিশি দিনে॥
মেষ মহিষ ছাগলাদি কাজ কি রে তোর বলিদানে।
তুমি জয় কালী জয় কালী বলে বলি দাও তোমার রিপুগণে॥
ঢাক ঢোল সানাই আদি কাজ কি রে তোর সে বাজনে।
তুমি জয় কালী বলে দাও করতালী মন রাখ মার শ্রীচরণে॥
জাঁকজমকে কর্‌লে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তাঁরে কর্‌বে পূজা জান্‌বে না রে জগৎজনে॥

গান শুনিলাম,—একবার দুইবার। ইন্‌কোরে শুনিলান। দলস্থ একজন তাম্বুল করঙ্ক বাহিনী হইয়াছেন কিন্তু তদাভাবে তিনি "তাওয়া" রচনা করিতে-ছিলেন ও অপরজন শয্যা রচনা করিতেছিলেন। কিন্তু উভয়েই গানে মগ্ন। ও দিকে আবার গান আরম্ভ হইল। এবার দাশরথী রায়—

"কিসে চলে বল, কিসে চলে বল,
অচল নন্দিনী বিনা প্রাণ যে সদা অচল।"

এবার গান শেষ হইলে আমাদের ইতি কর্ত্তব্যতার সমিতি বসিল। ঠিক হইল—তারাপীঠ, ফুল্লরা মা, অন্নপূর্ণা অর্থাৎ তারাপীঠ হইয়া, নলহাটী হইয়া আমরা পরে বারাণসী ধাম যাত্রা করিব। মনে করিলাম আজি কালি করিয়া দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণপরমহংসদেবকে দেখা হয় নাই। এখনও শুনিতে পাই সিদ্ধ পুরুষ বামা ক্ষেপা তারাপীঠে বর্ত্তমান, দেহ থাকিতে থাকিতে এই বেলা তাঁহাকে দর্শন করিয়া লই। তিনজনের একমত হইয়া গেল—ভাবনা চিন্তা ঘুচিয়া গেল, আমরাও ষ্টেসনে গাড়ী থামিয়াছে বুঝিয়া হুঁকায় জল করিবার জন্য পাণিপাঁড়েকে তারস্বকে ডাকিতে আরম্ভ করিলাম। কোথায় বা পাণি আর কোথায় বা পাঁড়ে। এদিকে আবার স্বভাবের আহ্বান (nature's call) প্লাটফরমে বসিয়া কাজ সারিবার যোগাড় করিতে না করিতে এঞ্জিন-কৃষ্ণ বংশী ধ্বনি করিলেন। তখন যেখানকার যা সব রহিল ছুটিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। তখন প্রথমে তৃতীয় শ্রেণীর উপর তারপর E. I. R. কোম্পানীর উপর ও

তৃতীয়শ্রেণীর পক্ষপাতীদের উপর আমার ভয়ানক রাগ হইল ও কত কি শুনাইয়া দিলাম। বলাই বাহুল্য শেষে বর্দ্ধমানে গিয়া সকল প্রকার আহ্বান রক্ষা করিতে হইয়াছিল। E. I. R. উন্নত লাইন বড় লাইন লাভ বেশী কিন্তু উহার এত দুর্দ্দশা কেন? আমরা পরে দেখিয়াছি আউদ-রোহিলখণ্ড রেলওয়ে ও নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়েতে এবং অন্যান্য রেলে তৃতীয় শ্রেণীর শকটে শৌচ প্রস্রাবের কামরা আছে। স্বচ্ছন্দে সকল কার্য্য হয়। E. I. R. বলেন ওরূপ হইলে লাইন মলে পূর্ণ হইয়া যাইবে। ওটা কেবল কথার কথা। কৈ অপর লাইনের কোন ক্ষতি হয় নাই ত। তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীর কল্যানেই রেল কোম্পানীর পয়সা ও উন্নতি একথা স্বীকৃত কথা অথচ কাজের বেলায় তাহাদের ত কোন রকম সুবিধা দেখিতে পাই না। আমরা জল জল করিয়া তিনঘণ্টা চীৎকার করিয়াছিলাম আরও অনেকে চীৎকার করিয়াছিল কিন্তু এক ফোঁটাও জল পাই নাই। বকসারের পর ষ্টেসন হইতে কোথাও জল পাই নাই শেষে মোগলসরাই গিয়া জল আহরণ করি। কত বড় বড় সহৃদয় লাট সাহেব আসিলেন কিন্তু কৈ কেহই ত হতভাগ্য তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীর জন্য কিছু করিলেন না। আমাদের অদৃষ্টে এই সবই হয়। গ্লাডষ্টোন বুল্‌গেরিয়ার জন্য কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়াছিলেন কিন্তু কখনও কনিষ্ঠাঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া ভারতের উপকার করেন নাই। তিনি কিন্তু ভক্ত ধার্ম্মিক খৃষ্টান ছিলেন। জয়কৃষ্ণবাবু মহলে একবার দুষ্ট গোমাস্তা আর একবার শিষ্ট গোমাস্তা পাঠাইতেন। বিলাতের রাজনীতিও তাই—একবার রীপণ একবার লীটন। রেলওয়ে দেখিলে বেশ বুঝা যায় কেবল শ্বেতাঙ্গগণের সুবিধার জন্যই রেল। তা হবেই না বা কেন? সাহেবদিগের আমাদের উপর প্রাণের টান কতটা এই সব দেখিয়া যাঁহারা বুঝিতে চেষ্টা করেন তাঁহাদিগকে আমরা কি বলিব? রেলওয়ে আমাদের যত মন্দই করুক না যত ম্যালেরিয়াই দিক্ না যত দুধ ঘৃত মহার্ঘ্য করুক না, যত দেশের শস্য বিদেশে লইয়া যাউক না, যত নূতন নূতন ব্যাধিই আমাদিগকে বারবার উপহার দিউক না কেন, আমরা ইহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। একমাত্র কারণ আমাদের তীর্থ যাত্রার সুবিধা হইয়াছে, দুর্গম তীর্থ সুগম হইয়াছে। তাই বন্ধু বলিয়া ভাল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া দুকথা মনের আবেগে বলিয়া ফেলি। কিন্তু ভাবিলে কিছু থাকে না। যে লাঞ্ছনা, দিল্লী প্যাসেঞ্জারে আরোহীগণের সে দুর্দ্দশা দেখিলে চক্ষে জল আসে। তাহার

উপর আবার কর্ম্মচারী কুলাঙ্গরের দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার আছে। ট্রেন বর্দ্ধমানে আসিলে আবশ্যকীয় কার্য্য সারিয়া আমরা গাড়ীতে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিলাম। গাড়ী আবার মন্থরগমনে চলিতে লাগিল। বর্দ্ধমান ত্যাগ করিলে হাওয়াটা যেন পাতলা মনে হইতে লাগিল। বর্দ্ধমানে পার্শ্বস্থ কামরায় তিনজন মারোয়াড়ী উঠিলেন কথায় কথায় তাঁহারা বলিলেন বাঙ্গালীদের তীর্থ দর্শন প্রথাটা বড় ভাল।

আমরা কথায় কথায় সিন্থিয়া বা সাঁইতে আসিয়া পড়িলাম। কত কথা হইল অজয় নদ সম্বন্ধে, রবী ঠাকুর বোলপুরে থাকেন সেই সম্বন্ধে, জয়দেবের মেলা, লুপ লাইনে অনেক তীর্থ, বীরভূমি শাক্ত প্রধান স্থান ইত্যাদি কথা প্রসঙ্গে আমরা সিন্থিয়া আসিলাম। সিন্থিয়া নামটি বেশ ইংরেজী কবিগণ চন্দ্রকে সিন্থিয়া বলিয়া সম্বোধন করিয়া কত কবিতা লিখিয়াছেন। কঠোর সাঁইতে অবশ্য তাঁহারা পান নাই। যাহা হউক অনেক গুলি প্যাসেঞ্জার সিন্থিয়ায় উঠিলেন। তন্মধ্যে একজন ভদ্রলোক আমাদিগকে দেখিয়াই বলিলেন "মহাশয় তারাপীঠে যাবেন না কি—চিনিতে পারিতেছেন না?" আমরা একটু ইতঃস্তত করিতেছি দেখিয়া বলিলেন "আমি একদিন কলিকাতা যাইতেছিলাম, আপনাদের সহিত লুপ মেলে আলাপ হয় তারাপীঠ সম্বন্ধে আমিই আপনাদের নিকট গল্প করিয়াছিলাম। দেখিয়াই মনে হইল আপনারা তারাপীঠ যাইতেছেন।" আমরা তখন চিনিতে পারিলাম, তিনি বলিলেন "আপনারা মল্লারপুরে নামুন রাস্তা ভাল সুবিধা হইবে।" আমরা কিন্তু ভরসা করিতে পারিলাম না, রামপুরহাট বড় জায়গা লোকজন গাড়ী প্রভৃতির সুবিধা হইতে পারে বলিয়া আরও বিশেষতঃ রামপুরহাটে একজন বন্ধুর একজন আলাপী লোক ছিলেন বলিয়া আমরা রামপুরহাটে নামাই স্থিরতর করিলাম। যথা সময়ে ঘড় ঘড় শব্দ থামিল আমরাও জয় তারা বলিয়া নামিয়া পড়িলাম। ষ্টেসনে বাবুদের নিকট অনুসন্ধানে জানিলাম বন্ধুর পরিচিত লোকটি সেই দিনই লুপমেলে কলিকাতা হইতে রামপুরহাটে আসিয়াছেন। আমরা ষ্টেসনের বাহিরে আসিয়া—তখনই রাত্রি তখন ১টা বাজিয়াছে, পরিচিত ব্যক্তির বাসায় যাইবার জন্য দুইখানি গরুর গাড়ী সংগ্রহ করিলাম। একখানির পরিচয়ে জানিলাম তখনই দুম্‌কা হইতে আসিয়াছে। নয়া দুম্‌কা ওখান হইতে ২০ ক্রোশ। গাড়ী খানি পরিস্কার সুন্দর দুটি গরু, তাদের গলায় আবার ঘণ্টা, খাসা বিছানা, ছৎরিটি বেশ, রজ্জু অভাবে কিন্তু লতা দিয়া বাঁধা। হইলে কি হয় পরিষ্কার অথচ শক্ত। বলাই

বাহুল্য শকট পরিচালক একজন সাঁওতাল। তাহাকে অনুরোধ করায় সে তারাপীঠ যাইতে অস্বীকার করিল—২০ ক্রোশ তখনই আসিয়াছে কি না। বলিল, প্রাতে যাইতে পারে—আমাদের কিন্তু তখনই যাত্রা করা মত হইল। সুতরাং তাহাকে লইয়া আমরা পরিচিত বন্ধুর বাসা পর্য্যন্ত যাওয়াই স্থির করিলাম। অপর শকট চালকটি তারাপীঠে যাইতে স্বীকার করিল তখনই যাত্রা করিতে তাহার কোন আপত্তিই ছিল না।

পরিচিত ব্যক্তির বাটীতে আসিয়া শত ডাকেতে আমরা তাঁহার সুষুপ্তির বিঘ্ন সম্পাদন করিলাম। হলাহলি গলাগলির পর যখন গৃহস্বামী শুনিলেন আমরা তখনই তারাপীঠ উদ্দেশে রওনা হইব তখন তিনি কিছু বিচলিত হইলেন। রাস্তা খারাপ ও বড় হিম ইত্যাদি বলিলেন। আমরা কিন্তু একটু বিশ্রাম করিয়া আবার গো-শকটে উঠিলাম। আমাদের মোট ঘাট বন্ধুর নিকট রামপুরহাটে রাখিয়া গেলাম। নয়া দুমকার গাড়োয়ান ফিরিয়া গেল, তৎপরিবর্ত্তে আমরা অপর একজন সারথী পাইলাম। গাড়ী ছুটিল, গরুর গলার ঘণ্টা বাজিল আমরাও গরুর গাড়ীর মধ্যে কুমড়া গড়াগড়ি হইতে লাগিলাম। কি করিয়া সে যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করিব? সে না শুইয়া সুখ না বসিয়া সুখ, দেহকে নানা প্রকার অবস্থায় রাখিলাম কিন্তু কিছুতেই সুখ বা স্বস্তি পাইলাম না। ইহার উপর আবার সুখের গাঢ়তা আছে—মেল ট্রেনের কোর্স দেওয়া আছে, গানের কর্ত্তপ আছে, বাজনার পরম আছে. বক্তৃতার শেষ বক্তৃতা বা প্যারোরেশন আছে—চলিতে চলিতে উঁচু হইতে ঝণাৎ করিয়া খানায় পড়া আছে। তখন সর্ব্বাঙ্গে বেদনা পাইয়া কেবল মধুসূদন জপ ভিন্ন আর অন্য গতি নাই বুঝিলাম মনে করিয়াছিলাম নিদ্রা আসিলে গোলযোগ মিটিয়া যাইবে আর কোন যন্ত্রণা অনুভূত হইবে না। হায় বৃথা আশা। গাড়ী চলিতেছে তাক্ তাক্ তেকেটে ধেকেটে তেকেটে ধেকেটে—(বেশ যাচ্চে, ক্রমে একটু তন্দ্রার আবির্ভাব ক্রমে প্রথম নিদ্রাগমনের মনোরম সুখ টুকু গাঢ় হইয়া আসিতেছে এমন সময় হা হত বিধে একেবারে) ত্রেকেটে—তেরেকেটে তাক্—একেবারে খানায় ঝনাৎ ঝনাৎ ডবল ঝনাৎ। বন্ধু বলিয়াছিলেন কিতি কিতি ঝনাৎ শুনায় ভাল, খাপে ভাল। যেমন সর্ষপ প্রমাণ বট বীজ হইতে বহু শাখা প্রশাখা ও ঝুরি কাণ্ড সমন্বিত অভ্রভেদী প্রকাণ্ড মহীরুহ সৃষ্টি হয়, সেইরূপ অন্তকার গো শকট আরোহণ আমাদের বীজ স্বরূপ হইয়াছিল নকুল আমাদের গুরুরূপী হইয়াছিলেন আর

ভবিষ্যতে এই শারদ সফরে অনেকবার আমাদিগকে অন্তকার রোপিত বীজ ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল।

গো শকট কিন্তু নিদ্রাকে পরাজিত করিতে পারিল না, জড় কখন কি চৈতন্যকে পরাজয় করিতে পারে? ক্রমে, শত তেরেকেটে তাক্ হইলেও, শতবার কিতি কিতি ঝণাৎ হইলেও, শকট বা চালক নিদ্রাকে দমন করিতে অপারগ হইল। কোথা হইতে কেমন করিয়া কি সন্ধানে নিদ্রা আমাকে অভিভূত করিল তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি কেবল মাত্র স্বকীয় প্রভাব দেখাইয়াছিলেন—আক্রমণ করিয়া এক ঘণ্টা পরে ঊষা দর্শনে আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। একটা গভীর খানায় পড়ার প্রকাণ্ড শব্দে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। এক বিস্তীর্ণ মাঠ মধ্যে চক্ষু মেলিয়া আমি পূর্ব্বদিকে ঊষালোক দর্শন করিলাম। অপর শকটের বন্ধুগণের সংবাদ লইয়া কথায় বার্ত্তায় আমরা একটি গ্রামে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম সারথী কলম্বস্ বা ভাস্‌কোডিগামার মত গ্রামের মধ্য দিয়া নূতন রাস্তা আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছে। কাহারও উঠানের উপর দিয়া, কাহারও লাউ মাচার নীচে দিয়া, কাহারও বাঁশ ঝাড় বা পাঁদাড় দিয়া, কাহারও সারকুড় দিয়া কখনও বা পুকুর পাড় দিয়া গাড়ী চলিয়াছে, এখানে কিন্তু এক নূতন বিপদ। খানা খন্দ শুষ্ক নহে তাহা গভীর কর্দ্দমে পূর্ণ, একবার গাড়ী গাড়লে উঠা ভার। আমাদিগকে সুতরাং বার বার গাড়ী হইতে নামিতে হইতেছিল। আমরা বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম লোকের পরণে তেতেন ও মুচেন কাপড় দেশীয় বুনানি। আনন্দে হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। বেশ হৃষ্টপুষ্ট সবল বালক বালিকা গুলি দেখিয়া আমরা একজন প্রৌঢ়কে জিজ্ঞাসা করিলাম "এখানে জ্বর জ্বালা এখন কেমন?" সে বলিল, "এখানে জ্বর টর নাই।" জ্বর টর নাই শুনিয়া আমাদের যে কি আনন্দ হইল তাহা আর কি বলিব। যাহাহউক ক্রমে আমরা দ্বারকা নদের তীরে আসিয়া পঁহুছিলাম। দ্বারকা নদ ঠিক দামোদরের মত। সিকতাময় নদবক্ষ এক পার্শ্বে ঝির ঝির করিয়া জল চলিতেছে। আমরা নদ জলে মুখ হাত ধুইয়া তৃপ্ত হইলাম। দূরে গ্রামে আনন্দ বাদ্য বাজিয়া উঠিল, আজ শারদীয়া শুক্লা ষষ্ঠি। নদের বক্ষ অতিক্রম করিয়া শকট অপর পার্শ্বে পঁহুছিল আমরাও চলিয়া চলিলাম, এ গ্রাম ও গ্রাম অতিক্রম করিয়া আমরা ক্রমে দ্বারকা নদের তীরবর্ত্তী একটি পথ অবলম্বন করিয়া চলিলাম, দেখিলাম ভারে ভারে কচু যাইতেছে, ইহার অর্থ তখন বুঝিতে পারি নাই পরে বুঝিয়াছিলাম সে কথা

পরে প্রকাশ্য। কিয়ৎদূর গমন করিলে সারথী তারাপীঠের মাতার মন্দিরের চূড়া দেখাইয়া দিল। আমরা প্রণাম করিলাম। ক্রমে বেলা আট-ঘটিকার সময় আমরা তারাপীঠে আসিয়া পঁহুছিলাম। আমার গাড়ী পিছাইয়া পড়িয়াছিল ও আমি আবার গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম। বন্ধুগণ অগ্রেই পঁহুছিয়াছিলেন। গাড়ী হইতে নামিয়া সম্মুখে কুটীর দ্বারে বসিয়া, দেখিলাম—বামা ক্ষেপা।

ওই আঁখিপানে।

ওই আঁখিপানে
চাহিলে কতই কথা পড়ে মোর মনে;
মনে পড়ে কত আশা, কত সাধ ভালবাসা,
কত হাস্য পরিহাস-সুখভরা গানে।

ওই আঁখিপানে
চাহিলে—সকলি আর ভুলি সেইক্ষণে!
মনে মোর লয় হেন, আমার জীবন যেন,
তোমারি প্রতীক্ষা করি আছে ধরাধামে।

ওই আঁখিপানে
চাহিলে—ভুলিয়া যাই আমি কোন্ খানে।
মন্ত্রমুগ্ধ সর্প মত, শক্তিহীন হস্তপদ,
স্তম্ভিত হইয়া রই কি-যেন-কি টানে!

ওই আঁখিপানে
চাহিলে—ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আমার নয়নে।
জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পায়, লাজ ভয় দূরে যায়,
মুহূর্ত্তে ঝটিকা যেন ব'য়ে যায় প্রাণে!

ওই আঁখিপানে
চাহিলে—মরণ সাধ জাগে মোর প্রাণে।
কি বলিব-ওই দৃষ্টি, শুধু হলাহল বৃষ্টি,
বিষাক্ত করিল মোর সমস্ত জীবনে।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচন।

অন্তঃপুর।—ভাদ্র। (কেবল মহিলাগণ কর্ত্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত)। রমণীর উচ্চ শিক্ষা প্রবন্ধে শ্রীলীলাবতী মিত্র বলিতেছেন যে স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার। কতকগুলি উচ্চ শিক্ষিতা রমণীর নাম করিয়া বলিতেছেন আমাদের সমান অধিকার দাও—গার্গী, মৈত্রেয়ীর সঙ্গে রাণী ভবাণী ও হটী বিদ্যালঙ্কারের নাম করিয়াছেন। কোটালীপাড়ার শ্যামাসুন্দরীকেও ভুলেন নাই। তার পর বলিয়াছেন "অনেকে উচ্চ শিক্ষিতা মহিলাদের নানা দুর্নাম করিয়া থাকেন" কিন্তু লেখিকার মতে তাহারা ফলভরে আপনিই নত।

য়ুরোপ আমেরিকায় এখনও রমণীর Equal rights স্বীকৃত হয় নাই, বঙ্গে তাই চাহিতেছেন—হইতেও পারে কিন্তু গার্গী মৈত্রেয়ী সমান অধিকার চাহেন নাই। তাই বলি "ধীরে—রজনী ধীরে"। নগেন্দ্র বালা সরস্বতী "হিন্দু বিধবা প্রসঙ্গ" নামক প্রবন্ধে হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ দিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। দেখিতেছি সে নগেন্দ্র বালা আর নাই এখন সমাজ সংস্কারক ও রিফর্ম্মার দলে ঢুকিয়াছেন। আমরা কত দূর গড়ায় দেখিবার জন্য বসিয়া রহিলাম। হায় শাস্ত্র তুমি না বলিয়াছ—সৎসঙ্গে কাশী বাস। সে যাহা হউক হিন্দু বিধবার প্রতি প্রেম অন্তঃপুরে খর স্রোতে বহিয়াছে। ওয়ালটেয়ার প্রবন্ধ ভ্রমণবৃত্তান্ত বলিয়া পড়িতে গেলাম—ওমা! সেখানেও তাই—এক মা আমার দেশাচারের মাথায় আঘাত করিবার জন্য সম্মার্জ্জনী হস্তে দণ্ডায়মানা। ওয়ালটেয়ার প্রবন্ধে আর কিছু দেখিলাম না কেবল হিন্দু বিধবার একাদশীর উপর বক্র কটাক্ষ। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরাতন সুর—

হে বিদ্যাসাগর কেশব কি কর।

সে যাহা হউক অন্তঃপুর পড়িয়া প্রাণ বড় খারাপ হইল। দেশের রমণীগণের—আমার মা-দের এরূপ মতি গতি দেখিয়া প্রাণ বড়ই ব্যথিত হইল। যে ইংরেজের সভ্যতা লইয়া মাতারা ব্যস্ত সেই ইংরেজের পুস্তকেই আছে—সেই ইংরেজই বলিয়াছেন—There is a God in the fall of the sparrow——চড়ুই পতনেও ভগবান আছেন। ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া কি কোন কার্য্য হইবার

যো আছে? Man proposes God disposes ইহাও সেই ইংরেজের কথা। বিদ্যাসাগর কৈ কিছু করিতে পারিলেন কি? ভরসা করি আত্মবিস্মৃতা মাতারা একটু শান্ত হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবেন। ভারতের আজ ঘোর বিড়ম্বনা। তাই ভারত মহিলা আজ আত্মবিস্মৃতা।

প্রকৃতি।—আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র। শ্রীবসন্তকুমার বসু প্রকাশক। দগ্ধ শুষ্ক মরু হৃদয়ে অন্যমনস্ক হইয়া "প্রকৃতি" খুলিলাম। খুলিয়াই দেখিলাম "বিধবাই হিন্দু সমাজের ভূষণ"। জগদম্বার অপার করুণা আমাকে এক মূহুর্ত্তও হৃদয়-জালা সহ্য করিতে দিলেন না। সাগ্রহে প্রবন্ধ পাঠ করিলাম দগ্ধহৃদয়ে কে যেন সুধা-সেক দিল। দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া আশ্বস্ত হইলাম। বুঝিলাম মা আমার জাগরিতা—কলিতে কেবল তিনিই জাগরিতা আর ভারতের দুর্দ্দশা চিরস্থায়ী নহে। যে দেশে এখনও এইরূপ প্রবন্ধ বাহির হইতেছে সে দেশ এখনও সম্পূর্ণ অধঃপতনে যায় নাই। আমরা লেখককে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে তিনি নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হইয়া বঙ্গ সাহিত্য ও বঙ্গ মাতার সেবা করিতে থাকুন। আমরা প্রবন্ধ হইতে একটু মাত্র তুলিয়া দিলাম। ভরসা করি অন্তঃপুরবাসিনীগণ একবার মনঃসংযোগে এ প্রবন্ধটি পাঠ করিবেন ও কৃতার্থ হইবেন।

"এই বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে, এই সংসারের এক প্রান্তে, জগতের এক কোণে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুপরিবারে, হিন্দু-সমাজে ও কি রত্ন! ওই যে আপন মহিমাছটায় দশদিক আলোকিত করিয়া—ভাবুকের ভাবনা-স্রোত উচ্ছ্বসিত করিয়া—বিশ্বপ্রেমিকের ভগবৎ-প্রেম-তরঙ্গ সঞ্চালিত করিয়া—ভক্তপ্রাণের ভক্তিধারা প্রবাহিত করিয়া জীবন মাতাইতে ওই দেবীমূর্ত্তি—কে? ওই যে শান্তিময়ী, দয়াময়ী, পবিত্রতাময়ী কঠোর ব্রতাবলম্বিনী জননী—কে? একি রূপ, একি-দীপ্তি, একি তেজ! ওই যে আপন বিশাল ক্ষমতার ভ্রুকুটীকটাক্ষে শত বিঘ্ন, শত পাপ-প্রলোভন, অশান্তি, বঞ্চনা, বেদনা সন্তাড়িত করিয়া,

ও

"আগুল্ফ লম্বিত কেশ মুড়াইয়া হেসে হেসে,"

নৈশগগনের ন্যায় গম্ভীর, হিমগিরিসদৃশ অচল, নির্ব্বাত প্রকৃতির মত স্থির হৃদয় লইয়া, এই কাল-স্রোতে জীবন-তরী ভাসাইয়া, অনন্তের কোলে বিলীন হইতে চলিয়াছেন, ওই মাতৃস্বরূপিনী দেবী—কে? দীনহীন হিন্দুর গৃহ—

দলিত, বিধ্বস্ত, মর্ম্মপীড়িত হিন্দুসমাজের শিরসে—ধর্ম্মের উচ্চতম চূড়ায় প্রভাতের শুকতারার ন্যায়, ওই যে কি জ্বলিতেছে! ওই যে অতুলনীয়, অপরিমেয় পবিত্র হিন্দুসমাজের উজ্জ্বল ভূষণ!—ও—কি? জগতের রমণী-হৃদয়ের আদর্শরূপা ওকি হিন্দুবিধবা? তাই বুঝি কবি ও মূর্ত্তি দেখিয়া হর্ষ-বিষাদে উচ্ছ্বসিত প্রাণে গাইয়াছেন,

"চিনেছি, চিনাতে আর হবে না তোমায়।
* * বিধবা তুমি আজন্ম-দুঃখিনী।
শ্মশান হইতে আনি এক মুষ্টি চিতানল,
জ্বালিয়ে রেখেছ বক্ষে দিবস যামিনী।"

বিধবাই হিন্দুসমাজের ভূষণ কেন? প্রথমে হিন্দুললনা ও হিন্দু বিধবার সহিত অন্যান্য জাতীয় ললনা ও বিধবার তুলনা করিলে এ বিষয়ে তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইবে—একটু আলোচনা করিলেই এই 'কেন' কথার উত্তর মিলিবে। পাশ্চাত্য জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, তথাকার ললনাগণ স্বামীর সহিত কেবল পার্থিব সম্বন্ধ রাখিলেই যথেষ্ট হইল বিবেচনা করেন। আবার সে সময়টুকুও কেহ কেহ অপেক্ষা করিতে সময় পান না। স্বামীর জীবিতাবস্থাতেই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া থাকেন। এত লেখাপড়া, এত বাঁধাধরা, পাছে মনের অকুশল হইলে ছাড়াছাড়ি হয় সেই ভয়ে বিবাহ-বন্ধন অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য—প্রেম বাঁধিয়া রাখিবার জন্য এত শাসন শৃঙ্খলের ব্যবস্থা; তথাপি এই কাণ্ড—এই নিয়মের ব্যতিক্রম প্রতিদিন প্রতি দৃশ্যে ফুটিয়া উঠিতেছে। স্বামীর প্রতি অনাদর, অযতন, স্বামী হত্যা ও ব্যভিচার ত আছেই; সুতরাং অল্পবয়সে বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য তাঁহারা হয়ত—

"দেখিছ না? এখনো যে এক ছাদ রোদ?
উচিত এ উদ্বোধন আইলে গোধূলি!"

এই বলিয়া জীবন-মধ্যাহ্নে তাঁহাদের পার্থিব, অকিঞ্চিৎকর, সামান্য সুখের উদ্‌যাপন করিতেও কুণ্ঠিত হন। স্বামীর মৃত্যুর পর অনায়াসে তাঁহারা একটু শোক-চিহ্ন দেখাইয়া ও পুনরায় নূতন স্বামীর সহিত পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া আপন আপন যে কুৎসিত স্বার্থপরতা, অসংযমতা, কৃত্রিম প্রেম, কপট ভালবাসা ও হৃদয়ের অপবিত্রতার পরিচয় দিয়া থাকেন, সে সকল কথা ভাবিতেও হিন্দু-বিধবা ঘৃণাবোধ করেন। সে সকল বিষয় কর্ণে স্থান দেওয়াও তাঁহাদের নিকট

পাপ বলিয়া পরিগণিত। হিন্দু-রমণী তাঁহার জীবন, যৌবন, প্রাণ, রূপ এবং যত কিছু সকলই নিস্বার্থভাবে স্বামীর চরণে উৎসর্গ করিতে পারেন—অনায়াসে সকলই অকপটে স্বামী-পদে অঞ্জলি দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন; তাই জীবনে ত দূরের কথা—মরণেও চিরবিচ্ছেদেও সেই পূর্ব্ব প্রীতি, সেই ভালবাসা, সেই প্রেম, সেই সব—সেই মৃত, পরলোকগত স্বামীর উদ্দেশে উপহার দিয়া থাকেন। অন্যান্য জাতীয় বিধবাগণ স্বামীর অন্তে বা বর্ত্তমানেই অন্য একজনকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিয়া রূপের, যৌবনের ও প্রাণের ব্যবসায় করিয়া থাকেন। যত দিন রূপ থাকে, যৌবন থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের ব্যবসায়ের নিবৃত্তি হয় না; কিন্তু এ সকল হিন্দুবিধবার পক্ষে ঘৃণার্হ। হিন্দুসমাজে সেরূপ করাকে ত বেশ্যাবৃত্তি কহে! হিন্দু-বিধবা জানেন, যে রূপ, যে যৌবন, যে প্রাণ একবার একজনকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন, তাহার আবার ব্যবসায় কি? যাহা একজনকে একবার সমর্পিত হইয়াছে, তাহাতে আর তাঁহার অধিকার কি? সুতরাং হিন্দু-বিধবা সেই পরলোকগত স্বামীর জন্য বৈধব্যব্রত অবলম্বন করাই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কার্য্য মনে করেন এবং সেই কঠোর ব্রত অকুণ্ঠিতচিত্তে গ্রহণ করিয়া জীবনান্ত পর্য্যন্ত অনায়াসে পালন করিয়া থাকেন। হিন্দুজাতির বিবাহ-বন্ধন এত শাসন-শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ নহে। নারায়ণের নিকট যে মন্ত্র পাঠ করিয়া বিবাহ হয় তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন; তাহা সে সামান্য অবোধ হিন্দুবালিকার বোধগম্য হয় না, কিন্তু তথাপি বিধবা হইবার পরেও স্বামীর প্রতি হিন্দুবিধবা অযাচিত প্রেম, স্বার্থত্যাগ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, এবং যত কিছু স্বর্গীয় ভাব ও সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তাহা অন্য জাতির মধ্যে বিরল।

* * * *

স্বামীর ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার পরেই স্ত্রীজাতির চিরসুখের অবসান হয় না। ইহকাল ত সামান্য মাত্র। এই ইহকালেই আমাদের পর-কালের সুখের জন্য চেষ্টা করিতে হয়; সুতরাং এ সল্প সুখ দুঃখে কি আসে যায়? স্বামী কাঁদাইয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যে স্ত্রীর জন্য স্বর্গে সুখের স্থান অন্বেষণ করিয়া রাখিতেছেন তাহা হিন্দু-বিধবা ভিন্ন আর কে বুঝে? তাই বুঝি হিন্দু-কণ্ঠে শুনিতে পাই,—

* * "বিধাতা, করি এ ভিক্ষা যুড়িয়া কর,
* * আমরা দুজনে সেখানে বাঁধিব ঘর।"

জগতে কেহই অমর নহে, সুতরাং বিধবাই বা কেন তবে অমর হইবেন ; অতএব অবশিষ্ট দিনগুলি ধর্ম্মে মতি রাখিয়া আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপন করতঃ সেই অক্ষয় স্বর্গে যাহাতে স্বামীর পার্শ্বে স্থানলাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে হিন্দু-বিধবা দৃঢ় সঙ্কল্প বলিয়াই তাঁহারা দাম্পত্যপ্রেমের আদর্শস্বরূপা। যে শাস্ত্রে হিন্দুরমণী সহ-ধর্ম্মিণী নাম গ্রহণ করিতে পারেন, সেই শাস্ত্রাবলম্বিগণের মধ্যে না হইলে আর কোথায় এমন আদর্শ বিধবার পরিচয় পাইবে?

কে বলে বৈধব্য-ব্রত শাস্ত্রের কঠোরতা মাত্র—কোনও এক সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতা মাত্র—ঋষিগণের স্বেচ্ছাচারিতা মাত্র? যে এ কথা বলে সে অজ্ঞ ; যে এ কথা বলিয়া হিন্দুসমাজ হইতে সমাজবন্ধনস্বরূপা হিন্দুর মূর্ত্তিমতী দেবী-স্বরূপা, হিন্দুগৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা বিধবার নাম লোপ করিতে চাহে—হিন্দুসমাজের উপর কলঙ্ককালিমা ঢালিতে চাহে—হিন্দুরমণীর নামে ঘৃণার ভাব আনিতে চাহে, সে পাপী! হিন্দুর বিবাহে ইহকাল ও পরকালের জন্য দম্পতী সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ বলিয়া, হিন্দুশাস্ত্রে পরিণয় কেবল পার্থিব সম্বন্ধ নহে বলিয়া, বৈধব্যব্রত ও ধর্ম্মরক্ষা ঐশ্বরিক নিয়ম পালনরূপ চিরকাল স্বামীসমাগম-সুখের ব্রতস্বরূপ বলিয়া আজও বুঝি হিন্দুবিধবার নাম স্মরণ করিলে যেন, কোথা হইতে হৃদয়ে পবিত্রতার ভাব উদয় হয়—প্রাণে যেন শান্তিপ্রীতিস্রোত প্রবাহিত হয়! আর প্রেমের কথা যদি বল, তাহা হইলে বলিতে হইবে, হিন্দুবিধবার মত প্রেমিকা বুঝি জগতে নাই! এমন নিঃস্বার্থ প্রেম জগতে কেহ শিখে নাই—এমন প্রেমের ছবি হিন্দুগৃহে ভিন্ন আর কোথাও মিলিবে না। বিধবা অবস্থায়—

"আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুল ডালা
কাহারে পরাব ফুল হার।
আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান
দিব প্রাণ তবে কার পায়!"

এই কথা মনে করিয়া—

"রূপকান্তি, সুখ শান্তি, বিচিত্র নৈবেদ্যরাশি"

ও

"স্বামী সাথে সব সাধ করি বিসর্জ্জন।"

—হিন্দু-বিধবা ভিন্ন, কে কোথায় প্রেমের জলন্ত ছবি দেখাইতে পারিয়াছে, বল দেখি?

এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে "ভারতী"-পত্রিকায় "রামরাজার মুলুক"-শীর্ষক ভ্রমণ-বৃত্তান্তে মান্যবর শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র শাস্ত্রী মহোদয় যে অল্পবয়স্কা বিধবা ব্রহ্মচারিণীর উল্লেখ করিয়াছেন, এখানে তাঁহার পরিচয় না দিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না।

এক পর্ব্বতের শ্মশানমধ্যস্থ একটী ঘন নিকুঞ্জ বনের মধ্যে অল্প দীপ্তিতে একটী মোমের বাতি জ্বলিতেছিল, তন্মধ্যে মৃণ্ময় বেদীতে উক্ত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখক যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কথায় না বলিলে—তন্ময় হইয়া তাঁহার হৃদয়ের যে অপূর্ব্বভাবে তিনি ভাষায় যে দৃশ্য ফুটাইতে পারিয়াছেন, তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া না দেখাইলে বোধ হয়, বুঝান কঠিন হইবে ; যে দেখে নাই বুঝি তাহার কথায় সে দৃশ্যের মর্ম্মগ্রহণ করা অসম্ভব। তিনি লিখিয়াছেন, "সেই বেদীর উপর মৃগচর্ম্ম, তদুপরে শুভ্র বস্ত্রখণ্ড, তদনন্তর—(এবারে আবার শরীর রোমাঞ্চ হইতেছে) যাহা দেখিলাম তাহা বর্ণনার অতীত। সেই যোগাসনের উপরে যৌবনভরা, সৌন্দর্য্যভরা, স্বর্গের অমৃতভরা, সমস্ত স্বর্গের যেন সমগ্র সুখকে একচেটিয়া করিয়া, এক আলুলায়িতকেশা পরম রূপবতী বাঙ্গালী যুবতী অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়নে ব্রহ্মোপাসনায় মগ্না!! সে দৃশ্য স্বর্গের দৃশ্য ; সে দৃশ্যের পূর্ণতা আধ্যাত্মিক পুরুষ ভিন্ন অপর কাহাকেও বুঝাইতে পারিব না। * * *।" লেখক লিখিয়াছেন যে শেষে তিনি "মা" "মা" বলিয়া তাঁহার পায়ে পড়িলেন। পুনরায় গন্ধমাদন পর্ব্বতের এক গুহায় লেখকের সহিত ব্রহ্মচারিণীর সাক্ষাৎ হইবার পর, তাঁহার অনুরোধে ব্রহ্মচারিণী যে পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত হইল দেখুন।

"আমার আদি নাম ধারামতী, আমি বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-কন্যা, পিতার নিবাস ঢাকা-জেলার বিক্রমপুর মহকুমার অন্তর্গত, (গ্রামের নাম বলেন নাই।) স্বামীর নাম বরদাপ্রসন্ন ভাতুড়ী। পিতা কিছুকাল মোক্তারী করিয়া কলিকাতা এবং ঢাকায় ব্যবসায় করেন, ব্যবসায় দ্বারা বিশেষ ধনবান্ হইয়া উঠেন। আমি তাঁহার একমাত্র অপত্য ; অন্য কন্যা পুত্র ছিল না। একাদশ বর্ষে আমার বিবাহ হয়, তের বৎসরে আমি বিধবা হই। আমার বিধবা দশা দেখিয়া পিতামাতা শোকসাগরে নিমগ্ন হয়েন। কাশী, প্রয়াগ, গয়া, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ দেখাইয়া আমাকে ইঁহারা জয়পুরে গোবিন্দজী দেখাইতে লইয়া যান। তথায় আমার দিব্যচক্ষুলাভ হয়, পিতা মাতাকে আরও কাঁদাইয়া গোপনে পলাইয়া একাকিনী পাহাড়ে ও জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যে

উপনীত হই। সেখানে গুরু পাইয়াছিলাম ; দীক্ষার পরেই ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণপূর্ব্বক দেশে বিদেশে ভ্রমণ করিতেছি। * * * পিতামাতা আমাকে সামান্য বাঙ্গালা লেখা পড়া শিখাইয়া ছিলেন, আমি গুরুর সাহায্যে চারিটী ভাষা শিক্ষা করিয়াছি !'' ইত্যাদি। যে সময়ে লেখকের সহিত ব্রহ্মচারিণীর সাক্ষাৎ হয় তখন তাঁহার নাম হইয়াছিল "ভবানী সইয়া'' অথবা 'ভবানী মাতা।'।

বল দেখি, মানব, এমন প্রেম, এমন স্বার্থত্যাগ, এমন বৈধব্যব্রত অন্য কোথাও দেখিয়াছ কি ? ত্রয়োদশবর্ষীয়া হিন্দু-বিধবা বালিকা অবাধে কি কঠিন ব্রত লইয়া অক্লেশে যে ভালবাসা ও হৃদয়ের ক্ষমতা দেখাইলেন, তাহা পাশ্চাত্য প্রদেশের চত্বারিংশৎ কি পঞ্চাশৎ বর্ষের রমণীগণেরও উপদেশ স্থল। বল মানব ! বল ভাই ! কোথায় কোন জাতির কয় জন রমণী এমন 'ভবানী মাতা' হইতে শিখিয়াছে ? এমন 'ভবানী মাতা'কে "মা'' বলিতেও সুখ হয়, শান্তি মিলে, প্রাণ জুড়ায় ! এমন বয়সেও সকল স্বার্থ ত্যাগ করিয়া বরিষার ন্যায় হিন্দু-বিধবার চক্ষে—

"ঝর ঝর বরিষে বারিধারা।"

আর তবু স্ব-ইচ্ছায় —

"হায় পথবাসী ! হায় গতিহীন ! হায় গৃহহারা !"

তবু যেন তাঁহাদের—

"* * সুন্দর সকল ;
উষা যথা কাঁদে, তবু ঝরে মুক্তাফল।

হিন্দুসমাজের মধ্যে এ দৃশ্য—এরূপ ছবি বিরল নহে। এত দেখিয়াও—এত শুনিয়াও যদি বিধবাকেই হিন্দু সমাজের ভূষণ না বল তবে আর কাহাকে বলিবে ?

বামাবোধিনী।—ভাদ্র ও আশ্বিন। অতঃপর আমরা "অন্তঃপুর"
যাহার ফল স্বরূপ সেই "বামাবোধিনীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। এই ভাদ্র
মাসে বামাবোধিনী ৪১ বর্ষ পূর্ণ করিয়া ৪২ বর্ষে পদার্পণ করিল—ইহা বাঙ্গালীর
পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। আমরাও বামাবোধিনীর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

এবারকার বামাবোধিনী প্রবন্ধ গৌরবে বিশেষরূপে গরবিনী। অনেকগুলি
ভ্রমণ বৃত্তান্ত আছে, কাশ্মীর চিত্র, বোম্বাই ভ্রমণ, ভারতীয় পুণ্য নদী বা বদরিকাশ্রম
যাইবার পথ বর্ণনা। চতুর্থ অধ্যায়ে যোষী মঠের বিবরণ আছে। বামাবোধিনী
পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি।

শ্রীবৈষ্ণবসন্দর্ভ।—২য় খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ও ভাদ্র।

সিদ্ধান্ত বাচস্পতি শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সম্পাদিত। শ্রীবৃন্দাবন শ্রীদেবকীনন্দন যন্ত্রে
শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত। শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১৮। এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই
একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল—গোস্বামী মহাশয় ক্ষমা করিবেন, না বলিয়া
থাকিতে পারিতেছি না। ৺ দ্বারকানাথ মিত্র যখন হাইকোর্টের জজ তখন
তাঁহার সংসারে একজন মামা কর্ত্তা ছিলেন। মামা কতকটা প্রাইভেট সেক্রে-
টারীর মত। একদিন বৈকালে বায়ু সেবনার্থ বহির্গমন কালে সমাতুল তিনি
একটি অপরিচিত মুখ দেখিয়া যান। গাড়ী হইতে নামিয়া আবার দেখিলেন সেই
অপরিচিত মুখ। তখন আগন্তুক ও জজ মহাশয়ে এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিল।

জজ দ্বারকানাথ—আপনি কেন ?

আগন্তুক—আমি কাগজের মূল্য লইতে আসিয়াছি।

জজ—মূল্য বাকি আছে ? আমি লই ? কি কাগজ ?

আ—আজ্ঞা হাঁ, প্রত্নতত্ত্বকম্রনন্দিনী।

জজ—কি ?

আ—আজ্ঞা প্রত্নতত্ত্বকম্রনন্দিনী।

জজ—এই কাগজ আমি লই ? সম্পাদক কে ?

আ—আজ্ঞা, শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী।

জজ—তিনি কে ? প্রকাশক কে ?

আ—প্রকাশক শ্রী পিনাক ধৃক্ বটব্যাল।

জজ—তুমি কে ?

আ—আজ্ঞা খগপতি প্রামাণিক, আমি বিল সরকার।

তখন জজ দ্বারকানাথ মিত্র বাহাদুর হতাশ হইয়া উষ্ণশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—
মামা, টাকা দিই তাতে দুঃখ নাই, কিন্তু বাবা বেটারা জুটলো কোথা থেকে !!

শ্রীধামে ভক্তের আবার খবরের কাগজ কেন ? শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সনাতনের
ভোট কম্বল ছাড়াইয়াছিলেন ; তাঁহাকে কাঁথা দিয়াছিলেন, রাজমন্ত্রীকে মাধুকরীতে
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাই বলি বৈষ্ণব ভক্তের আবার রজ ঘাঁটা কেন ? বৃন্দা-
বনে খবরের কাগজ কেন ? ভুলিয়াছি, হায় কাল তোমার অতুল প্রতাপ ! শুধু
তাহাই নহে, শ্রীপত্র অনেক বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া এই দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ
করিলেন বটে, কিন্তু শ্রীপত্রকে উপহার দিতে হইতেছে। চূড়া যদি হইল, তখন
ময়ূর পাখা অবশ্য চাই। গোস্বামী মহাশয় সাবধান সাধুর কপনীর যো না হয়।

তবে যদি ৺ বৃন্দাবনে কাগজই হয় তবে ভাল করিয়াই হৌক—তাই বুঝি উপহার। সে যাহা হৌক কাগজ ভাল করিয়াই হইয়াছে, আমরা পড়িয়া সুখী হইয়াছি। "ভক্তির জয়," "অবতার" উল্লেখ যোগ্য প্রবন্ধ—অনেক অজ্ঞানী লোক এই কাগজ পড়িয়া কৃতার্থ হইবেন। ঠাকুর হরিদাস বলিয়াছেন—

একবার হরিনামে যত পাপ হরে।
মনুষ্যের সাধ্য কি যে তত পাপ করে॥

বোধ হয় ভূমণ্ডলে কুত্রাপি এমন মধুর অথচ প্রগাঢ় ভাব, এমন অতলস্পর্শী বিশ্বাস আর নাই, ভক্তিরই জয় বটে। রামকৃষ্ণপরমহংসও বলিতেন "মা, তুমি যন্ত্রী—আমি যন্ত্র, মা তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা অমলা অহৈতুকী ভক্তি দাও, আমি শরণাগত।"

ইসলাম প্রচারক।—আশ্বিন, ১৩১১, রজব, ১৩২২ হিজরা। কলিকাতা। সম্পাদক—মোহাম্মাদ রেয়াজ উদ্দিন আহম্মদ। এই বিষয়গুলি আছে—তফ্‌সীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ, যমুনা, ইস্রাইল কি ইসমাইল বংশ শ্রেষ্ঠ, মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ, কল্য ও অদ্য, বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষা, আরঙ্গজেব কর্ত্তৃক গোলকুণ্ডা অধিকার ইত্যাদি, জাতীয় ও ধর্ম্মসংবাদ। পাঠক ইহাতে যথেষ্ট প্রবন্ধ পরিচয় পাইবেন। "কল্য ও অদ্য" কবিতা আরম্ভ এইরূপ—

হে অলস নিদ্রাতুর জ্ঞানশূন্য মোসলেমগণ
বারেক নয়ন মেলি নিজ দশা করহ লোকন।

নবনূর।—আশ্বিন, ১৩১১। মাসিকপত্র ও সমালোচন, সূচী—গৃহ, জাতীয় সমস্যা, প্রবাসের স্মৃতি, শরদ্বর্ণন, স্বর্ণরেণু অবনতি—প্রসঙ্গ, অর্দ্ধাঙ্গী, কবিতা-গুচ্ছ।

ইসলাম প্রচারক ও নবনূর দুই খানিই মুসলমান সম্পাদিত পত্র। ইহা কম আনন্দের বিষয় নহে। আমাদের যৌবনে আমরা এক "আজীজন নেহার" ই দেখিয়াছিলাম, আর তখন একজন মাত্র মুসলমান স্ত্রী কবি ছিল। আজ কিন্তু অনেক মুসলমান কৃতবিদ্য হইয়াছেন ও বঙ্গ সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। আমাদের যে কি আনন্দ তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। তবে মনে হয় ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ যদি মুসলমান গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে নিযুক্ত হন তবে বঙ্গ সাহিত্যের বিশিষ্ট উপকার করা হয়। মোগল সম্রাটদিগের সময় যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই অনুবাদিত হয় নাই। ইংরেজীতে যে সকল গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে তাহা যথাযথ কি না তাহাতেও আমাদের সন্দেহ আছে। তাই বলি সাহিত্য-সেবীর সম্মুখে এই বিশাল মাঠ, আবাদ করিলে সোনা ফলিতে পারে।

131

১২শ বর্ষ—৮ম ও ৯ম সংখ্যা। অগ্রহায়ণ ও পৌষ—১৩১১।

পূর্ণিমা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম—

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল; শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এল; শ্রীআনন্দময় শর্ম্মা; শ্রীআবদুল করিম প্রভৃতি।

সূচী।

	বিষয়।	পৃষ্ঠা
১।	শরতে সফর	১৫৯
২।	গদাই পুরুত	১৬৮
৩।	লক্ষ্মীপূজা	১৭৯
৪।	প্রাচীন সাহিত্যকীর্ত্তি	১৮০
৫।	মৃত্যুর পর	১৮৫
৬।	মাসিক সাহিত্য সমালোচন	১৯৩

বাঁশবেড়িয়া।

পূর্ণিমা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

শাখাকার্য্যালয়—২৪ নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। এক সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।
ঐ সুলভ সংস্করণ ১৷০ টাকা। ঐ সুলভ সংস্করণ ৵০ আনা।

ডাক্তার মেজরের ইলেক্ট্রো-সার্শাপ্যারলা

চিকিৎসা-জগতে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে।

রক্তই মানবদেহের জীবনশক্তি, তাড়িত।

শক্তিই জীবনশক্তির মূল।

প্রতিদিন নানা প্রকারে, বিশেষতঃ আহার বিহারে, অত্যাচার অনাচারে, নিশ্বাস প্রশ্বাসে মানবদেহে বিষ প্রবেশ করিয়া থাকে। এই বিষ ক্রমে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া দেহাভ্যন্তরস্থ তাড়িতশক্তির হ্রাস করে, এবং পরিণামে প্রায়ই সাধারণতঃ শোণিত সম্বন্ধীয় পীড়া উৎপন্ন হয়। যে ঔষধ ঐ রক্তদুষ্টির বিষ তিরোহিত করিয়া ঐ হ্রাসপ্রাপ্ত বৈদ্যুতিকশক্তির সামঞ্জস্য সম্পূর্ণরূপ রক্ষা করিতে পারে,

তাহাই প্রকৃত ঔষধ, এই—

"ইলেক্ট্রো-সার্শাপ্যারিলা"ই

তাহার একমাত্র আদর্শ।

ইলেক্ট্রো-সার্শাপ্যারিলার মূল্যাদি; সর্ব্বপ্রকার মুদ্রিভায়ষতাত ব্যবস্থাপত্র সংবলিত ৮ দিন সেবনোপযোগী প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৲ টাকা; ৩ শিশি ৫৷৹ টাকা; ৬ শিশি ১০৷৹ টাকা; ডজন ২০৲ টাকা; প্যাকিং ও মাশুল ইত্যাদি যথাক্রমে ৵৹; ।৹; ।৵৹। পাইকারগণের পক্ষে দর স্বতন্ত্র।

অসংখ্য অযাচিত প্রশংসাপত্র ঔষধের অব্যর্থতার, অকৃত্রিমতার ও অলৌকিকতার জ্বলন্ত প্রমাণ, জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে, আবেদন করিলেই তাহা বিনা মাশুলে সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়।

ডবলিউ মেজর এণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা।

শরতে শঙ্কর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।"

তবু বসিয়া রহিয়াছেন। দেখিয়াই—বুঝিলাম ইনি সাধারণ মনুষ্য নহেন। পদপ্রান্তে বসিলাম, পদপ্রান্তে লোটাইয়া পড়িলাম ভরসা করিয়া আস্তে আস্তে পদরেণু সংগ্রহ করিয়া মস্তকে দিলাম উভয় হস্তে উভয় পদ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। প্রণামের সময় মাথা ঘুরিতে লাগিল। যখন তাঁহার প্রতি চাহিয়া ছিলাম তখনই মাথা ঘুরিয়া ছিল এখন আবার পদদ্বয় স্পর্শ করিবামাত্র মাথা ঘুরিতে লাগিল। বোধ হইল যেন একটা কি তেজ তাঁহার দেহ হইতে নির্গত হইয়া আমার দেহে প্রবেশ করিতেছে,—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরিতে লাগিল। মনে করিলাম আমি ভাগ্যবান, মহাপুরুষ কৃপা করিয়া আমার দেহে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন। অবশ্য একেবারে পাদপদ্মে মন প্রাণ দিয়া ডুবিতে পারি নাই সেরূপ ডুবিতে পাইও নাই। মন যেমন চিরদিন করে সেইরূপই করিতেছিল অর্থাৎ আমি খুব বুঝি এমন আর কেহ বুঝে না; ভাল পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক লোকটার ভিতর কিছু পদার্থ আছে কি না। কিন্তু যখন চন্ চন্ করিয়া, ইলেক্‌ট্রিক্ ব্যাটারী বা তাড়িত যন্ত্র হইতে, পদস্পর্শ মাত্র, তাড়িত তেজ দেহে প্রবেশের ন্যায় একটা তেজ দেহে ঢুকিতে লাগিল, তখন মন বাবাজী মনে মনে বলিয়াছিলেন হাঁ ব্যাপার বটে এখানে চালাকীটি হইবার যো নাই। মন বাবাজী যে কৃপা করিয়া এত টুকু নরম হইয়াছিলেন ইহাই আমার পক্ষে তখন যথেষ্ট হইয়াছিল। আমি প্রণাম করিলাম। বন্ধু, যিনি এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সাহস করেন নাই, তাঁহার সেবার জন্য ফল ছাড়াইতে ছিলেন, আমার দেখাদেখি প্রণাম করিলেন, আমার তৃতীয় সঙ্গীটিও প্রণাম করিলেন। বন্ধু ও আমি প্রণামান্তে চখে চখে চাহাচাহি করিলাম। তখন তিনি আমাদের প্রত্যেককে, পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। ক্ষণকাল পরে বলিলেন "এই যে সব মহাপুরুষ এসেছেন" আমার মনে হইল স্বরটি যেন ব্যাঙ্গের স্বর। তখন বলি-লেন—আপনার চতুষ্পার্শে চাহিয়া ইহারাও—সব মহাপুরুষ। বলিতে ভুলিয়াছি পাঁচ ছয়টা দেশী কুকুর তাঁহাকে ঘেরিয়া ছিল, কেহ শুইয়া কেহ বসিয়া এমনই

ভাবে তাঁহার চতুর্দ্দিকে ছিল। এখন তিনি তাহাদিগকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন "ইহারাও সব মহাপুরুষ।" কারা? চাহিয়া দেখি কুকুরগুলাকে বলিতেছেন। মনে মনে ভাবিতেছি কুকুরগুলাকে মহাপুরুষ বলিতেছেন কি? তখন আবার তিনি বলিলেন "এঁরা সব মহাপুরুষ—এঁরা মহাপুরুষ নন?—এঁরা জ্ঞানী মড়া খান কোন দ্বিধা নাই।" তখন আর সন্দেহ রহিল না যে কুকুরদিগকেই মহাপুরুষ বলিতেছেন। আর আমরাও মহাপুরুষ শব্দে অভিহিত হইয়াছি, কুকুরের সঙ্গে আমাদের সমান করিতেছেন; কেমন বাবাজী কেমন হইয়াছে, পরীক্ষা করিতে না গিয়াছিলে? এখন কুকুরের সঙ্গে যে সমান। না, না, তুমি কুকুরের সঙ্গেও সমান নও তুমি যে কুকুরের অধম। উহারা মড়া খায় উহাদের কোন দ্বিধা নাই—তুমি কি তাহা পার? পার না—সুতরাং তুমি নিশ্চয়ই কুকুরের অপেক্ষা অধম। ঘা—টা বেশ লাগিল।

এদিকে আবার কথাবার্ত্তা বেশ চলিতে লাগিল। বামাচরণ বলিলেন "ইহাদের নাম জান (দেখাইয়া) ইনি বাবুলাল, ইনি ছোট কর্ত্তা, ইনি ছোট রাণী—ইনি মেজ কর্ত্তা। আর সেজ কর্ত্তা ও বড় কর্ত্তা এখানে নাই তাঁহারা মড়া খাইতে গিয়াছেন। এঁদের খাবার দাও আমায় খাবার দিলে হবে না এঁদের দাও। ৪।৫ ঝাঁপী ভাল মুড়ী নিয়ে এস ও আমার জন্য কারণ নিয়ে এস; আমার মার জন্য ফল এনেছ আর কি এনেছ?" আমরা এই কথা শুনিয়া তখনই একজন লোককে মুড়ী ও কারণ আনিতে পাঠাইলাম। আর এক ভরি গাঁজা সম্মুখে ধরিয়া দিলাম। গাঁজা দেখিয়া বড়ই সুখী হইলেন, বলিলেন "আগে গাঁজা খাই তার পর কথা কহিব। মা র সঙ্গে আমার ঝগড়া হইয়াছে। মা আমাকে হারাইয়া দিয়াছেন—দেহটা খারাপ হইয়াছে। বেটী আমার দেহটা খারাপ করিয়া দিয়াছে। আমি হেরে গেছি। আমি তখন বুঝিতে পারি নাই। এ সব ফল কোথা হয়—এ সব কি বেলাতী? আমি কল্‌কেতায় গিছলাম সব দেখেছি, আগুণে গাড়ী, আগুণে বোট, গঙ্গার পুল সব দেখিছি—গোরা দেখিছি আমাকে সব দেখিয়ে ছিল সে যে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভাগিনেয় (ভাগিনেয় বলিলেন কি কি বলিলেন আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছি)। এই বলিয়া তিনি বেদম কাশীতে লাগিলেন। দেখিলাম ও বুঝিলাম সর্দ্দি হইয়াছে তাহার উপর গাঁজার বেয়াড়া। যাহা হউক তখনই একজন লোক (জন কত নিকর্ম্মা সেখানে সর্ব্বদা বসিয়া থাকে), গাঁজা প্রস্তুত করিয়া সুমুখে ধরিল, হাতে করিয়াই শোষটান।

তবে দাঁত পড়িয়া যারয়ায় টানের তত সুবিধা দেখিলাম না। যাহা হউক এই উপলক্ষে কতকগুলা শ্লেষ্মা উঠিয়া যাওয়ায় গলার স্বর বাহির হইল। আর গাঁজা ধরায় মুখের ফুলা ফুলা ভাব ও চোখের জল পড়া অবস্থা কাটিয়া গেল। ইহার পর তিনি সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন এ গাঁজা কে প্রস্তুত করিয়াছিল। প্রত্যুত্তরে যখন জানিলেন যে তাঁহার মনোমত ব্যক্তি প্রস্তুত করে নাই তখন তাঁহাকে ডাকিতে বলিলেন, সে ব্যক্তির নামটি আমি ভুলিয়া গিয়াছি, তবে তিনি যে টুকু পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে মনে আছে যে তিনি নিজে ছোট বামা বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহার একটি নাম আছে। তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও গম্ভীর হইয়া গাঁজা প্রস্তুত করিতে বসিলেন। অবশ্য তিনি আমাদের নমস্য, নারায়ণ সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু বিধি কি এই শীর্ণকায় কৃষ্ণবর্ণ বিপ্রকে নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন? ইহার সঙ্গে টেরা চোখ ও খোঁড়ান চলন এ দুটি যোগ দিতে ভুলিবেন না। কথা কহিবার সময় নানারূপ অঙ্গ ভঙ্গিও আছে।

এমন সময় আর একজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি বামার সুপরিচিত দেখিলাম। আসিবা মাত্র বামাচরণ তাঁহার স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন উভয়ে ঠারে ঠোরে কত কথা হইল। পরে পরিচয়ে জানিয়াছিলাম তিনি এক জন নিকটবর্ত্তী গ্রামের তালুকদার এবং বামাচরণের শিষ্য। ইনি সুরসিকও বটেন। বামাচরণ যখন বলিলেন 'আমি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন প্রদত্ত গড়গড়ায় তামাক খাইব', তখন তিনি বলিয়াছিলেন 'সে আপনার সহিবে কেন (অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে) আপনার যাহা সহিবে তাহাতে তামাক খান্' (অর্থাৎ হেলার নল)।

ইতি মধ্যে মহাপুরুষগণের জন্য ঝাঁপী করিয়া মুড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। কারণও আসিল। কারণ তিনি চাহিয়াছিলেন। বামা চরণ বলিলেন আগে পূজা করি তবে ও সব খাইব। কিন্তু তখনই জ্ঞানী মহাপুরুষগণকে (অর্থাৎ কুকুরগণকে) কতক কতক খাবার দেওয়া হইল। বামাচরণ তখন উঠিলেন গাঁজা কায়দা করিয়া রাখিবাব জন্য কুটীরের দ্বার খুলিলেন। এতক্ষণ তিনি কুটীরের দ্বারে বসিয়াছিলেন। দ্বার খুলিলে ঘরের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম কুটীরের মেজেতে স্তুপাকার ইন্দুর মাটী—শুনিলাম সাপও আছে—মাঝে মাঝে বাহিরও হয়। এক পার্শ্বে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রদত্ত এক-

খানি সোফা (Sofa)—মহাপুরুষ তাহার উপর শোন্ না—প্রায়ই ঘরে শোন্ না—সোফার উপর বোধ হয় এক হাঁটু ধূলা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ঘরে মাটীর ভাঁড় মাটীর কেঁড়ে, মাটীর কলসী যথেষ্ট, সরা মালসাও আছে আরও কত কি আছে। গাঁজা রাখিবার জন্য শুনিলাম একটী লৌহ সিন্দুকও আছে। গাঁজা একটা কলসী কি কেঁড়ের ভিতর রাখা হইল তার উপর কুটীর দ্বারে ডবল তালা পড়িল। বামা চরণ কুলুপ দিয়া ঝুলিয়া পড়িলেন দেখিলেন কুলুপ খোলা যায় কি না। পরীক্ষা শেষ হইলে আসিয়া স্বস্থানে উপবিষ্ট হইলেন তখন বন্ধুর ফল ছাড়ান শেষ হইল। এমন সময় পাণ্ডারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আমাদিগকে তাঁহাদের আলয়ে বা মার মন্দিরে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা পরে যাইব বলায় একজন পাণ্ডা বলিলেন "পরে যাইতে পারেন কিন্তু এখন পূজার একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিন—আর যে সকল ফল আসিয়াছে—ইহা কি সব বামাচরণ খাইবে—বামাচরণের মাতা কি কিছু খাইবে না?" বামাচরণ পাণ্ডাকে ইঙ্গিত করিলেন, পাণ্ডা প্রায় অর্দ্ধেক গুলি ফল তুলিয়া লইলেন আমরা পাঁচসিকার পূজা ও পাঁচসিকার ঘৃত পরমান্ন মাকে দিবার জন্য পাণ্ডার হাতে খরচা দিলাম। পাণ্ডা চলিয়া গেল, যথা সময়ে আসিয়া আমাদিগকে লইয়া যাইবে, যাইবার সময় বলিয়া গেল। শুনিলাম মাতার সেই দিন স্নান হইবে ও আমরা তাঁহার ধাতুমূর্ত্তি দেখিতে পাইব।

তারাপীঠের কালীমন্দির ও দেবীমূর্ত্তি নাটোরের রাজার স্থাপিত। কোথায় নাটোর (রাজসাহী) ও কোথায় তারাপীঠ (বীরভূম) কিন্তু এক দিন বঙ্গে ইহা হইত, নাটোরের রাজা বীরভূমের তারাপীঠে দেবী মন্দির ও দেবীর নিত্য পূজার বন্দোবস্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, পরে সংবাদ লইয়া জানিয়া ছিলাম যে প্রতিদিন দশ সের চাউল সিদ্ধ হয়, আর রাত্রিতে মাতার লুচি ভোগের বন্দোবস্ত। তারাপীঠের ন্যায় স্থানে দশ সের চাউল অতিথি অভ্যাগতের জন্য বোধ হয় যথেষ্ঠ। ময়দার পরিমাণ ভুলিয়া গিয়াছি। তবে যতটা স্মরণ হয় তাতে কার্পণ্য নাই। এই পীঠে প্রতিদিন বামাচরণ (বামা ক্ষেপা) রাজার বা মাতার আজ্ঞানুসারে নিমন্ত্রণ খাইবেন।

পাণ্ডাদের মুখে শুনিয়া যেরূপ জানিয়াছিলাম তাহাই বলিতেছি। পূর্ব্বেও না শুনিয়াছিলাম এমন নহে। মাতার ভোগ রাগ অবসানে যখন খাওয়া দাওয়া হইত তখন বামা ক্ষেপা এক খানি পাতা লইয়া প্রতিদিন যথা কালে উপস্থিত হইত।

কিছু দিন পরে পাণ্ডাদের সঙ্গে কথান্তর ও ঝগড়া হইলে পাণ্ডারা বামাকে অন্ন না দিয়া তাড়াইয়া দেয়। বামা চরণ উপর্য্যুপরি তিন দিন অন্ন পান নাই। ও দিকে নাটোরের রাজাকে তৃতীয় দিনের শেষ রাত্রিতে এই মর্ম্মে স্বপ্ন হইল যে দেবীর তিন দিন ভোগ হয় নাই। বামার অনাহারে দেবীর অনাহার। বামা মড়া খায় মড়া ঘাঁটে এই সব বলিয়া পাণ্ডারা রাজ কর্ম্মচারীর নিকট অভিযোগ করায় বামা চরণ অনাচারী ও অস্পৃশ্য বলিয়া কর্ম্মচারী তাহাকে দেবালয়ে ঢুকিতে নিষেধ করিয়াছে ও তাহাকে অন্ন দেওয়া বন্ধ করিয়াছে ও পাণ্ডারা ঐ উপলক্ষে বামার সহিত ঝগড়া করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। ইহার শীঘ্র প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক। নাটোরের রাজা দেখিলেন যে তাঁহার মাথার শিয়রে দাঁড়াইয়া একটি স্ত্রীলোক এই সব কথা বলিয়া শূন্যে মিশাইয়া গেল। বলাই বাহল্য নাটোর হইতে কড়া হুকুম আসিল দেবীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ভাল করিয়া পূজাদি দেওয়া হইল ও দেবালয়ে বামাচরণের অবাধ গতি বিধি সাব্যস্ত হইল। তিনি যখন ইচ্ছা আসিয়া দেবীর প্রসাদ পাইবেন ও না আসিলে পাণ্ডারা দেবীর প্রসাদ তাঁহার নিকট কুটীরে বা শ্মশানে পঁহুছিয়া দিবেন। বামা চরণ নিজে কখন প্রকাশ করেন নাই কিন্তু জগজ্জননী—ভক্ত সন্তানের, তাঁহার বর পুত্রের, কোলের ছেলের, যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তিনি যে কি পদার্থ তাহা লোককে এইরূপে জানাইয়া দিয়াছিলেন। তদবধি লোকে বামা ক্ষেপা কি বস্তু তাহা বুঝিতে পারিল। ভগবান ভক্তেরই বটেন।

বামা ক্ষেপা গাঁজা রাখিয়া দ্বারে ডবল কুলুপ লাগাইয়া বসিবা মাত্র পূর্ব্ব কথিত বিপ্র গাঁজা প্রস্তুত করিয়া বামা চরণের সম্মুখে ধরিলেন। বামা চরণের সেবা অন্তে কলিকা হস্তে হস্তে ঘুরিতে লাগিল। তখন সেই বিপ্র পুনরায় গাঁজা চাহিলেন—তাঁহার কিছু হয় নাই। বামা চরণ আবার উঠিলেন। উঠিয়াই পাঠক মহাশয়কে কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। পাঠক মহাশয় এক জন গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ দেখিলে বোধ হয় এককালে সুপুরুষ ছিলেন এখন ব্যাধির বিড়ম্বনায় হতশ্রী হইয়াছেন, গৈরিক বসন ও আলখেল্লাধারী। তিনি পরিচয়ে বলিলেন সম্প্রতি তিনি মিথিলা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তাঁহার সর্ব্বস্ব চুরি গিয়াছে। স্নানান্তে উঠিয়া দেখেন গাঁটরীটি আর নাই, মিথিলায় বড় চোরের উপদ্রব ইত্যাদি। আরও প্রকাশ বালী উত্তরপাড়া অঞ্চলে তাঁহার বাটী, আদালতে তিনি কার্য্য করিতেন এক্ষণে তিনি উদাসীন। আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ইঁহাকে বামা চরণ বলিলেন

"ইঁহাদেরই কথা ইঁহারা — (স্থান) হইতে আসিবেন আপনাকে বলিয়াছিলাম।" এই কথা বলিয়া বামাচরণ ডবল কুলুপ খুলিলেন, ঘরের মধ্য হইতে গাঁজা আনিয়া বিপ্রকে দিলেন, বাকী গাঁজা শুনিলাম আয়রণ চেষ্টে রাখা হইল। আমি যেখানে বসিয়াছিলাম সেখান হইতে আয়রণ চেষ্ট দেখা যায় না। ঘরের মধ্যে তাঁর একটু বিলম্ব হইল, বোধ হয় বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন। বস্ত্র আর কি লাল সালুর কৌপীন মাত্র। এবার যখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন তখন আমাকে চুপে চুপে বলিয়াছিলেন "সিমুলতলায় যাবি?" আমি সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িয়াছিলাম। বামাচরণ যখন ঘরে ঢুকিলেন তখন সেই তালুকদার ব্রাহ্মণ আমাকে বলিলেন "আমি শুনিয়াছি, আপনাদের উপর বাবার যথেষ্ট—কৃপা দেখিতেছি। কেহ যদি আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সিমুলতলায় যাইতে চায় বা সিমুলতলায় যাইবার জন্য উঁহাকে অনুরোধ করে, তাহা হইলে উনি প্রায়ই স্বীকৃত হন না, এক দিকে পলাইয়া যান। আজ আপনা হইতে মহাশয়দিগকে সিমুলতলায় যাইবার কথা বলিতেছেন, দেখিতেছি আপনাদের ভাগ্য ভাল এখনই স্বীকার করুন—এবং যাহা বলেন সেইরূপ করুন। "এই বলিয়া তিনি তারাপীঠের মহিমা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তারাপীঠ বলা ঠিক হয় নাই "সিমুলতলা" বলা উচিত ছিল। যহা হউক তিনি একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে তারাপীঠের যে শাল্মলী বৃক্ষ তাহা অজয় ও দ্বারকা দুইটি—নদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্থাপিত। সেইখানে মহামুনি বশিষ্ঠ দেব মহাচীন হইতে আসিয়া তারা-সাধন করেন ও সিদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েন ইত্যাদি। এই সিমুলতলার শ্মশান দ্বারকা নদের তীরেই অবস্থিত। বশিষ্ঠ দেবের পর এখানে অনেক মহাত্মা সাধন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন। অনেক মহাত্মার সমাধি স্থান (অবশ্য ইষ্টকের গাথনী) রহিয়াছে, —ইহার কোনটি ক্ষুদ্র কোনটি বৃহৎ। দ্বারকা নদের পূর্ব্বতীরে শ্মশান। শ্মশানের পূর্ব্ব ধারে প্রায় মধ্যস্থলে (শ্মশানটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা) সিমুলতলা। তাহার পর পূর্ব্বদিকে গ্রাম্য পথ। তাহার পর দেবীর কুণ্ড অর্থাৎ একটি মনোহর সরোবর। আমরা বামা চরণের যে কুটীর দ্বারে বসিয়াছিলাম সে কুটীর শ্মশানের পূর্ব্ব প্রান্তে গ্রাম্য রাস্তার পশ্চিমে। ইহারই উত্তরে অথচ গ্রাম্য রাস্তার পশ্চিমে দেহ সমাধি মন্দির গুলি। বোধ হয় আমার দিক্ ভ্রম হয় নাই—ঠিক বর্ণনা করিতে পারিয়াছি।

যখন তালুকদার ব্রাহ্মণ সিমুলতলার গুণ বর্ণনা করিতেছিলেন সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া আমাদিগকে তাহার অর্থ বুঝাইতেছিলেন তখন বামা চরণ কুটীর মধ্যে অয়রণ চেষ্টে গাঁজা রাখিতেছিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া ক্ষণকাল মাত্র বসিয়া বলিলেন "আমি সিমুলতলায় যাইব—তোমরা সব এখানে থাক কেবল ইঁহারা (আমাদিগকে দেখাইয়া) যাইবেন। এই বলিয়াই তিনি উঠিয়া পড়িলেন। কুটীরের চালের বাঁশে সাজি ঝুলিতেছিল—নামাইলেন. দেখিলাম যন্ত্র পুষ্পে পরিপূর্ণ। পুনরায় ঘরে ডবল তালা দিলেন চাবি দুটি কোমরবেষ্টনকারী কৌপীন বস্ত্রে রক্ষিত হইল। হাতে সাজি বামা চরণ অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তাঁর পশ্চাতে জ্ঞানী মহাপুরুষগণ অর্থাৎ বাবু লাল, ছোট গিন্নী প্রভৃতি সারমেয় সভ্যগণ, তার পর আমরা তিন জন আর সেই কৃষ্টকায় বিপ্র ও তালুকদার ব্রাহ্মণ। শেষ দুই জন ও আমরাও দ্রব্যাদী বহন করিয়া সিমুলতলায় লইয়া গেলাম। এইরূপ গমন কালে কন্‌ভোকেসানের দিনে ইয়ুনিভার্সিটীর কর্ত্তাদের যে প্রোসেশন হয় আমার তাহা মনে পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু জগদম্বার বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। সেখানে বামা চ্যান্সালার আর সারমেয়গণ সিণ্ডিকেটের মেম্বর আর কৃষ্ণকায় বিপ্র তালুকদার ব্রাহ্মণ পাঠক মহাশয় প্রভৃতি সেনেট সভার সভ্য। যাহা হউক এইরূপে আমাদের শ্মশান প্রবেশ হইল। যখন কৃষ্ণকায় বিপ্র সিমুলতলায় যাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন তখন আমি ভাবিলাম এ লোকটা ত কেওকেটা নয়। তখন তাঁহার চেহারা দেখিয়া তাঁহার উপর আকৃষ্ট হইতে পারি নাই বলিয়া মনে বড় ভয় হইল। যাহা হউক মনে মনে সামলাইয়া লইলাম। দাশুরথি রায়ের গান মনে পড়িয়া গেল।

"মম মানস সদা ভজ দ্বিজ চরণ পঙ্কজ দ্বিজরাজ করিলে দয়া বামনে ধরে দ্বিজরাজ" শ্মশানে প্রবেশ করিয়া বামাচরণ সিমুলতলার বেদীর সম্মুখে মৃত্তিকার প্রণাম করিলেন। তারপর বেদীর উপর উঠিয়া দেবীর নিকটে পুষ্প গুলি সাজি শুদ্ধ রাখিয়া পুনরায় বেদীর সম্মুখে আসিয়া মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিলেন। পাঠক মহাশয় একটু ধৈর্য্য ধরুন আমি শ্মশান ও বেদীটি একবার দেখিয়া লই।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে নদী তীরবর্ত্তী শ্মশান অপেক্ষা পল্লীগ্রামের শ্মশানের ভীষণতা অনেক অধিক। গঙ্গা তীরের শ্মশানের ভীষণতা আদৌ নাই বলিলেই চলে। সে কালে কিন্তু গঙ্গাতীরের শ্মশানেও ভীষণতা ছিল। বাল্যকালে যাহা দেখিয়াছি সে ছবি এখনও স্মৃতিপটে অঙ্কিত আছে—মুদ্দারফরাসদের মাদুরের ঘর অর্দ্ধ দগ্ধ বংশ খণ্ড সছিদ্র অছিদ্র মৃৎকলসী নানা আকারে ও নানা ভাবে সজ্জিত, কোথাও কুকুরে মনুষ্যের হস্ত কি পদ স্বচ্ছন্দে বসিয়া চর্ব্বণ করিতেছে—

কোথাও শব-দেহ লইয়া শকুনি গৃধিনী ও কুকুরে ঝগড়া হইতেছে, কোথাও একটা শব ভাসিতেছে তাহার পূতিগন্ধে অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত উঠিয়া যায় এরূপ তীব্র গন্ধ। কোথাও দুইটা কুকুরে প্রাণপণে পদ দিয়া মাটী খুঁড়িতেছে—প্রোথিত শিশুর দেহ খাইবে বলিয়া। কোথাও আলুলায়িত কেশা রমণী নদী সৈকতে পদদ্বয় বিস্তার করিয়া শোকের ভাষায় ও রাগিণীতে বিলাপ করিতেছে। কোথাও ধূ ধূ করিয়া চিতা জ্বলিয়া উঠিল চট্ পট্ চট্ পট্ করিয়া শবের গাত্রের মাংস ফাটিতে আরম্ভ হইল। কোথাও কলসে কলসে জল তুলিয়া সৎকার অবসানে পুত্র কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার চুল্লী ধুইতেছে। এখন আর শ্মশানের সে দিন নাই—সে ভীষণতা, সে কঠোর ভাব নাই। এখন শ্মশানে গ্যাস জ্বলে কলিকাতার শ্মশান ও বৈঠকখানার যে কি প্রভেদ তাহা বুঝিতে পারি না। কিন্তু পল্লীগ্রামের শ্মশানে এখনও ভীষণতা আছে। কিন্তু সিমুলতলার শ্মশানের যে ভীষণতা দেখিলাম এরূপ ভীষণতা কুত্রাপি দেখি নাই। শ্মশানটি একটি রীতিমত জঙ্গল, আগাগোড়া শ্মশানটা ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবিধ বৃক্ষ ও গুল্মে পরিপূর্ণ। বড় বড় জাম গাছের একত্র এরূপ সমাবেশ আমি কখনও দেখি নাই। তাহাদের ও অপর তরুরাজির ঘন সন্নিবিষ্ট পল্লব ও পত্রে একেবারে সূর্য্য কিরণ রোধ করায় স্থানটি দিবা দ্বিপ্রহরেও অন্ধকার। এই অন্ধকার নক্তঞ্চর পক্ষীরাও এরূপ নিরাপদ মনে করে যে দিনের বেলায় স্বচ্ছন্দে পেচক কলরব করিতেছে ও শিবাদল এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছে। কোথাও শকুনি ও কুকুরে মৃত দেহ লইয়া টানা-টানি করিতেছে। সমস্ত শ্মশান ভূমি মড়ার মাথায় পরিপূর্ণ যে দিকে চাও রাশি রাশি মড়ার মাথা নানা ভঙ্গীতে মাটিতে পড়িয়া আছে যেন তোমাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছে "কি দেখিতেছ আমাদেরও একদিন স্ত্রীপুত্র ছিল, একদিন আমরাও তোমাদের মত হাসিতাম কাঁদিতাম একদিন তোমাদেরই মত উত্তপ্ত-বক্ষ যুবতীকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন করিয়াছি এখন বুক নাই হৃদয় নাই, এই যে গহ্বর দেখিতেছ ইহাতে গৌর বর্ণ চর্ম্মাবৃত্ত ছিল তাহাকে ওষ্ঠাধর বলিত সেই ওষ্ঠাধরের সাহায্যে যুবতী গণ্ডে উষ্ণ চুম্বন প্রদান করিতাম ওষ্ঠের উপর আমার সুন্দর কার্ত্তিকের ন্যায় গোঁফ ছিল তাহাতে আতর লাগাইয়া সান্ধ্য সমীরণ সেবা করিতে বাহির হইতাম। এই যে যুগ্ম গহ্বর দেখিতেছ ইহাতে দুইটি সুন্দর চক্ষু ছিল, যুবতীর চক্ষে চক্ষু দিয়া কত তারকার খেলা দেখাইতাম। হায় এখন সে সব কিছুই নাই। আমাদের দেখিতে আসিয়াছ—দেখ কিন্তু মনে যেন

থাকে শীঘ্রই আমাদের দশা প্রাপ্ত হইবে।" ফল কথা যে দিকে চাও কেবল দেখ শ্মশানের শ্মশানত্ব।

এই দ্বারকার তীরবর্ত্তী মহা শ্মশানে সিমুলতলায় স্তুপীকৃত মড়ার মাথার উপর বেদী প্রস্তুত হইয়াছে—ইষ্টক দিয়া গাঁথান বড় চাতাল প্রায় ৬।৭ হাত স্কোয়ার, ইহারই উত্তর দিকে চাতালের মধ্যস্থলে একটি বড় কুলঙ্গী তাহার মধ্যে ঘট স্থাপিত ও পিত্তাকার দেবীমূর্ত্তি। এই চাতালের আবার উত্তরে, কুলঙ্গীর পশ্চাতে একটি বড় সিমুল গাছ ছিল সেই গাছ হইতেই শ্মশানের নাম হইয়াছে সিমুলতলার শ্মশান। বেদীর উপর আমি যখন যাই তখন দেখিয়াছিলাম নানা-বিধ পীপীলিকার সারি – জিয়া, লাল, খুদি, কাষ্ঠ! ভয় হইল কি করিয়া বসি কিন্তু বামাচরণের কৃপায় উপবেশনের পর একটি—পিঁপ্ড়াও দংশন করে নাই।

বামাচরণ সাজি রাখিয়া অমুক জিনিষ ভুলিয়াছি স্মরণ করিয়া বলিলেন। পুনরায় বেদী হইতে নামিয়া কুটীরের জিনিষ আনিলেন। পুনরায় বেদীর সম্মুখে প্রণাম করিলেন—গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিয়া উঠিবা মাত্র "মহাপুরুষগণ" বামাচরণের মুখ নাক কাণ কপাল জিহ্বা দিয়া লেহন করিতে লাগিল। বামাচরণ বলিলেন ইঁহারা সব ভৈরব। বন্ধুও দেখিলাম বামাচরণের ন্যায় প্রণাম করিলেন ও তাঁহার মত "মহাপুরুষগণ" কর্ত্তৃক সেই ভাবে সমাদৃত হইলেন। আমিও ভাবিলাম—এইবার মহাপুরুষের পরীক্ষা। আমিও গিয়া প্রণাম করিলাম গড়াগড়ি দিলাম আমারও নাক মুখ কপাল ভৈরবগণ চাটিতে লাগিল। ইহারই পর বামাচরণ কপালে রজঃ মাখাইয়া বেদীর উপর গিয়া শান্ত হইয়া বসিলেন ও দেবীর বাম পার্শ্বে বসিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা করিলেন, জল নাই, নৈবেদ্য নাই, কোশাকুশি নাই কেবল যন্ত্র পুষ্পগুলি দেবীকে অর্পণ করিতে লাগিলেন। মনে মনে মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। শেষে ঘটে একটু কারণ ঢালিয়া দিলেন। পূজা শেষ হইল।

গদাই পুরুত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বক্তা ফুলুয়ার।

আমরা দুই এক দিন পরেই তারকেশ্বর ত্যাগ করিলাম। গঙ্গাতীরে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের মত বদলাইয়া গেল। আমরা একটু পরামর্শ করিয়া আমাদের ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া লইলাম। স্থির হইল বজরাযোগে আমরা আপাতত ত্রিবেনী পর্য্যন্ত যাইব, তাহার পর আবার যেরূপ অভিপ্রায় হইবে সেইরূপ করা যাইবে, আমরা শুভক্ষণে বজরা খুলিয়া দিলাম। বজরা উত্তরমুখে চলিল।

আমাদের নানারূপ কথোপকথন আরম্ভ হইল। এই কথোপকথন ভাগীরথীর তট দর্শন উপলক্ষে আরম্ভ হইয়া ইতিহাসের নানা অতীত কাহিনীর অবতারণা করিতে লাগিল। কখনও ব্যক্তি বিশেষের কথা, কখনও একাল সেকালের কথা, কখনও বা সমাজের কথা, কখনও বা দেশকাল পাত্রের কথা। কথায় কথায় আমরা ভাসিয়া চলিলাম—কথায় কথায় সময় হুহু করিয়া ভাসিয়া চলিল। বন্ধুবর অঙ্গুলি নির্দ্দেশে পর পারে শ্যামনাথ বাবুর কুঠী ও জলটুঙ্গী দেখাইয়া দিয়া শ্যামানাথ বাবুর ইতিহাস, কিম্বদন্তীমূলে যেরূপ শুনা যায় সেইরূপ শুনাইয়া দিলেন, ভাগীরথীর পশ্চিম পারে গৌরহাটী দেখাইয়া কত কথাই বলিলেন। এই গৌরহাটী এখন ফরাশিদিগের অধিকৃত। এইখানে পূর্ব্বকালে দস্যুগণের বিষম আড্ডা ছিল, এখনও ভিন্ন রাজার অধিকার বলিয়া ইংরেজ রাজ্য হইতে অনেক বদমায়েস বিতাড়িত হইয়া ঐখানে বা ফরাশডাঙ্গায় আশ্রয় গ্রহণ করে যখন রেল হয় নাই তখন নৌকা পথ ভিন্ন লোকের গমনাগমনের অন্য উপায় ছিল না, গৌরহাটীর নিকট আসিয়া যাত্রীগণের হৃদয় দুরু দুরু করিত—কখন ডাকাত পড়ে, কখন ঠ্যাঙ্গাড়ে ধরে, কখন বা বোম্বেটে ঘেরে। গৌরহাটীর লোমহর্ষণ অনেক গল্প এখন বিস্মৃতির সাগরজলে ডুবিয়া গিয়াছে। শুনিলাম এই গৌরহাটীতে কবি-ওয়ালা আণ্টুনি সাহেবের আবাসস্থান ছিল। ইহাঁর পিতামহ জব চার্ণকের সম সাময়িক লোক

ছিলেন এবং ব্যবসা উপলক্ষে পর্টুগাল হইতে এদেশে আগমন করেন। ইনি ইংরেজের অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন এবং ইংরেজের স্থতানুটীর কুঠীতে বাস করিতেন। ইহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়া স্থতানুটী গোবিন্দপুর কলিকাতার জমীদার হালীসহরের সাবর্ণ গোষ্ঠীর পূর্ব্বপুরুষ রায়চৌধুরীগণ নবাব আজিমওসানের বিরাগভাজন হয়েন। যখন সাবর্ণ চৌধুরীগণ আপনাদের জমীদারী সত্ত্ব ইংরেজ কোম্পানীকে বিক্রয় করেন তখনও পিতামহ আণ্টুনি কুঠীতে উপস্থিত ছিলেন। পৌত্র আণ্টুনী সংসর্গদোষে আপনার সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলেন এবং পরিশেষে নিজের সখের কবিরদলকে পেসাদারী দলে পরিণত করেন। তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ দুপয়সা লাভ হইয়াছিল ও অবাধে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। ইনি একজন ব্রাহ্মণকন্যার প্রেমের দায়ে আপনার জাতীয়ত্ব বিসর্জ্জন দেন। ইনি রীতিমত বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালীর ন্যায় ইঁহার পুরাণ কাহিনীতে দখল ছিল। অপিচ ইনি হিন্দুর আচার ব্যবহার এবং কাহারও কাহারও মতে ধর্ম্ম পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন। তাঁহার রক্ষিতা ব্রাহ্মণ কন্যার বাটীতে দুর্গোৎসব আদি হইত। তিনি বাঙ্গালীর মত বেশভূষা করিতেন বলিয়া একজন কবিওয়ালা ঠাকুরদাস তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপমূলে একটী গান রচনা করেন।

কওহে আণ্টুনি আমি এইটী শুনতে চাই।
এসে এদেশে এবেশে তোমার গায়ে কেন কুর্ত্তি নাই॥

আণ্টুনি তাহার উত্তর গাহিয়াছিলেন এই—

এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি।
হয়ে ঠাকুরো সিংহীর বাপের জামাই কুর্ত্তি টুপী ছেড়েছি॥

একদা আণ্টুনি এই গান গাহিয়াছিলেন ঃ—

আমায় পার কর মা মাতঙ্গী
আমি ভজন সাধন জানিনা জেতে অধম ফিরিঙ্গী

শুনিলাম সাহেবকে ইহার উত্তর শুনিতে হইয়াছিল—যেন দেবী বলিতেছেন ঃ—

আমি জাত ফিরিঙ্গী জবরজঙ্গী পারব না কো তরাতে।
কর গিয়ে খৃষ্টান ওটায় শ্রীরামপুরের গির্জ্জেতে॥

একদা সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া কবিওয়ালা রামবাবু গাহিয়াছিলেন ঃ—

সাহেব মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি

ও তোর পাদরী সাহেব শুনতে পেলে গালে দিবে চুণ কালী।

আণ্টুনির এই জবাব ঃ——

খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু প্রভেদ নাইরে ভাই।

শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই॥

আমার খোদা যে, হিঁদুর হরি সে,

ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমার মানব জনম সফল হবে যদি ও রাঙ্গা চরণ পাই॥

বন্ধু আণ্টুনির শেষাঙ্ক গানটি আওড়াইয়া তাঁহার ধীর স্থিরদৃষ্টি আমার মুখের উপর সংলগ্ন করিয়া গম্ভীরভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এটা গায়কের হৃদয়ের বিশ্বাস বলিয়া মনে করেন না বাঁধুনির খাতিরে? আমি বলিলাম "আমি বাঁধুনির খাতির বলিয়া মনে করি না। হৃদয়ের বিশ্বাস বলিয়াই মনে হয়—গানে কৈ যুক্তি তর্ক দেখিলাম না।"

বন্ধু বলিলেন সোলোমন না বলিয়াছেন there is nothing new under the sun. আমি হাসিয়া বলিলাম History repeats itself বন্ধু বলিলেন—এই গৌরহাটীতে ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনরেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবের প্রমোদ ভবন ছিল। এখন যেমন বারাকপুরে (চানকে) প্রমোদ ভবন আছে তখন সেইরূপ গৌরহাটীতে ছিল। সে বাটী এখনও বর্ত্তমান। মেরিয়ানকে লইয়া কত শত জ্যোৎস্না পুলকিত মধুযামিনী তিনি জাগিয়া পোহাইয়াছিলেন। হায় রে একদিন ফরাশি গবর্ণরকে লইয়া কত আদর আপ্যায়ণ আমোদ আহ্লাদ কত প্রাণের বিনিময় এইস্থানে হইয়া গিয়াছে। সান্ধ্য ভোজনের নহবৎ রোসনচৌকীর পরিবর্ত্তে এখন সান্ধ্য শিবারব প্রতিধ্বনিকে পুন পুন ব্যাঙ্গ করিয়া থাকে।

বন্ধু বলিতে লাগিলেন দেখুন ভাগীরথীর এক তীরে ঠাকুর গোষ্ঠীর স্থাপিত মন্দিরে ব্রহ্মময়ী ও রাধাকৃষ্ণ তথা সংস্কৃত কলেজ আবার অপরতীরে তেলিনী-পাড়ায় বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের স্থাপিত অন্নপূর্ণা। এথান হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ভাগীরথীর উভয়তীরে বহু জনের স্থাপিত কত দেব দেবীর মন্দির আপনি দেখিয়া আসিলেন কিন্তু এখন এসবের কিছুই নাই। কালধর্ম্মে, সমাজের ব্যভি-চারে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের তাড়নায় লোকের ধর্ম্ম বিশ্বাস ক্ষুব্ধ হওয়ায়

এখন এসব আর আপনি এদেশে দেখিতে পাইবেন না। পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের একদিকে সর্ব্বনাশ করিয়াছে হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ হইতে চলিল এখন আর কেহ দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করে না, তৃষ্ণায় জল দিবার জন্য এখন আর কেহ জলছত্র দেয় না, জলাশয় প্রতিষ্ঠাও করে না, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান জন্য এখন কেহ অতিথিশালা করে না, আত্মীয়স্বজনকে অন্ন দেয় না, পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহিনী মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া বলে একান্নবর্ত্তী পরিবার বহুদোষের আকর। হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্ম করে না, পিতা পিতামহের শ্রাদ্ধ তর্পণ উঠিয়া গিয়াছে, গয়ায় পিণ্ডদান লোপ পাইয়াছে কেননা মরা গরু কখনও ঘাস খায় না। এখন হিঁদুয়ানীর সব গিয়াছে কিছুই নাই। এখন মা—বাবার পরিবার হইয়া দাঁড়াইয়াছেন এখন তাঁহার কিছু পিতৃ কুলের শ্রাদ্ধের পরিবর্ত্তে সন্তান তাঁহার গুদামভাড়া ধরিয়া দিয়া মাতৃঋণ শোধ করে। এখন দেবঋণ ঋষিঋণ পিতৃঋণ পরিবর্ত্তে লোকে বুঝে সরকারী ঋণ, সওদাগরী ঋণ, ব্যবসাদারের ঋণ অর্থাৎ কোম্পানি কাগজ, লাইফইন্‌সিওর ও সেক্‌রা বা রাজার ঋণ। বড়ই শোচনীয় অবস্থা। ধর্ম্মে ব্যভিচার কর্ম্মে ব্যভিচার আহারে বিহারে ব্যভিচার ভাবে অভাবে ব্যভিচার। ইহার ফলও তেমনই হইতেছে—ব্যাধি, নিরানন্দ দুর্ভিক্ষ, হাহাকার, দেশে পয়সা নাই, আহার নাই, স্বাস্থ্য নাই, আমোদ নাই আনন্দ নাই, আছে কি? প্রাণ নাই দেহও নাই—আছে কেবল মাত্র কঙ্কাল (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজের মেরুদণ্ড হায় তাহা-দের কি হইল তাহারা কোথায় গেল? যে সুস্থ সবল স্ফুর্ত্তি-যুক্ত ব্রাহ্মণ কুমার প্রাতে আপন বিষয় কর্ম্ম দেখিত, স্নান পূজাদি অন্তে দিবা দ্বিপ্রহরের পর দেবতার ভোগের প্রসাদ পাইত, অপরাহ্ণ খেলা ধূলায় ও সায়াহ্ন সন্ধ্যায় রাত্রি করিয়া শীতকাল পর্য্যন্ত গান বাদ্যে যাপন করিত, তাহার আজ কি হইয়াছে, সে আজ কি করিতেছে? সে প্রাতঃকালে মুখ ধুইবার পূর্ব্বে চা খাইতেছে ৮টার পূর্ব্বে প্লীহা যকৃৎ ক্ষয়কাশ অর্শ উদরাময় প্রভৃতি পীড়া যুক্ত দেহকে কখনও চায়না কোটে বা ডবলব্রেষ্ট কোটে, কখন পাশী কোটে, কখন মোগলাই আস্তিনে আবরণ করিয়া ৮টার সময় বা তৎপূর্ব্বেও মুঠা খানেক পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন গাঁদালের ঝোল সহ উদরে দিয়া—ডেলি প্যাসেঞ্জার রূপে ট্রেণে শত অম্বল উদ্গার তুলিতে তুলিতে কলিকাতায় যাইতেছেন ও আবার রাত্রি ৯টার সময় ফিরিয়া আসিয়া একটু কোন রকম নেশার পর ব্যাঞ্জার্স ফুডের

রুটি খাইয়া রজনী যাপন করিতেছেন। হায় কি সোণার সংসার রে মরি মরি! ছেলে খাচ্চেন মেলিন্স ফুড, মা খাচ্চেন হাইপোপসফেট অব্ লাইম আর পিতা খাইতেছেন কডালভার, মা জগদম্বা ম্যালেরিয়ায় বহু বিলম্ব—একবার অতলস্পর্শকে হাঁ করিতে বল।

বন্ধুবরের ভাবের উচ্ছ্বাস দেখিয়া আমি আমার জিহ্বা সংযত করিলাম। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া উর্ম্মিমালার ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার ভাব ভঙ্গের ভয়ে আর কোন কথা বলিলাম না। তিনি আপন ভাবে রহিলেন আমিও আপন ভাবে রহিলাম। ক্রমে যখন তেলিনীপাড়া শেষ হইয়া গোঁদলপাড়ায় পড়িলাম তখন বন্ধুবরের মুখের গাম্ভীর্য্য কাটিয়া গেল। তিনি আপনা হইতে বলিলেন সেকালের ইংরেজ ও একালের ইংরেজের আচার ব্যবহার অনেক পৃথক্। তখন নূতনত্বই হৌক আর যে কারণেই হৌক ইংরেজরা আমাদিগকে ভালবাসিতেন। বাঙ্গালীর সহিত মিশিতেন বাঙ্গালীর আমোদে যোগ দিতেন, শুনিয়াছি বাঙ্গালীর আচার ব্যবহারও অনুকরণ করিতেন। বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি সেকালের সাহেব ও মেমেরা পান তামাক খাইতেন, বৈঠকখানায় ফরাস বিছানা হইত তাকিয়া পড়িত, বাঙ্গালীর মত মেড়ার লড়াই, মুরগীর লড়াই, ঘুড়ীর লড়াই এই সব ব্যাপারে যোগ দিতেন। এখন যেমন তিন মাসের ছুটী লইয়া বিলাত বেড়াইয়া ফিরিয়া আসা যায় তখন তেমনটি ছিল না। প্রথমে এক বৎসরের কম শেষে ছয় মাসের কম হোম হইতে ফিরিতে পারা যাইত না। আর তখন এদেশে নানা রকমের ইংরেজও দেখা যাইত না। কাজেই তাঁহারা বাধ্য হইয়া দেশের লোকের সঙ্গে মিশিতেন। অনেক বড় ইংরেজ সখ করিয়া বাঙ্গালী বিবাহ করিতেন, বলাই বাহুল্য ইহারা ইতর জাতীয়া বাঙ্গালী। সে যাহাহৌক স্পষ্ট দেখিতেছি ভারতের ভাগ্য বিধাতা—তা যে আকারেই হোক। হায়রে তখন আমোদ আহ্লাদ ছিল এখন কেবল হাহাকার। এখন মানুষকে হাসিতে দেখি না।

আমি।—কেন মানুষকে হাসিতে দিল না?

বন্ধু।—সকলের মূলে উদরান্ন—স্বাস্থ্য বল, আমোদ বল, উদ্ভাবনী শক্তি বল শিল্প বল। এখন হা উদর হা উদর করিয়াই লোক কাতর ত কখন কি করিবে? তখন ব্যাধি ছিল না এখন ব্যাধি হইয়াছে। তখন কালে ভদ্রে

"আকাল" হইত এখন প্রায় প্রতি বৎসরই দুর্ভিক্ষ। মানুষ খায় কি? যায় কোথা, করে কি? হাসিবে কোথা হইতে? মুসলমানদিগের আমলেও লোক সুখী ছিল। এখন লোক ভয়ে হাসে না। এই ফরাশিডাঙ্গায় এখনও লোকের অনেকটা সুখ আছে এখানে হিঁদুয়ানীও সতেজ, লোকের দু পয়সা হইলেই লোক আগে সেকালের মত ধর্ম্ম কর্ম্মের দিকে দৌড়ায়। কালে বোধ হয় থাকিবে না কিন্তু এখনও আছে। ওখানে লোকের আমোদও আছে। এই ফরাশিডাঙ্গায় দুইটা দল ছিল একটার নাম ঝকমারির দল আর একটার নাম গুখুরীর দল। দুই দলে উতোর কাটাকাটি গান বাঁধাবাঁধি, সং দেওয়াদিয়ি হইত। একবার গুখুরীর দল অত্যন্ত সরু ফ্যান্‌ফেনে কাপড় পরে ঝক্‌মারীদের পাড়ায় গান গাইয়া বেড়াইয়া গেল। তাহার উত্তর দিবার জন্য ঝক্‌মারীর দলের লোকে কেবল মাত্র কোমরে কালা পাড় বাঁধিয়া ও দুই পায়ের দুই ডিমে কালাপাড় বাঁধিয়া গুখুরীদের পাড়ায় বেড়াইতে গেল। পেটে ভাত না থাকিলে এসব রহস্য চলে না। চুঁচুড়ায় এক দিন সং বাহির হইত। তাহাতে রাজারও যোগ ছিল ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ার! সংয়ে যোগ দিতেন। ফরাশিডাঙ্গা বড় বড় জগদ্ধাত্রী পূজায়, রথে ফরাশিরা যোগ দিতেন।

তারপর বন্ধুমুখে ফরাশিদের তুড়ুং এর কথা; ঝড়ঝড়ির কথা; গড়ের কথা, বিপরের কথা অনেক শুনিলাম। এই সব কথা শুনিয়া ফরেশডাঙ্গা দেখিতে সাধ হইল। আমরা বজ্‌রা লাগাইয়া তীরে উঠিলাম। যথাকালে সহর দেখিতে বাহির হইলাম—গঙ্গার উপর ফরাশিশ চন্দননগরের তীরস্থিত যে রাজপথ তাহার সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। একদিকে ছবির ন্যায় অট্টালিকাগুলি দণ্ডায়মান, অন্যদিকে সাক্ষাৎ ছবি সুরধুনী প্রতিবিম্বগুলি ক্রোড়ে করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া সোহাগভরে জড় ও চৈতন্যের বিবাহ দেখিয়া কুলুকুলু রবে হুলুধ্বনি দিয়া ক্ষিপ্রগতিতে স্বীয় পথের দিকে সরিয়া পড়িতেছেন। সুনীল আকাশের গাত্রে উচ্চশির তরু শাখায় সবুজ পল্লবপত্রগুলি যেন কাহার আঁকা, সমীরের সোহাগ চুম্বনে যখন তাহারা কাঁপিয়া উঠে তখন ছবি নড়ে কেন সহসা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। আকাশের গাত্র হইতে নেত্র সরাইয়া যদি পার্শ্বের দিকে দেখি তবে দেবনদীর তরল কুজ্মটিকা সেবিত দূর দুইটি প্রান্ত দেখিলে অতীত ও ভবিষ্যৎ মানব জীবনের মত বোধ হয়। আর সম্মুখে পাঁরি নগরীকে ব্যঙ্গ করিবার জন্যই যেন রাস্তা ও ফুটপাথে গলা জড়াজড়ি করিয়া শুইয়া কি পরামর্শ

করিতেছে। কিন্তু একটু মনোযোগ সহকারে দেখিলে তাহাদের সৌন্দর্য্যের উপর যেন একটু কালিমা দৃষ্ট হয়—যেন বলে, নবদূর্ব্বাঘন কালিমা দেখিয়া ভীত হইও না—শত সহস্র পদাঘাতে আমরা ম্রিয়মান হই না আমরা বলি তোমায় পদে ত আঘাত লাগে নাই। আমাদের দুঃখ আমাদের ভাগিনীদের দশা দেখিয়া, আহা, তোমাদের গায়ে ত আঘাত লাগে নাই, এতটুকু বলিবার প্রাণ তাহাদের আর নাই, তাহাদের প্রাণ একেবারে দমিয়া গিয়াছে, তাহারা একেবারে মাটী হইয়াছে।

আমরা সহর ঘুরিয়া নানাদৃশ্য ফেলিয়া তুড়ং দেখিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় বন্ধুর পরামর্শে গোর স্থানটি দেখিয়া আসিলাম। বন্ধু মা বোড়াইচণ্ডীকে ও কনে বউয়ের মন্দিরগুলিও দেখাইতে ভুলেন নাই। বজরায় আসিয়া নানা ছন্দে আবার ফরেশডাঙ্গার কথা চলিল। সে রাত্রি আমরা ফরেশডাঙ্গায় নঙ্গর করিয়া রহিলাম। সন্ধ্যা আহ্নিকের পর রাত্রিতে ফরেশডাঙ্গার বিবাহের কথা উঠিল। বন্ধু বলিতে লাগিলেন—

ফরাশিদের আদালতে তমাদি নাই। সেকালের বিবাহের অনেক গল্প আমরা বরাবর শুনিয়া আসিতেছি। সুবল সাহেব বলিয়া একজন জজ ছিলেন। তিনি একদা বাদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন তোমার টাকা ধারে? বাদী বলিল আজ্ঞা টাকা ধারে বই কি? প্রতিবাদীকে এইবার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন তুমি বাদীর টাকা ধার? প্রতিবাদী বলিল—আজ্ঞা না টাকা ধারিব কেন? আমার কি অভাব যে আমি ওঁর কাছে টাকা ধার করিব? সাহেব আবার বাদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন তোমার টাকা ও ধারে? বাদী বলিল নিশ্চয়ই ধারে—এখন ওর অবস্থা ভাল বটে সে কথা আমিও স্বীকার করি কিন্তু বিবাহের সময় ওর অবস্থা খারাপ ছিল আমার নিকট টাকা ধার করিয়া তবে উহার বিবাহের খরচপত্র হইয়াছিল এখন ও মিথ্যা কথা কহিতেছে। সাহেব পুনরায় বিবাদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাদীর টাকা ধার—বিবাহের সময় টাকা লইয়াছিলে? বিবাদী উত্তর করিল—আজ্ঞে না, বিবাহের সময় টাকা ধার করিবার আবশ্যকতা হয় নাই আমার শ্বশুরই সব খরচপত্র আমাকে দিয়াছিলেন—আমি বাদীর টাকা ধার করি নাই। তখন সুবল সাহেব বিরক্ত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন "এ বলে দারে না, ও বলে দারে। —ত মুঁসে সুবল কি কর্‌তে পারে?"

আর একবার সাহেব ঐরূপ বাদী ও প্রতিবাদীকে ক্রমাগত একে একবার ওকে একবার এইরূপে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন ও ক্রমশঃ বিরক্ত হইতেছিলেন তখন সহসা তাঁর বাদী প্রতিবাদীর উভয়ের পরিধেয় বস্ত্রের উপর নজর পড়িল। দেখিলেন বাদীর পরণে পাড়ওয়ালা কাপড় আর প্রতিবাদীর পরণে থানফাড়া কাপড়। সাহেব জানিতেন সধবারা পাড়ওয়ালা কাপড় পরে ও বিধবারা থান পরে। সাহেবের এটাও জানা ছিল যে হিন্দুবিধবারা ধর্ম্মজীবন যাপন করে পাপাচরণে কখনও লিপ্ত হয় না। সধবাদের তেমন নয় তাহারা পেড়ে কাপড় পরে, মাছ খায় বেশভূষা করে ইত্যাদি। অন্ততঃ বিধবারা সধবাদের অপেক্ষা অনেকটা ধার্ম্মিক। পরিধেয় বস্ত্রের উপর যেমন নজর পড়িল অমনি সাহেব বলিলেন বাদীর দাবী ডিস্‌মিস্। বাদী ভাল ভাল প্রমাণ দিয়াছে, বাদী পদস্থ ভদ্র ও ধনী লোক, বিবাদী একটা ছোঁড়া অন্নভাঙ্গা। লোকে বিচার দেখিয়া অবাক্। বাদী জিজ্ঞাসা করিলেন হুজুর এবিচার কেন এমন হইল। তখন সাহেব একমুখ হাসিয়া বলিলেন, "যা যা আমারে ঠকাস্ না—আমি বুঝিয়াছি তুই সধবা আছিস্ আর প্রতিবাদী বিধবা আছে; থান পরে, মাছ খায় না। যা যা বাড়ী যা আমারে ঠকাস্ না।" তখন বাদী যোড়হাতে বিচারের ভ্রম হয়েছে—আমি ছানী কর্‌চি, ও বিধবা বটে কিন্তু বিধবা হয়েও ও প্রকাশ্যে মাছ খায়—মোকদ্দমা করিতে আসিয়াও জেলেদের কাছে থেকে একটা ইলিস মাছ কিনে পান-ওয়ালীর কাছে রেখে এয়েচে, চলুন হুজুর দেখাইয়া দিই গে। সাহেব বলিলেন, "বল কি—চলত দেখিগে।" বাদী আসিয়া তাড়াতাড়ি মাছটা দেখাইয়া দিল। তখন সাহেব এজলাসে ফিরিয়া গিয়া ছানীসূত্রে বাদীর দাবী আবার ডিক্রী করিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। প্রতিবাদীর আর কোন ওজর টেঁকিল না।

ফরেশডাঙ্গা কল্পনার বাসভূমি। সূক্ষ্ম শিল্পের আকর। সংগীতের খনি। এই খানেই মধুকাণের সঙ্গীতের ভিত্তির উপর কীর্ত্তন প্রকাশিত হয়, যাঁহারা বাম্নী বা আন্দীর কীর্ত্তন শুনিয়াছেন তাঁহাদের কাণে আজও "দেখেলাম কত নারী বসে নীরে" লাগিয়া রহিয়াছে। "যার সুখে ছিলাম সুখী আমরা ব্রজের পশু পাখী" এখনও কীর্ত্তনীয়ার কণ্ঠে কণ্ঠে ঘুরিতেছে। ফরেশডাঙ্গায় প্রথম মদন মাষ্টারে যাত্রা আর "মদন মাষ্টারের সুর" তার পর যত বিখ্যাত যাত্রা রউ মাষ্টার, মহেশ চক্রবর্ত্তী, গয়ারাম কোঁয়ার, নবীন গুঁই—সবই ত ফরেশ-

ডাঙ্গার। যাত্রার দলের আড্ডা ফরেশডাঙ্গায়, সেকালে কলিকাতায় যাত্রার দল ছিল না, পাড়াগাঁয়ে বারয়ারী পূজা হইত। লোকে কোঁচড়ে করিয়া টাকা লইয়া ফরেশডাঙ্গায় যাইত আর যাত্রা, আসর, লণ্ঠন, কাটগড়া পাল, ফরাশ-বিছানা সব ভাড়া করিয়া মায় রাঁধুনী ব্রাহ্মণ, কীর্ত্তন, কবি, চণ্ডী যা কিছু সব বায়না করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বাটী ফিরিয়া যাইত। যথাকালে দ্রব্যাদি গিয়া গ্রামে পঁহুছিত। ফরাশডাঙ্গায় বহুতর ভদ্রলোকের বাস ছিল, বহুতর সখের প্রাণ বড় বড় ধনী ফরাশিশ বাস করিত, মেড়ার লড়াই, বুলবুল্ লড়াই, মোরগ লড়াই এসব আমোদ আহ্লাদ ছিল। ধর্ম্মপক্ষে বড় বড় ভট্টাচার্য্য ছিলেন, টোল ছিল, ধারক, পাঠক, শ্রোতা, কথক যাহা কিছু সমস্ত এক ফরেশডাঙ্গায় আসিলেই পাওয়া যাইত কেননা এক ফরেশডাঙ্গায় প্রত্যেক বাটীতে বাটীতে বারমাসে তের পার্ব্বণ। নেশার পক্ষে ফরেশডাঙ্গায় নাই কি ? সব আছে নাম করিয়া আর কাজ কি ? এই খানেই উৎপত্তি তারপর চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্তি। ফরেশডাঙ্গা এপক্ষে চীনের সিংহল, মগের গয়া, খৃষ্টানের যেরুসালেম, মুসলমানের মক্কা আর হিন্দুর গঙ্গা—সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা। এইখানেই মদন মাষ্টার গঙ্গা-ভক্তি-তরঙ্গিণী পালা গাহিয়া সগরবংশ উদ্ধারের জন্য ভগীরথকে দিয়া গঙ্গা আনাইতেন। আমাদের কালে এখনও ভগীরথের শঙ্খ ঘণ্টার রব কর্ণকুহরে মানসে নিনাদিত। বলিতে বলিতে বন্ধুবরের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। তিনি বলিতে লাগিলেন, সদোষ বা নির্দ্দোষ কোন আমোদই আর নাই প্রাণ খুলিয়া হাঁ করিয়া হা হা হা হাসি আর নাই। দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে ৩০ বৎসর পূর্ব্বে দেশে যে আনন্দ—আহ্লাদ আমোদ ছিল এখন হায় তাহা নাই দেশের খেলাধূলা পর্য্যন্ত একেবারে উঠিয়া গিয়াছে—হাসির গট্‌রা, হাসির ফোয়ারা ত বহুদূরের কথা। এই উপলক্ষে একটা সত্য গল্প বলি শুনুন। আমি আনন্দের এত পক্ষপাতী তাহার কারণ এই যে আনন্দই ভগবানের রূপ। ভগবান হইতেছেন সৎ-চিৎ—আনন্দ। যেখানে নিরানন্দ সেখানে ভগবান নাই যেখানে আনন্দ নাই সেখানে ভগবান্ নাই। সকল গ্রামে সকল নগরে সকল প্রদেশে ভারতে আনন্দ ছিল, এখন কেবল হাহাকার তাই আনন্দের কথা স্মরণ করিয়াও আমার স্ফুর্ত্তি আসিতেছে।

এই ফরাশডাঙ্গায় দেশীয় ধনী ও ভদ্র সন্তানদিগের প্রায় সকলেরই এক একটি আড্ডা ছিল। কেহবা বাটী প্রস্তুত করিয়া বাস করিতেন, কেহবা

ভাড়াটিয়া বাটীতে, কেহ বা বন্ধু ভবনে কাল কাটাইতেন। ফরেশডাঙ্গায় এরূপ আড্ডা থাকিবার বিশেষ কারণও ছিল, তখন Extradition Act ছিল না। আইনের এত বাঁধাবাঁধি ছিল না, তার উপর ইংরেজ ও ফরাশিতে চিরবিবাদ ছিল সুতরাং যদি কেহ কোন আইন বিগর্হিত কার্য্য করিত বা ইংরেজ রাজপুরুষের বিষনয়নে পতিত হইত সে অনায়াসে ফরেশডাঙ্গায় গিয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিত। অনেক সময়ে এমন হইত মিথ্যা অপবাদে লোককে জড়িত হইতে হইত। সে কিছুদিন ফরেশডাঙ্গায় গিয়া বাস করিলেই কাল বশে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িত সুতরাং সে রক্ষা পাইত। তাহা ব্যতীত কথ্য অকথ্য নানা কারণে সেকালে ফরেশডাঙ্গায় বাস করিত। ইংরেজ শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদিগকে ধরিতে পারিতেন না। ফরাশিরা কোন ক্রমে তাঁহাদিগকে ধরিতে দিত না। উভয় জাতির মধ্যে শত্রুতা এত প্রবল ছিল।

হুগলি জেলার একজন সম্ভ্রান্ত জমীদার ছিলেন। একস্থানে একটা জেলাই তাঁহার জমীদারী ছিল। তিনি সখ্ করিয়া ফরেশডাঙ্গায় বাস করিতেন, কার্য্যোপলক্ষে অনেক সম্ভ্রান্ত চীন ভদ্রলোকের সহিত মিশিতে হয়, কালক্রমে তাঁহাদের সহিত তাঁহার বন্ধুতা হয়। পরে বন্ধুতার প্রগাঢ় অবস্থায় চীনেদের রীতি নীতি অনেকটা তাঁহার অভ্যাস হইয়া যায়। সংক্ষেপে তিনি গুলি খাইতে অভ্যাস করেন। ফরেশডাঙ্গায় অমুক বাবু গুলি চালাইলেন সহর তোলপাড়। যাহারা যাহারা গুলি খাইবে তাহারা বিনা পয়সায় ইচ্ছামত চাটে গুলি খাইতে ত চাহিবেই তাহার উপর আবার মাসিক তন্‌খা পাইবে। বড় বড় দুধের কটাহে দুধ আফিম পাক হইত কেহ কেহ সেই সব বা মালাই খাইয়া নেশা করিত, কেহ কেহবা চণ্ডু খাইত আর অধিকাংশ লোকেই গুলি খাইত। কখনও বা একবারে পাঁচ শত হুঁকা পাওয়া যাইত পাঁচ শত ভদ্রলোক একেবারে বসিয়া গুলি খাইত। বাবু নিজে বিদ্বান্, খান দান সমন্বিত বহু গোষ্ঠী প্রতিপালিত সুরসিক সংগীতজ্ঞ ও ধনকুবের এবং সমাজের নেতা। সুতরাং গুলি সে সময় কিরূপ চলিয়াছিল তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। সেই গুলি খাইবার সময় পৃথিবীর উপাদেয় বস্তু জড় করিতে হইত। তাহাতে মূল্য দিবার পক্ষে কৃপণতা ছিল না। আর এই গুলি খাইবার সময় পালমেণ্ট বসিত যাহা কিছু ইতি কর্ত্তব্যতা এই সময়েই শেষ

হইত ও খোস গল্প হইত। নেশা শেষ হইলে গান বাদ্য প্রভৃতি হইত। তার পর পোলাও কালিয়া খাইয়া সভা ভঙ্গ হইত,এই সভার মেম্বর যাঁহারা,তাঁহারা প্রকাশ্যে গুলি খাইতেন। ইহাতে নিন্দার কাজ তাঁহারা কিছু দেখিতেন না। গুলি খাওয়া উপলক্ষে পক্ষান্তরে যথেষ্ট আনন্দ হইত। বোলের চোটে হল ফাটিয়া যাইত।

ক্রমে বাবুর আদেশ হইল হুগলির কাছারীর সব লোকদিগকে তাঁহার সভায় আনিতে হইবে। রীতিমত উদ্যোগ হইল, বৈকালে চারিটার আমলে ফরেশডাঙ্গা হইতে বজরা ভাউলিয়া ডিঙ্গী পিনেস বোট প্রভৃতি গিয়া হুগলিতে পঁহুছিত। বাবু পাঠাইয়া দিতেন বলাই বাহুল্য তাঁহার নিজের খরচ বাবুর লোকেরা আনিতে যাইত। ক্রমে আদরে আহ্বানে, আহারে, আপ্যায়নে আলস্যের আমোদে, ইয়ারকির ইচ্ছায় অনেক গণ্যমান্য লোক হুগলি হইতে প্রত্যহ ফরেশডাঙ্গা যাতায়াত করিতে লাগিলেন। আমলাদের ভাউলে, উকীলদের ভাউলে,পদাতিকদিগের ভাউলে,দেওয়ানজী সেরেস্তাদারের ভাউলে নাজীরের ভাউলে, শুনিতে পাই কখন কখন হাকিমেরও ভাউলেও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গঙ্গা বক্ষ আলো করিয়া ফরেশডাঙ্গা যাইত,আবার রাত্রি ৮টা বা ৯টার আমলে নেশায় বুঁদ হইয়া, পোলাও কালিয়াকে উদরে ধরিয়া নানাবিধ খোস গল্প করিতে করিতে হো হো হাসির ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্লাবিত করিয়া আবার নেশার আর্মেডা ফিরিত। অনেক গরিব দুঃখী ও মধ্যবিত্ত লোক সে সময় নেশার খাতিরে খাইতে পাইয়া তনখা পাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছিল।

একদিন একজন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ ভট্টপল্লী হইতে বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন। লোকটা কিছু মুখফোড় একথা ওকথার পর অনেক গৌরচন্দ্রিকা করিয়া ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ বাবুকে বলিলেন "মহাশয়ের সবই ভাল, সবই ভাল, তবে কিনা একটা কথা শুনিতে পাই—সে টা না হ'লে একেবারে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণিমার চন্দ্র হইত—এখনই যে নয় তা নয়—যশ-কৌমুদিতে পৃথিবী ব্যাপ্ত হয়েছে—তবে কিনা ব্যবহারে, শ্রুত আছি, যে মৃত্যুকালে রক্ত বাহে হয়—এই আফিমের ব্যবহারটা ত্যাগ করিলে বিশেষ আনন্দের কথা হয়।" বাবু এই কথায় হাড়ে চটিয়া যান ভট্টাচার্য্যের অনধিকার চর্চ্চায় বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। প্রত্যুত্তরে তখনই বলিলেন, "আফিম না খাইয়া কেবল মাত্র নস্য লইয়া, কোন্ কোন্ ভাটপাড়ার ভট্চাজ্যি পোলাও কালিয়া বা পায়সান্ন—

পিষ্টক হেগে মরেচেন আমাকে বলিতে পারেন।" হো হো হাঁসির ফোয়ারা ছুটিল ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ একেবারে নির্ব্বাক্। যাহা হউক এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণের বিদায়টা হইয়াছিল ভাল।

লক্ষ্মীপূজা।

হায় লক্ষ্মি! আজি কোন্ অভিশাপ বহি
বিদেশীর অঙ্কগত তুমি
বিরহ বিদীর্ণ বক্ষে হের ব্যথা সহি
অন্ধকারে কাঁদে বঙ্গ ভূমি।
কোন্ পথে চ'লে গেছ নাহিক সন্ধান
ধু ধু করে শূন্য চারিধার
তবুও অভাগী হের তুলিয়া নয়ান
আশাপথে চাহিয়া তোমার।

দুর্ভিক্ষ তাণ্ডব নৃত্যে তব লীলা ঘরে
অট্টহাস্য হাসিছে ভীষণ
হায় স্নেহাতুরা মাতা তনয়ের তরে
আহরিবে কেমনে অশন।
আত্মপর না বিচারি সে যে একদিন
বিশ্বজুড়ি বিলাইল অন্ন
তাহার তনয় আজি ভ্রমে দীনহীন
হায় ভাগ্য একিরে অধন্য!

এ নহে ত' পূজা অর্ঘ্য—এযেরে তর্পণ
চিতাবহ্নি করিতে নির্ব্বাণ
নহেত' এ হুলুধ্বনি—এ যেন রোদন
হৃদিমাঝে জাগায় শশ্মান।
নহে নহে শুভ্রলেখা আলিপনে আঁকা
এযে অশ্রু-তুষার-রচনা।
স্তরে স্তরে যত্নে ওই ধন ধান্য রাখা
মূঢ় ও যে শিশুর খেলনা!

কিযে ছিলে বঙ্গলক্ষ্মি জানি আমি জানি
সর্ব্বময়ী ঐশ্বর্য্য রূপিনী!
মন্দাকিনী হৃদি পরে রম্য মুখ খানি
ফুটে যথা সে হেম নলিনী।
শক্তি ছিল শোভা ছিল—স্বাস্থ্য নিরাময়
গৃহে গৃহে কৈলে বিতরণ।
তাই পূর্ণরূপে ছিল ধনধান্য ময়
ধরিত্রীর এ বঙ্গ-রতন।

রুগ্ন শীর্ণ পঙ্গু আজি সেই বঙ্গভূমি
পরের প্রসাদ লাগি চায়
মঞ্জীর বাজিত তার যে চরণ চুমি'
শৃঙ্খল বাজিছে আজি তায়।
কেন তবে বিড়ম্বনা—সবি তার শেষ
রিক্ত মরু মহাভূমণ্ডল
এখন মুছিয়া দিক সর্ব্ব চিহ্ন লেশ
"মহাবরষ'র রাঙাজল।"

তবু লক্ষ্মি! তব নামে আজি ঘরে ঘরে
শুন শঙ্খ উঠিছে বাজিয়া
"ফির' ফির' হে চঞ্চলে" উচ্চ সকাতরে
বঙ্গ ডাকে মিনতি করিয়া
রাজরাণী রূপে তুমি পশ্চিমের ঘরে
থাক যদি হয় অভিরুচি
দরিদ্রের লক্ষ্মী এস ধান্য কাঠা করে
চন্দ্র মুখে বহি হাস্য কুচি।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

প্রাচীন সাহিত্য-কীর্ত্তি।

বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যের ভূয়িষ্ঠাংশ চিরদিনের মত বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হইয়া গেলেও এখনো ইহার যে অংশ অবশিষ্ট আছে, তাহার বিরাটত্ব দেখিলেও বিস্ময়ে হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে। কিন্তু অমুদ্রিত ও প্রাচীন তুলোট কাগজে সন্নিবদ্ধ থাকিয়া এই সাহিত্যাংশ ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় বটে! এখন প্রাচীন সাহিত্য-কীর্ত্তি অনেক সংগৃহীত হইয়াছে সত্য কিন্তু কেবল তাহার সংগ্রহ মাত্র করিয়াই কোন মাতৃভাষানুরাগী ব্যক্তি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। ধ্বংসের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করিয়া যাহা আজও বাঁচিয়া আছে, তাহার একটা সদ্গতি করা যে নিতান্তই আবশ্যক, একথা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। মুদ্রা-যন্ত্র-সাহায্যে ইহার স্থায়িত্ব-বিধান করিতে না পারিলে আমাদের সমস্ত শ্রমই বিফল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সামান্য তৃণ-সমষ্টি-সঞ্জাত এই ধ্বংসশীল গলিত কাগজরাশি মহাকালের সহিত আর কত দিনই বা যুঝিতে সক্ষম হইবে, বলুন?

বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধারে ব্রতী হইয়া প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য গুলির মুদ্রণ ও প্রকাশে হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন। 'সাহিত্য-সভার' ও এবিষয়ে লক্ষ্য আছে বটে, কিন্তু উহার কার্য্য অদ্যাপি তেমন কিছুই হয় নাই। উক্ত সমিতিদ্বয় ভিন্ন ব্যক্তিগত চেষ্টাতেও অধুনা কোথাও বা ২।১ খানা প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতে দেখা যাইতেছে। এসমস্তই দেখিতে ও শুনিতে আনন্দজনক, সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রাচীন-সাহিত্যের বিপুলত্বের সহিত উক্ত কার্য্যাবলীর তুলনা করিলে আমাদের এই সকল চেষ্টা কিছুই নহে বলিলেই চলে! বর্ত্তমানে যে ভাবে ও যে পরিমাণে কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে এই নিত্য-বর্দ্ধমান-কলেবর প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার হইতে বহু—বহুকালের প্রয়োজন হইবে। তবে সেই অনাগত 'বহু' কালের সংঘাত ইতি মধ্যেই জর্জ্জরিত-দেহ সাহিত্যের গায়ে সহ্য হইবে কি না, আগে আমাদের তাহাই বিবেচ্য বটে! বিশেষতঃ 'সাহিত্য-পরিষৎ' প্রভৃতির লক্ষ্য বড় বড় কাব্যাদির প্রকাশের দিকেই বেশী দেখা যাইতেছে। কিন্তু

প্রাচীন সাহিত্যের বিপুলতার মধ্যে এমন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য বা সন্দর্ভ-মালা বর্ত্তমান আছে, যাহাদের স্বতন্ত্র প্রকাশ অসম্ভব না হইলেও কোন ক্রমেই সুবিধাজনক নহে। ইতিহাসের খাতিরে প্রাচীন সাহিত্যের সর্ব্বাংশ অবিকৃত রাখা দরকার; সুতরাং ঐ গুলি আকারে বা গুণে ক্ষুদ্র ও নগণ্য বলিয়া কিছুতেই উপেক্ষণীয় নহে। এই অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত?

এখন বঙ্গদেশে অসংখ্য সাময়িক পত্র উদ্ভূত ও পরিচালিত হইতেছে। দেশে প্রাচীন সাহিত্যের পাঠক ও লেখকও এখন নিতান্ত বিরল নহেন। আমরা বলি, এই সকল পত্র বা পত্রিকায় প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার-কল্পে আয়োজন হউক,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্যাদি তাহাতে প্রকাশিত হউক। এরূপ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে কষ্ট কিছুই নাই, অথচ তাহাতে সহজেই কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ আমাদের এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নশীল হইলে তাঁহাদেরই মনোগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুবিধা হইবে। সাহিত্য-প্রেমের খাতিরে সম্পাদক মহোদয়গণ একটু কৃপা দৃষ্টির ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবেন, বোধ হয় না।

বক্ষ্যমাণ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই অদ্য আমরা 'পূর্ণিমার' ভাস্বর আলোকে একটি প্রাচীন বিলুপ্তপ্রায় সন্দর্ভ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধারের কার্য্য অতীব কঠিন। একাধিক পাণ্ডু-লিপির সহায়তা না পাইলে তাহাতে কিছুই প্রমাদ-শূন্য করিয়া প্রচারিত করা যায় না। আমাদের প্রবন্ধ-মধ্যে ভ্রমপ্রমাদ যদি কিছু পরিদৃষ্ট হয়, তাহা উক্ত কারণেই হইবে। আর একটি কথা, প্রাচীন সাহিত্যে বর্ণ-বিন্যাস-পদ্ধতি আধুনিক কালের রীতি মত ছিল না; সেই জন্য উহার বর্ণ-বিন্যাস-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সমীচীন হয় না। প্রবন্ধ মধ্যে আমরা অনেক স্থলে এই কথাই মনে রাখিয়া চলিয়াছি, দেখা যাইবে।

একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি। আমরা যাহা যাহা প্রকাশ করিতে যাইতেছি, তাহার সকলগুলি কাব্য-সৌন্দর্য্য-হিসাবে প্রকাশ-যোগ্য না হইতেও পারে, কিন্তু তবুও তাহাদের প্রকাশোপযোগিতা যথেষ্ট আছে, আশা করি আমাদের এই কথায় কেহ ভিন্নমত হইবেন না। প্রাচীন কীর্ত্তি, যেরূপই হউক, কোনরূপে সুরক্ষিত হইলেই সমস্ত শ্রম সফল হইল, বোধ করিয়া থাকি। তবে এখন আমাদের বক্ষ্যমাণ সন্দর্ভের কথাই বলি।

প্রাচীন সাহিত্য-কীর্ত্তি।

বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যের ভূয়িষ্টাংশ চিরদিনের মত বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হইয়া গেলেও এখনো ইহার যে অংশ অবশিষ্ট আছে, তাহার বিরাটত্ব দেখিলেও বিস্ময়ে হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে। কিন্তু অমুদ্রিত ও প্রাচীন তুলোট কাগজে সন্নিবদ্ধ থাকিয়া এই সাহিত্যাংশ ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় বটে! এখন প্রাচীন সাহিত্য-কীর্ত্তি অনেক সংগৃহীত হইয়াছে সত্য কিন্তু কেবল তাহার সংগ্রহ মাত্র করিয়াই কোন মাতৃভাষানুরাগী ব্যক্তি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। ধ্বংসের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করিয়া যাহা আজও বাঁচিয়া আছে, তাহার একটা সদ্গতি করা যে নিতান্তই আবশ্যক, একথা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। মুদ্রা-যন্ত্র-সাহায্যে ইহার স্থায়িত্ব-বিধান করিতে না পারিলে আমাদের সমস্ত শ্রমই বিফল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সামান্য তৃণ-সমষ্টি-সঞ্জাত এই ধ্বংসশীল গলিত কাগজরাশি মহাকালের সহিত আর কত দিনই বা যুঝিতে সক্ষম হইবে, বলুন?

বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধারে ব্রতী হইয়া প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যগুলির মুদ্রণ ও প্রকাশে হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন। 'সাহিত্য-সভার' ও এবিষয়ে লক্ষ্য আছে বটে, কিন্তু উহার কার্য্য অদ্যাপি তেমন কিছুই হয় নাই। উক্ত সমিতিদ্বয় ভিন্ন ব্যক্তিগত চেষ্টাতেও অধুনা কোথাও বা ২।১ খানা প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতে দেখা যাইতেছে। এসমস্তই দেখিতে ও শুনিতে আনন্দজনক, সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রাচীন-সাহিত্যের বিপুলত্বের সহিত উক্ত কার্য্যাবলীর তুলনা করিলে আমাদের এই সকল চেষ্টা কিছুই নহে বলিলেই চলে! বর্ত্তমানে যে ভাবে ও যে পরিমাণে কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে এই নিত্য-বর্দ্ধমান-কলেবর প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার হইতে বহু—বহুকালের প্রয়োজন হইবে। তবে সেই অনাগত 'বহু' কালের সংঘাত ইতি মধ্যেই জর্জ্জরিত-দেহ সাহিত্যের গায়ে সহ্য হইবে কি না, আগে আমাদের তাহাই বিবেচ্য বটে! বিশেষতঃ 'সাহিত্য-পরিষৎ' প্রভৃতির লক্ষ্য বড় বড় কাব্যাদির প্রকাশের দিকেই বেশী দেখা যাইতেছে। কিন্তু

প্রাচীন সাহিত্যের বিপুলতার মধ্যে এমন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য বা সন্দর্ভ-মালা বর্ত্তমান আছে, যাহাদের স্বতন্ত্র প্রকাশ অসম্ভব না হইলেও কোন ক্রমেই সুবিধাজনক নহে। ইতিহাসের খাতিরে প্রাচীন সাহিত্যের সর্ব্বাংশ অবিকৃত রাখা দরকার; সুতরাং ঐ গুলি আকারে বা গুণে ক্ষুদ্র ও নগণ্য বলিয়া কিছুতেই উপেক্ষণীয় নহে। এই অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত?

এখন বঙ্গদেশে অসংখ্য সাময়িক পত্র উদ্ভূত ও পরিচালিত হইতেছে। দেশে প্রাচীন সাহিত্যের পাঠক ও লেখকও এখন নিতান্ত বিরল নহেন। আমরা বলি, এই সকল পত্র বা পত্রিকায় প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার-কল্পে আয়োজন হউক,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্যাদি তাহাতে প্রকাশিত হউক। এরূপ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে কষ্ট কিছুই নাই, অথচ তাহাতে সহজেই কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ আমাদের এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নশীল হইলে তাঁহাদেরই মনোগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুবিধা হইবে! সাহিত্য-প্রেমের খাতিরে সম্পাদক মহোদয়গণ একটু কৃপা দৃষ্টির ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবেন, বোধ হয় না।

বক্ষ্যমাণ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই অদ্য আমরা 'পূর্ণিমার' ভাস্বর আলোকে একটি প্রাচীন বিলুপ্তপ্রায় সন্দর্ভ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধারের কার্য্য অতীব কঠিন। একাধিক পাণ্ডু-লিপির সহায়তা না পাইলে তাহাতে কিছুই প্রমাদ-শূন্য করিয়া প্রচারিত করা যায় না। আমাদের প্রবন্ধ-মধ্যে ভ্রমপ্রমাদ যদি কিছু পরিদৃষ্ট হয়, তাহা উক্ত কারণেই হইবে। আর একটি কথা, প্রাচীন সাহিত্যে বর্ণ-বিন্যাস-পদ্ধতি আধুনিক কালের রীতি মত ছিল না; সেই জন্য উহার বর্ণ-বিন্যাস-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সমীচীন হয় না। প্রবন্ধ মধ্যে আমরা অনেক স্থলে এই কথাই মনে রাখিয়া চলিয়াছি, দেখা যাইবে।

একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি। আমরা যাহা যাহা প্রকাশ করিতে যাইতেছি, তাহার সকলগুলি কাব্য-সৌন্দর্য্য-হিসাবে প্রকাশ-যোগ্য না হইতেও পারে, কিন্তু তবুও তাহাদের প্রকাশোপযোগিতা যথেষ্ট আছে, আশা করি আমাদের এই কথায় কেহ ভিন্নমত হইবেন না। প্রাচীন কীর্ত্তি, যেরূপই হউক, কোনরূপে সুরক্ষিত হইলেই সমস্ত শ্রম সফল হইল, বোধ করিয়া থাকি। তবে এখন আমাদের বক্ষ্যমাণ সন্দর্ভের কথাই বলি।

১। রাধিকার বারমাস।*

এই সুন্দর সন্দর্ভটি বলরাম দাস নামক কবির রচিত। বৈষ্ণব-সাহিত্যে উক্ত নামধেয় কবি একাধিক আছেন। তাঁহাদিগের হইতে এই কবি অভিন্ন কি ভিন্ন ব্যক্তি, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে তিনি যিনিই হউন না কেন, তিনি যে সুকবি ছিলেন, এই ক্ষুদ্র সন্দর্ভেই তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা পাঠে সকলেই মুগ্ধ হইবেন, এরূপ আশা আমাদের আছে।

ইহার যে দুইখানি প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে বিস্তর পাঠ-পার্থক্য বিদ্যমান আছে। বাঙ্গালা পুঁথিগুলির এ রহস্য বড়ই বিচিত্র। কিরূপে যে এমন হইল, বুঝা দুষ্কর। পাদ-টীকায় পাঠান্তর সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়া আমরা উভয় হস্তলিপির পাঠ-পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম। তাহা হইতে পাঠকগণ সেকালের নকলনবিশগণের অসতর্কতার এবং আসল-খাস্ত-করণ পটুতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইবেন।

প্রাচীন সাহিত্যের অনুসৃত নানা ছন্দের মধ্যে এই বারমাস্যার ছন্দটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বটে। এই ছন্দে নরোত্তম ঠাকুরের 'রাধিকার মানভঙ্গ', বাসুদেব ঘোষের 'গৌরাঙ্গ চরিত' এবং একজন অজ্ঞাতনামা কবির 'নিমাইর সন্ন্যাস-পটি'ও লিখিত হইয়াছে। বাস্তবিক ছন্দটি অতীব মনোরম। এমন সুন্দর ছন্দের অনুসরণ অধুনা করা হয় না কেন?

রচনার সৌন্দর্য্য বুঝাইবার জিনিষ নহে,—অনুভবেরই জিনিষ বটে। নিম্নে আমরা বারমাস্যাটি প্রকাশিত করিলাম। পাঠকগণ আপনারাই তাহার রসাস্বাদন করুন।——

আগে মুগধমতি আসিল অক্রুর।
কৃষ্ণ হেন প্রাণনাথ নিল মধুপুর ॥১॥
হিম হিম বায়ু করে সহন না জাএ।
দারুণ মদন বাণে প্রাণি দহি জাএ ॥ধুআ।

অক্রুর সনে কি বাদ ছিল।
গুণের মাধব হর‍্যা নিল ॥ ১। (২)
ফাল্গুনে ফাগুর দোল ফুলের বৃন্দাবন।
ফাগু বেষ্টিত হইল জথ গোপীগণ ॥ (৩)

* 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার' ৯ম ভাগের অতিরিক্ত সংখ্যায় ইহা একবার খণ্ডিতাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। (৯নং পুঁথি দেখুন।)

১। প্রাণনাথ কৃষ্ণ লই গেল মধুপুর। পাঠান্তর।
২। প্রাণের মাধব মোর হরিয়া নিল। ,,
৩। ফাল্গুণে দ্বিগুণ শীত বসন্তের বাও। ,,
সহন না জায় সখি কোকিলার রাও ॥ ,,

কৃষ্ণে কোলে করি গোপী তোল এ বিমানে।
বিমানে তুলিয়া কৃষ্ণ হরে(?) গোপীগণে ॥ধু (৪)
কৈওরে (৫) মাধবের ঠাই।
হুলি খেলা শ্যামের মনে নাই ॥২।
চৈত্রে চাতকপক্ষী ডাকে প্রিয়া প্রিয়া।
বিধাতা বঞ্চিত কৈল হাতে নিধি দিয়া ॥
পলাশ কাঞ্চন জথ বিকাশ (নানা) কুল।
আর নি প্রাণকৃষ্ণ আসিব গোকুল ॥ ধু। (৬)
আমারে ছাড়িল শ্যাম।
কে লবে শ্রীরাধার নাম ॥৩। (৭)
বৈশাখ মাসেতে সখি প্রচণ্ড তপন।
হেন হি সময়ে সখি শূন্য বৃন্দাবন ॥ (৮)
ভ্রমরা উড়িয়া পড়ে (৯) মধু করে পান।
শ্রীনন্দের নন্দন বিনে দগধে পরাণ ॥ ধু। (১০)
যে আমার সুহৃদ হওয়ে (হয়রে?)।
গুণের মাধব হর‍্যা নিলে ॥ ৪। (১১)

জ্যৈষ্ঠে নিঠুর ভানু হানিলসভায়।
দারুণ মদনবাণে প্রাণি দহি যায় ॥ (১২)
তাহাতে বিষম সখি মদন ধন্য (১৩) বীরবর।
প্রাণনাথ বিনে মোর শূন্য হইল ঘর ॥] ধু।
তার সখী পদ্মভানু। (?)
তেমনি রাধার তনু ॥ ৫। (১৪)
আষাঢ় মাসেত সখি ঘোর (১৫) গর্জ্জন (গরজন)।
শুনিয়া বিদরে বুক স্থির নহে মন ॥ (১৬)
তাহাতে বিষম সখি ধন্য বীরবর।
প্রাণনাথ বিনে মোর দগধে অন্তর ॥ ধু।(১৭)
যেমন কংসারীয়ে কাঁসা পিটে।
তেমনি রাধার (১৮) অন্তর ফাটে ॥৬।
শ্রাবণে সঘন ঘন বরিষএ বারি।
শয়নে স্বপনে মনে পড়এ মুরারি ॥ (১৯)
তাহাতে বিষম সখি মদন প্রবল (২০)।

(৪)। প্রাণ যায় রসাতল বকুল পরে ডালে।
শ্রীনন্দের নন্দন কৃষ্ণ পাব কোথা গেলে ॥ পাঠান্তর
(৫)। 'কৈওরে' স্থলে 'কহিও'। ,,
(৬)। পলাশ কাঞ্চন বিকাশিত নানাকূল।
আর নি প্রাণের নাথ রে আসিব গোকুল ॥ পাঠান্তর।
(৭)। আমা ছাড়ি গেল শ্যাম।
কে লইব রাধার নাম ॥ ,,
(৮)। হেন হি সময়ে কৃষ্ণ নাহি বৃন্দাবন। ,,
(৯)। 'পড়ে' স্থলে 'কুলে'। ,,
(১০)। 'দগধে' স্থলে 'না রহে'। ,,
(১১)। তোমরা কহ কৃষ্ণ কথা।
জুড়ালক রাই অন্তর বেথা ॥
(১২)। জ্যৈষ্ঠে নিষ্ঠুর ভানু অনলের প্রায়।
নিদাঘে বিরহ হিয়া সহন না জাএ ॥ পাঠান্তর।
(১৩)। সম্ভবতঃ 'ধন্য' শব্দটি হইত না।
(১৪)। দারুণ মলয়ার বাও।
না জুড়াএ শ্রীরাধার গাও ॥ পাঠান্তর।
(১৫)। 'ঘোর' স্থলে 'মেঘের'। ,,
(১৬)। শুনিয়া বিদরে হিয়া সা জাএ সহন। ,,
(১৭)। তাহাতে বিষম সখি বিরহ আনল
প্রাণনাথ বিনে আমি কারে দিমু কোল ॥ ,,
(১৮)। 'রাধার' স্থলে 'রাইর'। ,,
(১৯)। শ্রাবণ মাসেত ঘন বরিষএ বারি।
শয়নে স্বপনে মুই দেখিলুম মুরারি ॥ পাঠান্তর।
(২০)। 'মদন প্রবল' স্থলে 'ধন্য বিহ্বল' (?)। ,,

* * * * * (২১)॥ধু।
কৈঅরে মাধবের আগে ।
রাই দরশন মাগে ॥ ৭ । (২২)
ভাদ্র মাসেত হইল (২৩) তিমির রজনী ।
কৃষ্ণ শুক্ল দুই পক্ষ একহি যামিনী ॥ (২৪)
ডাউকের কলরবে প্রাণি জর জর ।
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে প্রাণ সদাএ কাকর ॥ ধু। (২৫)
কৈঅরে মাধবের আগে ।
রাধে মৈলে বধ লাগে ॥ ৮ । (২৬)
আশ্বিন মাসেতে হইল সরত সময় ।
নির্ম্মল গগনে হৈল চন্দ্রের উদয় ॥ (২৭)
তাহাতে বিষম সখি কোকিলার রাও ।
আনল সমান বহে মলয়ার বাও ॥ ধু। (২৮)
দারুণ মলয়ার বাও ।
না যুড়ায় রাধার গাও ॥ ৯ । (২৯)
কার্ত্তিক মাসেত হইল নবীন তামসী ।
সেই হোতে তারাগণ প্রকাশিত শশী ॥ (৩০)
[বলরাম দাসে (কহে) শুন বিনোদিনি ।
প্রেমেতে থাকিলে তুমি পাইবা বিনোদিনি
(নীলমণি ?)] ধু।
তারা সবে বেহার করিলেক শ্রীবৃন্দাবন ।
হেন হি সময়ে সখি শূন্য বৃন্দাবন ॥ ধু। (৩১)
কৈঅরে মাধবের ঠাঁই ।
রাসলীলা শ্যামের মনে নাই ॥ ১০। (৩২)
অগ্রা'ণ মাসেত সখি মূতন (৩৩) সকল ।
তাহাতে বিষম সখি সদাএ চঞ্চল ॥ (৩৪)
প্রাণ যায় রসাতল বকুল পরে ডালে ।
শ্রীনন্দের নন্দন কৃষ্ণ পাবো কথা (কোথা)
গেলে ॥ ধু। (৩৫)
হেদে গো ললিতা সখি ।
অন্তরে গোবিন্দ দেখি ॥ ১১ । (৩৬)
পোউষে প্রবল শীত প্রভু নাহি ঘরে ।
রহিআছে মনের দুঃখ কহিমু কাহারে ॥ (৩৭)
এমন ভাগ্য কোবে (কবে) হবে ।
ব্রজনাথের দয়া হবে ॥ (৩৮)

(২১) । প্রাণনাথ বিনে কেবা করিব শীতল । ,,
(২২) । কহিও বন্ধের (বন্ধুর) ঠাই ।
বিরহিনী শ্যামের মনে নাই ॥
(২৩) । 'হইল' স্থলে 'সখি' । ,,
(২৪) । কৃষ্ণ শুক্ল পক্ষ দুই একহি না জানি । ,,
(২৫) । কোকিলের কলরবে প্রাণ মোর ঝুরে ।
প্রাণনাথ কৃষ্ণ বিনে দগধে অন্তরে ॥ ,,
(২৬) । তার আখির পরে দুই ভানু । (?)
তেমত হইল রাধার তনু ॥ ,'
(২৭) । আশ্বিন মাসেত সখি নির্ম্মল যে নিশি ।
সহিত যে তারাগণ প্রকাশিত শশী ॥
পাঠান্তর ।
(২৮) । হাস রস বেহার করিতে বৃন্দাবন ।
অখনে সে সব দুঃখ সহিব কেমন ॥ ,,
(২৯) । শ্যাম মধুপুরে রৈল ।
কাঁদি আমার জনম গেল ॥ ,,
(৩০) । কার্ত্তক মাসেত সখি শরত সময় ।
নির্ম্মল গগনে তারা চন্দ্রের উদয় ॥ ,,
(৩১) । শূন্য দেখি কদমতলা শূন্য বৃন্দাবন ।
রাধিকার মন্দির শূন্য শূন্য বৃন্দাবন ॥ ,,
(৩২) । কহিও কানুর আগে ।
রাই (দরশন) দান মাগে ॥ ,,
(৩৩) । 'নূতন' স্থলে 'নবীন' । পাঠান্তর ।
(৩৪) । প্রাণনাথ বিনে চিত্ত সদাএ বিকল । ,,
(৩৫) । শুন শুন প্রাণসখি মথুরাতে যাও ।
প্রাণনাথ কৃষ্ণ বিনে না যুড়ায় গাও ॥ ,,
(৩৬) । কহিঅ কানুর আগে ।
রাই দান মাগে ॥ ,,
(৩৭) । পোউষে প্রবল শীত বন্ধু নাই মোর ঘর ।
কানু গিয়াছে মোর দেশ দেশান্তর ॥ ,
(৩৮) । এমন দশা কবে হবে ।
ব্রজনাথ দরশন হবে ॥ ,,

"ইতি রাধিকার বারমাস সমাপ্তা । লিখন শ্রীফকির চাঁদ দেঅদাস ইতি সন ১২০১ মঘী ।"

[মুরারি—মধুর-ধ্বনি মাকর্ণ্য——কুল বালিকা ।
শ্রীকৃষ্ণপুরী বসন্তি পিঞ্জরে শুক শালিকা ॥* ধু ।
যেমন পিঞ্জরায় শালিকা ঘুরে ।
তেমনি রাইর অন্তর ঝুরে ॥] ৩৮

"ইতি সন ১১৮৩ মঘী তারিখ রোজ ১২ শ্রাবণ ।" লেখকের নাম নাই । হস্তলিপি নিতান্ত কদর্য্য । লিপিকরের দোষেই এমন সুন্দর জিনিষ যেন মাটী হইয়া গিয়াছে । বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, ইহাকে চট্টগ্রামী কীর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করিতে মনে সন্দেহ জন্মে ।

আবদুল করিম ।

মৃত্যুর পর ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাজযোগ কি যতদূর সংক্ষেপে পারি একরূপ বুঝাইলাম, যাঁহারা নিবিষ্ট চিত্তে যাজ্ঞবল্ক্য গীতা বা শিবসংহিতা কথিত সমাধি বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আর নূতন করিয়া রাজযোগ বুঝাইতে হইবে না । রাজযোগের চরম ফল সমাধি আর শেষ উদ্দেশ্য সমাধি মূলে ও সমাধি মুখে মৃত্যু । আমরা যোগ বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতে বসি নাই সুতরাং আরও বিস্তৃত বিবরণ দিবার

* ভূতপূর্ব্ব 'সুধার' সহ সম্পাদক দক্ষিণা বাবু এই সংস্কৃত শ্লোকটির এইরূপ পাঠ দিয়াছেন :—

"মধুর মুরলীরব মাকর্ণ্য কুলবালিকা ।
গৃহেষু পরিঘূর্ণন্তে পিঞ্জরে শারিকা ইব ॥"
'মধুর বাঁশরী ধ্বনি থর শ্রবণে শুনি,
কুলের বালিকা সদা হায় !
নারে বাহিরিতে লাজে, ঘুরে নিজ গৃহ মাঝে,
পিঞ্জরেতে শারিকার প্রায় ॥"

বন্ধনী মধ্যস্থ অংশগুলি দ্বিতীয় পুঁথিতে নাই ।

প্রয়োজন নাই। ব্যাপারটা কি গ্রন্থ পড়িয়া বুঝিয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়। শেষকালে কিন্তু গুরূপদেশ মতে কার্য্য করিতে হইবে নতুবা সমস্ত পণ্ড হইবে ও দেহ নানা রোগের আবাস ভূমি হইবে। পাঁজিতে অনেক আর্ড়া জলের কথা থাকে কিন্তু পাঁজি নিঙ্গড়াইলে এক ফোঁটা জলও পড়ে না। মূল কথা এই বাসনা সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম না হইলে যোগই হইবে না তা যোগ সিদ্ধি ত অতি দূরের কথা। তবে যাঁহারা কেতাব পড়িয়া আরও বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক হইবেন তাঁহারা যেন পাতঞ্জল যোগসূত্র পাঠ করেন। পাতঞ্জল: যোগসূত্রের সমাধি পাদ, সাধনপাদ বিভূতি পাদ, কৈবল্য পাদ পাঠ করিলে এই যোগ সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য সকল কথাই পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

আমরা পাতঞ্জল যোগসূত্র সমাধি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা এই খানে মোটামুটী ভাবে দেখিয়া লইব।

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ। ১অঃ ১০
বিরাম প্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ। ১৮
ভব-প্রত্যয়োবিদেহ প্রকৃতি-লয়ানাম। ১৯
শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতি সমাধিপ্রজ্ঞা পূর্ব্বক ইতরেষাম্। ২০
তীব্রসম্বেগানামাসন্নঃ। ২১
ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা। ২২

ইত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যা সহিত দৃষ্টি করিলেই পাঠক ব্যাপারটা কি বুঝিতে পারিবেন। সমাধি দুই প্রকারের। সম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান পূর্ব্বক সমাধি আর অসম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ জ্ঞানাতীত সমাধি অর্থাৎ যাহাতে সমুদয় মানসিক শক্তির বিরাম অভ্যাস হয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আবার চারি প্রকারের (১) সবিতর্ক (২) সবিপর (৩) সানন্দ (৪) অস্মিতা। এখন একটি একটির ব্যাখ্যা হৌক (১) সবিতর্ক সমাধি। বিতর্ক অর্থাৎ প্রশ্নের সহিত সমাধি। এই সমাধিতে মন কোন একটি বস্তুকে অপর বস্তুর সহিত পৃথক করিয়া চিন্তা করিতে থাকে। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র সংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত অর্থাৎ দেব পতঞ্জলি সাংখ্যদর্শনের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব যাহা প্রকৃতি তত্ত্ব বলিয়া পরিচিত ও পুরুষ মানিয়া লইয়াছেন। যাঁহারা বলেন কপিলমুনি ঈশ্বর মানিতেন না তাঁহারা বলেন সাংখ্য ও পাতঞ্জলে এই প্রভেদ যে সাংখ্য

ঈশ্বর মানেন না আর পাতঞ্জল ঈশ্বর মানেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে কপিল ঈশ্বর মানিতেন। যাঁহারা কপিলকে ঈশ্বরবাদী বলেন তাঁহাদের মতে সাংখ্য কথিত পথ জ্ঞানপথ আর পাতঞ্জল কথিত পথ যোগপথ উভয় পথেই ঈশ্বর পাওয়া যায়। সে যাহা হৌক পতঞ্জলি সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি প্রকৃতি তত্ত্ব মানিয়া লইয়াছেন ও পুরুষ মানিয়া লইয়াছেন ইহাই আমাদের এখন কথা। চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব জড় আর পুরুষ চেতন কি করিয়া মূল প্রকৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে পরিণত হইল তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি সে কথা পুনরুত্থাপনের প্রয়োজন নাই। জড় ভূতগণের উপর শক্তি ও জড়ের মিলিত একটা অবস্থা আছে তাহা অব্যক্ত ও সৃষ্টির আদি অবস্থা এই অবস্থারও পারে ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন। এখন মানুষকে এই ঈশ্বরে পঁহুছিতে হইলে এই সমস্ত সোপান অবলম্বন করিয়া যাইতে হইবে। মহত্তত্ত্ব হইতে জীব হইয়াছে জীবকে পিছাইয়া পিছাইয়া মহতত্ত্বে যাইতে হইবে অর্থাৎ আমি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বিশিষ্ট জীব কিন্তু বস্তুত আমি আত্মা জড়ের আবরণে রহিয়াছি, বাস্তবিক পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে,— আমাকে আমার স্বরূপ বুঝিতে হইবে। মনে করুন আমি প্রথমে গাঞ্জিফ্রক গায়ে দিয়াছি তার উপর কামিজ তার উপর ওয়েষ্ট কোট তার উপর কোট তার উপর অলষ্টার তার উপর শাল গায়ে দিয়াছি। আমি সম্পূর্ণ রূপে শাল মুড়ি দিয়াছি কেবল চক্ষু দুটী বাহির হইয়া আছে। আমার স্বরূপ যদি ইংরেজ ডাক্তারে জানিতে চান তাহা হইলে তিনি আমাকে সমস্ত কাপড় খুলিতে বলিবেন আমি একে একে শাল অলষ্টার প্রভৃতি খুলিয়া শেষে গাঞ্জিফ্রকটী খুলিয়া ডাক্তারকে ত আমার দেহ দেখাইব। সেইরূপ গাঞ্জিফ্রকের নীচে যে দেহ দেখিলেই তাহার ভিতর কি আছে জানিতে হইলে দেহটিকে খুলিতে হইবে জড় হইতে চৈতন্যে যাইতে হইবে। সে উপায় কি? চিন্তা করিতে হইবে যে আমি হাত নাই পা নাই চক্ষু নাই কর্ণ নাই আবার দৃষ্টি শক্তি নাই শ্রবণ শক্তি নাই ইত্যাদি এমনি করিয়া পিছাইয়া শেষে সেই চৈতন্যময়পুরুষে উপস্থিত হইতে হইবে। অহঙ্কার সংকল্প সম ইহার সকলই একভিত্তি হইতে প্রকাশিত তাহাকে চিত্ত বলে। চিত্ত প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তিগুলিকে গ্রহণ করে ও তাহাদিগকে চিন্তারূপে পরিণত করে। জড় প্রকৃতি হইতে চৈতন্যে যাইবার এই চিন্তাই উপায়। চক্ষু কি দেখে না মস্তিষ্কস্থ চেতনে

দৃষ্টিজ্ঞান সঞ্চার করে? সেই রূপ শ্রবণশক্তির স্পর্শশক্তির ঘ্রাণশক্তির মূলে এক মস্তিষ্কস্থ চেতন সুতরাং অভ্যাস ক্রমে আমরা চক্ষু বুজিয়া মস্তিষ্কে দেখিতে পারি। চক্ষু বুজিয়া মনে কি প্রিয়তমার মুখ দেখি না? হেরিলে শারদ শশী মনে পড়ে প্রিয়সীরে কেবল কবিরই কথা নয়। যাহা হৌক আমরা ভূতের ধ্যানদ্বারা এবং শক্তির ধ্যান দ্বারা তাহাদিগের শক্তিগুলি লইতে পারি। চিন্তা দ্বারা তাহাদের স্বরূপ জ্ঞান হইলেই সেই গুলি আমাদের আয়ত্ত হইল ও বশীভূত হইল। যাহার পূর্ণ জ্ঞান আমার হইল সে ত আমার অধীন হইল আমার ক্ষমতার অন্তর্গত হইল। এখন সবিতর্ক সমাধি কি? না যাহাতে সাধক বা যোগী বাহ্যিক স্থূল ভূতগুলি ধ্যান করেন এই ধ্যানে ভূতগুলিকে প্রশ্ন করিতে হয় তুমি কে, স্বরূপ কি, তোমার কি শক্তি? এই রূপে প্রশ্ন করিয়া ধ্যান করিলে উক্ত ভূতগুলি তাহাদের অস্তিত্বের রহস্য যোগীকে জানাইয়া দেয় ও তাহাদের শক্তিগুলিও প্রদান করেন আবার প্রথম প্রকারের ধ্যান অভ্যস্ত হইলে ঐ ভূতগুলিকে দেশকাল পাত্র হইতে পৃথক করিয়া চিন্তা করিতে হয় তখন তাহাকে নির্ব্বিতর্ক সমাধি বলে। যখন যোগী এই ধ্যানে আর এক পদ অগ্রসর হইবেন তখন ভূতগণের তন্মাত্রগুলি দেশকাল পাত্র সহিত ধ্যান করিবেন তখন সমাধির নাম (২) সবিচার সমাধি আবার এরূপ তন্মাত্রগুল্লির চিন্তায় যখন দেশকাল পাত্র চিন্তা রহিত হইবে কেবল মাত্র তন্মাত্র সূক্ষ্ম ভূত-গুলির চিন্তা হইবে তখন তাহা নির্ব্বিপর সমাধি হইবে। তারপর যোগী আর এক পদ অগ্রসর হইবেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় চিন্তা ছাড়িয়া ইন্দ্রিয়ের শক্তি চিন্তা ছাড়িয়া যাহা দ্বারা উহাদিগের চিন্তা করা যায় সেই অন্তঃকরণেরই ধ্যান করিবেন। সত্ত্ব রজ তম এই তিনটি গুণ আছে অন্তঃকরণকে রজ ও তম হইতে পৃথক করিয়া চিন্তা করিতে হইবে। তখন সমাধির নাম হইবে (৩) সানন্দ সমাধি। এই সানন্দ সমাধিতে সাধক যখন অন্তঃকরণকে সমুদয় উপাধি শূন্য করিয়া ধ্যান করিতে সক্ষম হইবেন, যখন এ পরিপক্ক ধ্যানে মন কি এই ধ্যানই ধ্যান মাত্র ও যখন কেবল মাত্র মনের সাত্ত্বিক অহঙ্কারটুকু বিদ্যমান থাকে তখন সেই সমাধির নাম হইবে (৪) অস্মিতা। এই অবস্থার সাধককে বিদেহ বলে। "বিদেহ" শব্দ বেদ ব্যবহার করিয়াছেন জনক রাজা বিদেহ বলিয়া খ্যাত। সাধক এই অবস্থায় উপনীত হইলে আমার স্থূল দেহ নাই আমি কেবল মাত্র সূক্ষ্ম দেহধারী এই রূপ বোধ করেন। তখন

তিনি যখন ইচ্ছা দেহ হইতে বাহির হইয়া ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে সমর্থ হন এবং পুনরায় দেহের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারেন। ইনি ইচ্ছা করিলে আপনার স্থূল দেহকে লইয়াই এক মূহুর্ত্তে লাহোরে পর মূহুর্ত্তে কলিকাতায় উপস্থিত হইতে পারেন। তখন তিনি দেবতা যাঁহারা এই অবস্থাতেও সেই বিষ্ণুর চরণপদ লাভ করিতে পারেন না এবং লয় হন তাহাদিগকে প্রকৃতি লয় বলে। কিন্তু ইহাতেও মুক্তি হইল না পাঠক ইহা অবশ্য অবশ্য স্মরণ রাখিবেন। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এই পর্য্যন্ত তারপর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে সাধক পূর্ব্ব মানসিক ক্রিয়ার বিরাম অভ্যাস করেন কিন্তু ইহাতেও চিত্তের গূঢ় সংস্কারগুলি একবারে নষ্ট হয় না। কিন্তু সাধক এই সমাধির পর মুক্তি লাভ করিতে পারেন। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরও পতন আছে কিন্তু এই সমাধির পর আর পতন নাই। এই ধ্যানে মন ধ্যানের বিষয়ীভূত বটে কিন্তু সে মন শূন্য হওয়া চাই তাহাতে কোন প্রকার চিন্তার লেশমাত্র থাকিবে না। ইহা জ্ঞানাতীত অবস্থা। যতক্ষণ জীবের সংস্কার থাকে ততক্ষণ সেই জীব হইতে পুন পুন জন্মমৃত্যু ঘটিয়া থাকে কিন্তু এই সমাধিতে সমস্ত সংস্কার এমন কি মন পর্য্যন্ত ধ্বংস হইয়া যায়। এইরূপ সমাধি হইতেই সাধকের ২১ দিন পরে মৃত্যু হইয়া থাকে। সেই জন্যই ১৯ শ্লোকে পতঞ্জলি বলিয়াছেন ভব-প্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্ অর্থাৎ সমাধি যদি সম্যক প্রকারে বৈরাগ্য সহকারে অনুষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে তাহা দেবতা ও প্রকৃতি লীন পুরুষদিগের আবার উৎপত্তির কারণ স্বরূপ হয়। ইহা দ্বারা ইহাও সচিত্ত হইতেছে যে এই মানবই একদিন দেবতা হইতে পারেন কেননা কি দেবতা কি প্রকৃতি লীনপুরুষ ইহাঁরা কেহই পূর্ণতা প্রাপ্ত হন নাই, উন্নতির এক দেশে পঁহুছিয়াছেন মাত্র সেখানে তুমি ও আমিও যাইতে অধিকারী তবে উপযুক্ত সাধন চাই। দেবতাদিগেরও পুনরুৎপত্তির ভয় থাকে যদি তাঁহাদিগের সমাধিও সম্যক্‌প্রকারে সংসাধিত না হয় কিন্তু পাত-ঞ্জলির মতে, অন্য প্রকারেও সমাধি হইয়া থাকে। সেগুলি কি কি? না, কাহারও কাহারও শ্রদ্ধা (বিশ্বাস) বীর্য্য (তেজ বা মনের তেজ) স্মৃতি সমাধি (একাগ্রতা) এবং সত্যবস্তুর বিবেক হইতেও সমাধির উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ এইরূপ ভাবে যাঁহাদিগের সমাধি হয় তাঁহারা দেবতাই থাকেন বা কল্পের ঈশ্বর হন তাঁহারা মুক্তিলাভই করেন। যাঁহারা অত্যন্ত উদ্যমশীল

ও উৎসাহী তাঁহারা যোগে আশু ফল প্রাপ্ত হন। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দ্বারা ও সমাধি লাভ হইয়া থাকে (২০ শ্লোক)।

এই সকল কথা বলিয়া পতঞ্জলি দেব ঈশ্বর কি তাহা বুঝাইয়া দেন—"ক্লেশ কর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।" ঈশ্বর কি? না, তিনি এক বিশেষ পুরুষ তিনি দুঃখ কর্ম্মফল বা বাসনা দ্বারা অস্পৃষ্ট তিনিই সকলের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা। তারপর বলিতেছেন "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজম্" অপরে যে সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ আছে ঈশ্বরে তাহা নিরতিশয় অর্থাৎ অনন্ত। স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেন নবচ্ছেদাৎ। ২৬। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুদিগেরও গুরু কেননা কাল দ্বারা তিনি সীমাবদ্ধ নন।"

তস্যবাচকঃ প্রণবঃ। ২৭। প্রণব অর্থাৎ ওঁকার তাঁহার বাচক, অর্থাৎ ওঁকার দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপতা প্রকাশ পায়।

তজ্জপ স্তদর্থভাবনম্। ২৮। এই ওঁকারের পুনঃ পুনঃ জপ ও তাহার অর্থ চিন্তা বা ধ্যানই সমাধি লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

যোগীদিগের যে সকল অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মে পাতঞ্জলি দেব তাহা উল্লেখ করিয়াছেন আমরা কেবলমাত্র পাঠকের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য একটি মাত্র উদ্ধৃত করিব। "বন্ধকারণ শৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদানচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ,,' ৩য় অ—৩৯ এই শ্লোক দ্বারা এই বলা হইতেছে যে যোগীর যখন বন্ধের কারণ শিথিল হইয়া যায় আর যোগী যখন শরীরস্থ নাড়ীজ্ঞান প্রযুক্ত চিত্তের স্থান অবগত হন তখন তিনি পরকায়া প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। তিনি ইচ্ছা করিলে মৃত দেহেও প্রবেশ করিতে পারেন ইচ্ছা করিলে জীবিত দেহেও প্রবেশ করিতে পারেন।

যাঁহারা ভূতশুদ্ধি কি জানেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে ভূতশুদ্ধি একটী যোগের ক্রিয়া মাত্র। যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে ভূত-শুদ্ধি করিতে পারেন তাঁহাকে আর যোগ করিতে হইবে না তাঁহার যোগসিদ্ধি ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান-কালে যে সকল দশকর্ম্মান্বিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ পূজাদি ক্রিয়া করিয়া বা করাইয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন যে ভূতশুদ্ধি করিতে জানেন না ও পারেন না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। ভক্তসাধক রামপ্রসাদ সেন মহাশয় প্রকারান্তরে বলিয়া গিয়াছেন যে যদি জগদম্বার আবির্ভাব চক্ষে দেখিতে পাও তবে ন্যাস ধররে মন্ত্র গোঁড়া। ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ হেলে

(প্রসাদী সুর—একতালা।)

ডুব দে মন কালী বলে,
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে,
রত্নাকর নয় শূন্য কখন,
দু চার ডুবে ধন না পেলে ;—
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও
কুলকুণ্ডলিনীর কুলে,
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন,
শক্তিরূপা মুক্তা ফলে ;—
তুমি ভক্তি করে কুড়িয়ে পাবে,
শিবের যুক্তি মতন নিলে ॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে,
(তারা) আহার লোভে সদাই চলে ;—
তুমি বিবেক হল্‌দি গায় মেখে যাও,
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।
রতন মাণিক্য কত,
পড়ে আছে সেই জলে ;—
রামপ্রসাদ বলে ঝাঁপ দিলে মন
মিল্‌বে রতন ফলে ফলে ॥

শুধু যে দেব রামপ্রসাদ ভাবের ভরে আবেগ ভরে যোগের গুণ গাহিয়াছেন, যোগের কৃতীত্ব স্বীকার করিয়াছেন তাহা নহে, হিন্দুশাস্ত্রের অপর অপর শাখায় সুধীগণ জ্ঞানীগণ মুনি ঋষিগণ যোগ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ব্যাসসূত্র চতুর্থ অধ্যায় প্রথমপাদ ৭,৮,৯,১০,১১ শ্লোক। সাংখ্যপ্রবচন সূত্র তৃতীয় অধ্যায় ২৯,৩০,৩১,৩২,৩৩,৩৪,৩৫,৩৬ ; চতুর্থ অধ্যায় ৩,৫,৬,৮,৯,১০, ১৩,১৪,১৫,১৯,২০,২৪,২৬ ; পঞ্চম অধ্যায় ১২৮ ; ষষ্ঠ অধ্যায় ২৪ ; শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ দ্বিতীয় অধ্যায় ৬,৭,৮,৯,১০,১১,১২,১৩,১৪ শ্লোক

নীহারধূমার্কানিলানলানাং
খদ্যোতবিদ্যুৎ স্ফটিক শশিনাং।

এতানি রূপানি পুরঃসরাণি
ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে॥

যোগ-সাধকের ধ্যানে নীহার ধূম, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, খদ্যোৎ, বিদ্যুৎ, স্ফটিক, চন্দ্র এই রূপগুলি সম্মুখে আসে ও যোগে ক্রমশ ব্রহ্মকে অভিব্যক্ত করে। আর সর্ব্বশেষ শ্রুতি বলিয়াছেন দেহকে ধনুক করিয়া ওঁকার মন্ত্রকে শর করিয়া ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যভেদ করিতে হয়। আমরা বলি না হয় পরের মুখে ঝাল খাইয়া কাজ নাই একবার স্বয়ং করিয়া দেখুন যোগ সত্য কি মিথ্যা। হায়রে কাল তোর কি কুটিল গতি ভারতেও আজ এ কথা লিখিতে হইল। সমাধির প্রমাণ আমরা পৃথিবীর অপর কোন জাতির সাহিত্য বা দর্শন বা ইতিহাস হইতে পাই না। পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি মোক্ষমূলর বলিয়াছেন—সমাধিটা যে কি তাহা আমরা বুঝি না। তবে ইংরেজী সাহিত্য আলোচনা করিয়া আমরা যতটা বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সমাধি হইতে বড় অধিক দূরে ছিলেন না। তাঁহার কাব্যের এক স্থানে আমরা এইটুকু পাইয়াছি—

"He beheld the sun.
Rise up, and bathe the world in light! He looked,
Ocean and earth, the solid frame of earth
And ocean's liquid mass, in gladness lay
Beneath him—Far and wide the clouds were touched,
And in their silent faces could he read
Unutterable love. Sound needed none,
Nor any voice of joy; his spirit drank
The spectacle: sensation, sound, and form,
All melted into him; they swallowed up
His animal being; in them did he live,
And by them did he live; they were his life.
In such access of mind, in such high hour of visitation from the
living God,
Thought was not; in enjoyment it expired.
No thanks he breathed, he proffered no request;
Rapt into still communion that transcends
The imperfect offices of prayer and praise,
His mind was a thanksgiving to the power
That made him; it was blessedness and love.

ইহার মর্ম্ম এই যে, ভ্রমণকারী ভাবুক প্রভাতে তরুণ অরুণোদয় দেখিলেন, দেখিলেন সূর্য্যকিরণ স্নাত মেদিনী, বাল তপনাংশু লাঞ্ছিত মহাসাগরের আনন্দ বিক্ষোভিত অর্ণবরাশি, ভানু কিরণ পটল রঞ্জিত দূর সুদূর দিগন্ত বিস্তারিত মেঘ কদম্ব অনুভবে বুঝিলেন নিসর্গসুন্দরীর অনির্ব্বচনীয় উচ্ছ্বসিত প্রেম; তিনি নির্ব্বাক হইলেন তাঁহার অন্তরাত্মা প্রবৃত্তির অন্তরাত্মার সহিত মিলিয়া গলিয়া এক হইয়া গেল ভগবৎ-প্রেমে তিনি আত্মহারা হইলেন; জড়ের প্রাণে চৈতন্যের প্রাণ মিলিয়া গেল। তখন জীবাত্মায় পরমাত্মায় এক হইয়া গেল। তখন এ হেন সময়ে ভগবানের জয় বা স্তুতিগীতি ও নিতান্ত ইতর ব্যাপার ও অপ্রাসঙ্গিক তখন বাক্য নাই, বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই ভাব নাই, ভাবের বিকাশ নাই তখন কেবল প্রেমে প্রেমের স্ফূর্ত্তি, অবাঙ্মনসোগোচরের প্রেমে সচ্চিদানন্দের স্বতঃস্ফূর্ত্তি ও কৃতার্থতা। তখন জড় কে চৈতন্য কে বলিবে, পাঠক মহাশয় দেখিলেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যাহা লিখিয়াছেন তাহা সমাধি, তবে জড় সমাধি।

মাসিক সাহিত্য সমালোচন।

ভারতী।—অগ্রহায়ণ, ১৩১১। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে। জুলিয়স সীজর, তিব্বতকাহিনী, একখানি পুরাতন দলিল, প্রাচীন জ্যোতিষিক ভূগোল, অন্নপূর্ণার বিবাহ, সাময়িক কথা, গাইকবাড় মহারাজের অভ্যর্থনা সঙ্গীত।

যাঁহারা সাহিত্যের কোন সমাচার রাখেন তাঁহারা জানেন যে শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজী, ফরাশি, সংস্কৃত প্রভৃতি সাহিত্য উদ্যান হইতে নানাবিধ কুসুমচয়ন করিয়া তাহা দিয়া নানা ভাবে বঙ্গভাষাকে সাজাইতেছেন। "ভারতীতে" তিনি সেক্ষপীয়রের "জুলিয়স সীজর" নামক নাটকের অনুবাদ প্রকাশ করিতেছেন। আমরা প্রত্যেক ছত্রটি পাঠ করিয়াছি এবং মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি অনুবাদে বেশ ভাব রক্ষা হইতেছে। তবে মনে হয় যেন ইচ্ছা করিলে ভাবের পোষাকটাকে আরও বাঙ্গালী মত করা যাইতে পারিত। "তিব্বত-কাহিনী" অবিশ্বাসী লেখকের হাতে পড়ায় গল্পের রস ভঙ্গ হইয়াছে ও অঙ্গহীন হওয়ায় গল্পটা কিম্ভূত কিমাকার বীভৎস ভাব ধারণ করিয়াছে। বলি, যদি ভিক্ষাই দিলে ত গালি দিলে কেন? "একখানি পুরাতন দলিল" ১২১৮ সালের ২৯শে ভাদ্র তারিখের

একখানি দলিলের উপর নানারূপ মন্তব্য অর্থাৎ ভাষা ভাব তাৎকালিক আচার ব্যবহার ইত্যাদি। "প্রাচীন জ্যোতিষিক ভূগোল" লেখক অনেকগুলি মূল বৈজ্ঞানিক সত্য সংস্কৃত সাহিত্য মন্থন করিয়া পাঠক মহাশয়কে উপহার দিয়াছেন, মোটামুটি আধুনিক সভ্যজগতে এই ধারণা যে হিন্দুরা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের কোন ধারই ধারেন না। তাঁহারা পৃথিবীকে চতুষ্কোণ স্থির বলেন কিসে গ্রহণ হয় মাধ্যাকর্ষণ কি ইত্যাদি কিছুই জানেন না। এ সকল বিষয় য়ুরোপীয়দের পদপ্রান্তে বসিয়া ভারতকে শিখিতে হইবে। লেখক দেখাইয়াছেন যে এই বিশ্বাস ভ্রমমূলক। য়ুরোপ বলেন তুমিশ্রাময়ী নিশিথীনী রজনীর ঘোরা অজ্ঞান অন্ধকারা গাঢ়নিমগ্ন ভারতে তখন জ্ঞান-সূর্য্য প্রোজ্জ্বল দীধিতি বিকীর্ণ করিতেছিলেন। স্থানাভাবে আমরা এই সুন্দর জিনিষটি পাঠক মহাশয়কে উপহার দিতে পারিলাম না। তবু দুই একটি শ্লোক উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"কপিত্থফলং বদ্বিশং দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমং"

(নক্ষত্র কল্প)

পৃথিবী কদ্‌বেলের ন্যায় (গোল) এবং উত্তর ও দক্ষিণে চাপ অর্থাৎ চাপা। লেখক বলেন নাই কিন্তু আমরা খুলিয়া বলিতেছি যে প্রাচীন হিন্দুরা আমেরিকার অস্তিত্ব বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে তাঁহারা এই সত্য জ্ঞাত ছিলেন। সিদ্ধান্ত শিরোমণির গোলাধ্যায়ে—

লঙ্কাপুরেঽর্কস্ত, যয়োদয়ঃ দত্তদঅ্যাস্তাদা দিনার্দ্ধং যমকোটি পুর্য্যাং।

অধস্তদাসিদ্ধপুরেঽস্তকালঃ স্যাদ্ রোমকে রাত্রিদলং তদৈব॥

লঙ্কাদ্বীপে যখন সূর্য্যের উদয়কাল, যমকোটিপুরীতে তখন মধ্যাহ্ন, লঙ্কার অধঃ অর্থাৎ ভূমণ্ডলের অপর পার্শ্বস্থ সিদ্ধপুর নামক স্থানে অস্তকাল, এবং রোমদেশে (?) সেই সময় গভীর নিশায় সমাচ্ছন্ন থাকে। এই সিদ্ধপুর নিশ্চয়ই আমেরিকার কোন নগর। এখন নামান্তরিত হইয়াছে, এখন আমরা জানি লেখক বলিয়াছেন যে সিংহল দ্বীপে যখন ভোর ৬টা সাইবেরিয়ার পূর্ব্বাংশে বা নিউজিলণ্ডে তখন মধ্যাহ্ন আর আমেরিকার উইনিপেগ সহরে সন্ধ্যাকাল এবং রোম নগরে রাত্রি ২টা।

এখন য়ুরোপীয়েরা গ্লোব (Globe) দেখাইয়া শিশুকে শিক্ষা দেন। প্রাচীন ভারতে তাহাই হইত। সূর্য সিদ্ধান্তে—

অভীষ্টং পৃথিবী গোলকং কারয়িত্বা তু দারবং।

তদ্বৎ খ গোলকং কৃত্বা শিষ্যান্ প্রবোধয়েৎ॥

গ্রহণ সম্বন্ধে সূর্য্যসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,—

ছাদকো ভাস্করস্যেন্দুরধস্তো ধনবদ্ ভবেৎ।

ভূচ্ছায়াং প্রমুখশ্চন্দ্রো বিশত্যর্থো ভবেদসৌ॥

চন্দ্র সূর্য্যের অধস্থ হইয়া মেঘের ন্যায় উহার আচ্ছাদক হয় (সূর্য্যগ্রহণে), এবং চন্দ্র পৃথিবীর ছায়ায় প্রবেশ করে (চন্দ্র গ্রহণে), মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে আর্য্যভট্ট বলিয়াছেন আষ্টশক্তিশ্চ মহী, যৎ তয়া প্রক্ষিপ্যতে তৎ তয়া ধার্য্যতে। অর্থাৎ পৃথিবী আকর্ষণ শক্তি বিশিষ্টা। যাহা প্রক্ষিপ্ত হয়, পৃথিবী (আকর্ষণ শক্তি বলে) তাহা গ্রহণ করে। ভাস্করাচার্য্যের গোলাধ্যয়ে উল্লেখ আছে—

আকৃষ্ট শক্তিশ্চ মহী, তয়া যৎ খস্থং

স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা আকৃষ্যতে;

তৎ পতীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক্ক

পতত্বিত্বং খে।

পৃথিবী আকর্ষণশক্তিবিশিষ্টা। যদি কোনও গুরু-বস্তু আকাশে নিক্ষেপ করা যায়, তবে তাহা পৃথিবী স্বীয় শক্তিদ্বারা আপনার দিকে টানিয়া লয় এজন্য উহা ভূতলে পতিত হয়। পৃথিবী শূন্যে অবস্থিত বলিয়া আপাততঃ মনে হয় উহা অন্যদিকে পতিত হইবে। কিন্তু চারি দিকেই আকাশ উহা কোথায় পড়িবে? লেখকের নাম-শ্রীনবীনচন্দ্র ঘোষ।

"অন্নপূর্ণার বিবাহ" প্রবন্ধে সাড়ে আঠার ভাজা। ইহাতে না আছে এমন বিষয়ই নাই। তবে সমাজ সংস্কাররূপ লঙ্কার ঝালটা যেন ঋ ঋ করে ধরে। অকারণ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবর্গকে গালি দিয়াছেন, কুলীনদিগকে সেই আইপুরাণ গালাগালি গুলা নূতন করিয়া দিয়াছেন। আর গ্রাম্য ভাষার যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন। একেত্রে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই তাহার উপর অনেক ভাল মন্দ লোক নানারূপ গুণ গান করিতেছেন, কেহ পেচকের হাড় চালের বাতায় গুঁজিয়া দিতেছেন, কেহ কৃষ্ণ মার্জ্জারের মস্তিষ্ক ঈশান কোণে পুঁতিয়া দিতেছেন—যখন পাঁচটা পাঁচ রকম করিবার জন্য সব যোগাড়যন্ত্র হইতেছে তখন বাঙ্গালা সাহিত্যটাকে খাঁটি রাখিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পার্টিসনের পাল্লায় পড়িয়া ভাষাটা না মাটি হয়। তবে ব্যক্তি বিশেষের মুখ দিয়া যদি প্রাদেশিক

ভাষা বাহির হয়—যেমন ওয়াণ্টার স্কটের নবেলে স্কচের ব্যবহার আছে—তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই কেন না তাহা মারাত্মক নহে। আখ্যান বস্তুর কথা ছাড়িয়া দিয়া এইটুকু বলিতে পারি লেখা মন্দ হয় নাই। তবে চরিত্র বাহুল্যে গল্প জাঁকে না। রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি"তে কটা চরিত্র আছে?

সাহিত্য।—অগ্রহায়ণ, ১৩১১। ফরদুসি ও হোমর, অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা (কবিতা), ইংরাজ বর্জ্জিত ভারতবর্ষ। সীমাদ্রি-শিখরে (কবিতা), কন্দর্প ও রামচন্দ্র রায়, ভারতচন্দ্রের যুগ, চপলা (গল্প), সহযোগী সাহিত্য, মাসিক সাহিত্য সমালোচন।

ইহা ব্যতীত নিজাম-রাজ্যের হাইদ্রাবাদ প্রবাসী সিদ্ধমোহন মিত্রের ছবি আছে—তিনিই "ফারদুসি ও হোমর" লেখক কিন্তু এ প্রবন্ধ ক্রমশঃ। লেখক বলিতেছেন হিন্দুর রামায়ণ ও মহাভারত, গ্রীকের ইলিয়ড ও মুসলমানের সাহনামা ভিন্ন জগতে আর অমর epic নাই। "শাহনামা" লিখিয়াছেন ফর-দুসি। লেখক যে রূপ ভাবে সাহনামার আলোচনা এই প্রবন্ধে করিয়াছেন দেখাইবার নিমিত্ত এইটুকু তুলিয়া দিলাম।

"বিদ্যার রূপ বর্ণনায় ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন"—

কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥

ভারতচন্দ্রের উপমা ও ভাব অনেক স্থলে পারস্য কাব্য হইতে নীত স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। পারস্য উপমার সহিত রায় গুণাকরের উক্ত উপমার কত মিল দেখুন—

হিলালে কে বর্ আস্‌মান্ যায়ে উম্‌ত্।
তরাশিদ-হ নাখন্ পায়ে উম্‌ত্॥

ভাবার্থ:—

চন্দ্রের স্থান সবে জানে গো আকাশে
পদনখে তারি আজি কেন গো বিকাশে।

ভারতচন্দ্র আবার বলিয়াছেন:——

কুচ হইতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে
শিহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে।

লেখক বলিতেছেন ভারতচন্দ্রের এই উপমা পারস্য হইতে লওয়া।

ফরদুসি সাহনামার কুচের উপমায় বলিয়াছেন "অনার পিস্তান্" অর্থাৎ দাড়িম্ব সদৃশ কুচ যুগল। লেখক এই বলিয়া বলিতেছেন য়ুরোপীয়দিগের কুচ বর্ণনা আসিয়াবাসীর মত নহে অর্থাৎ "য়ুরোপীয় কবির উপমা অপেক্ষা সুন্দর"।

(লর্ড কর্জ্জন- সাবধান! মনে রাখিবেন)

Ariosto বলিয়াছেন:——

Full and large the breast where fresh and firm two *ivory apples* **grow.**

স্পেন্‌সার "ফেয়ারি কুইন"এ বলিয়াছেন "the young fruit in May." "অপূর্ব্ববীরাঙ্গনা" কবিতা—মাধবের প্রতি কুব্জার উক্তি। আমাদের ভাল লাগিয়াছে। "ইংরাজ বর্জ্জিত ভারতবর্ষে" 'শ্রীরাগমের অভিমুখে' পাশ্চাত্য লেখকের অনুবাদ। যেন ছবি দেখিতেছি মনে হয়। তবে ভাষাদোষে "জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীর" সব সুখটা পাই না—যেন খচ্ করিয়া লাগে, "মন্দিরগুলির প্রকাণ্ডতা ও প্রাচুর্য্যের মধ্যে যেন আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়; উহাদের আত্যন্তিক বহির্বিকাশে অন্তরাত্মা যেন ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে।" এ আমরা কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না। কেবল কলুর কথা মনে পড়ে "মা ঠাকুরুণ নারকেল তেল আছেন কি?" আজ্ঞে, যোড় হাত, বিনয়; ভাষারই বা দোষ কি? সবই—খচ্। অথবা হিসাবের কথা 'ঠাকুর মশাই তুমি চল্লে আপনার কিন্তু চটি মহাশয় পড়ে রইলেন'। হোক না কেন অনুবাদ যেটা লিখিব সেটার জান্ বাঙ্গালা না হইলে চলিবে কেন? আজি কালি বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা রাশি২ ইংরেজী মুদ্রাযন্ত্র প্রসব করিতেছে তাহাতে সাহি-ত্যের পুরিপুষ্টি হইতেছে না। সেটাকে আমরা সাহিত্যের গাত্রের ব্রণ বিবেচনা করি একটা উপলক্ষ পাইয়া মনের কথাটা বলিয়া ফেলিলাম। "সীমাদ্রি শিখরে" কবিতাটি বেশ। "কন্দর্প ও রামচন্দ্র রায়"—বাঙ্গালার ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা আজিকালি যেমন ধরণে ইতিহাস বা ঐতিহাসিক প্রবন্ধ এ দেশে লিখিত হয় সেই রূপেই চলিতেছে। নূতন কথা কিছু পাইলাম না। লেখক বলিতেছেন "ইতিহাস পাঠে জানা যায় আমাদের পিতৃ পিতামহগণ কাপুরুষ ছিলেন না।" পাঠককে এটা ধরাইয়া দিতে হয়। "ভারতচন্দ্রের যুগ"—সেই সময়ের দেশের ও সমাজের অবস্থা বর্ণিত হইতেছে। ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন "গুণ হয়ে দোষ হল বিদ্যার বিদ্যায়" সুতরাং ভারতচন্দ্রের যুগের

আলোচনায় ও সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার বিড়ম্বনাটা আসিয়া পড়িয়াছে। লেখক কি লিখিতেছেন দেখাই—

"দেশে বহুবিধ কুসংস্কার প্রচলিত ছিল, লোকে শুভাশুভ চিহ্নে বিশ্বাস করিত। মন্ত্র তন্ত্রে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল—মহিলাদিগের ত কথাই নাই। "চণ্ডী"তে কন্যার বিবাহে রম্ভাবতী বিবিধ বশীকরণ ঔষধের সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা—

ঔষধের গুণে স্বামী বোল শুনে
যেন পিঞ্জরের শুয়া।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গলেও আছে "মূখে মাথে তৈল পড়া, নয়নে কজ্জল।"

* * * * * *

কোন কোন স্থান সম্বন্ধেও নানারূপ কুসংস্কার ছিল। শিশুদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য অস্তিত্ব হীন জীবের অস্তিত্ব কল্পিত হইত।"

কার্লাইল বলিয়াছেন যে কুসংস্কার মানিব না বলিয়া আধুনিক লোকে যে অবিশ্বাস পোষণ করিতেছে তাহাই একটা বড় কুসংস্কার। নহিলে মন্ত্র তন্ত্র মানা কুসংস্কার এও পড়িতে হইল। ভূত মানিলে কুসংস্কার কি। পিতার মৃত্যুতে যে প্রেত শ্রাদ্ধ হয় সেটা কি কুসংস্কার? বিলাতে বড় ঘরের বিবী বীবীরাও যদি রাস্তায় ঘোড়ার পায়ের "নাল" কুড়াইয়া পান তবে অতি যতনে শুভচিহ্ন বলিয়া তুলিয়া রাখেন—এটা কি "সংস্কার?" "চপলা"—গল্পে কিছু পাইলাম না। যেটুকু মিষ্ট লাগিয়াছে সে টুকু এই—"দীর্ঘ দিবানিদ্রার পর যেমন কখনও কখনও অপরাহ্নে প্রভাতের ভ্রান্তি হয়, বৃদ্ধের যেন তেমনি ভ্রান্তি হইয়াছিল"। বৃদ্ধ আপনার শিশু নাতির সঙ্গে অৰ্দ্ধনিমিলিত নেত্রে খেলা করিতেছিলেন।

বঙ্গদর্শন।—নবপর্য্যায় ১৩১১ পৌষ। নৌকাডুবি (উপান্যা) রামায়ণের রচনা কাল, মুক্তি বিষয়ে রামানুজ স্বামীর উপদেশ, ত্রিবঙ্কুর, বিবাহযাত্রী (ছবি) দিল্লীর শিল্প প্রদর্শনী, সার সত্যের আলোচনা, প্রকৃতির প্রতি (কবিতা)। নৌকাডুবি (উপন্যাস) ক্রমশঃ চলিয়াছে। "রামায়ণের রচনাকাল"—লেখক বলিতেছেন "পুরাতন সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসে পাণিণি যুগ, কাত্যায়ন যুগ ও পতঞ্জলি যুগ নামক তিনটি সাহিত্য যুগ কল্পনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—পাণিণি যুগে রামায়ণ পরিচিত না থাকিলেও, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিযুগে রামায়ণ পরিচিত ছিল। পাণিণির পরে ও কাত্যায়নের পূর্ব্বে কোনও সময়ে রামায়ণ রচিত হইয়া থাকিবে। "মুক্তি বিষয়ে রামানুজ স্বামীর উপদেশ"। লেখক শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ। বেদান্তবাগীশ মহাশয় যে স্বপাক হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়াছেন ভরষা করি তিনি নিজে সহজে হজম করিতে পারিবেন। আমরা কিন্তু প্রসাদ মাথায় ঠেকাইয়া রাখিয়া দিতে বাধ্য। বাগীশ মহাশয় যদি অনুকম্পা করিয়া একবার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সারসত্যের আলোচনা"টি অনুধাবন করিয়া পাঠ করেন তাহা হইলে বোধ হয় বিষয় বিষয়ীর কথাটা খুলিয়া যায়, ভাষার দৃষ্টিতে বুঝিতে পারেন এই দুইটা লেখার মধ্যে কোন্‌টা জীবাত্মা আর কোন্‌টা পরমাত্মা?—কেন না, "মনুষ্য যে সামর্থ্য যোগ ব্যতীত কেবল অর্থিতার দ্বারা কোন বিষয়ে সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা পারে না, না পারার পক্ষে ঐ সকল পুষ্কল নিদর্শন। "ত্রিবঙ্কুর" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ। লেখা বেশ পাঠক জানেন। "বিবাহযাত্রী" প্রশংসা করিতে পারিলাম না। পাঠক নমুনা দেখুন—

দেখলাম একটা যাচ্চে বিয়ে।
সমারোহে রাস্তা দিয়ে॥
রাস্তার দুধার চলেচে দুই, এসেটিংলিন্‌ ল্যাম্পের সারি।
প্রথমত ঢোল ও কাঁশী,
তাহার পরে দক্ষ বাঁশী,
তাহার পরে গোরার বাদ্য, তাহার পরে সানাই দারী॥
বাঁশী সানাই ঢক্ক ঢোল,
কচ্চে মিলে হট্টগোল,
সবই আছে, নাইক কেবল মৃদঙ্গ ও হরি বোল।
বলি "বিবাহযাত্রী" না "বরযাত্রী"?

"দিল্লীর শিল্প প্রদর্শনী"—খালি বাজে কথা কাজের কথা কিছু নাই। দুই বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীর দরবারের সময় শিল্প সম্বন্ধে লর্ড কুর্জ্জন যে দুই একটা মুখভারতী প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহারও চর্ব্বিত চর্ব্বণ দেখিলাম।

"সারসত্যের আলোচনা"—এইটিই বঙ্গদর্শনের উজ্জ্বল মুকুট। "প্রকৃতির প্রতি" কবিতা—তবে বুঝিলাম কি না প্রাণে—একটু সন্দেহ রহিল।

———

THE EASTERN VOICE.

THE CHEAPEST, THE BEST AND THE MOST WIDELY CIRCULATED DAILY PAPER IN INDIA.

RATES OF SUBSCRIPTION.

Town ~~Rs~~ 20 per annum. Mofussil ~~Rs~~ 25 per annum.

POPULAR EDITION—

	ANNUAL IN ADVANCE.			MONTHLY IN ADVANCE.
Town ...	~~Rs~~ 12.	...	...	Re 1.
Mofussil...	~~Rs~~ 15.	...	...	Re 1-6 as.

For sample copies apply enclosing
one half-anna stamp to

The Manager,
EASTERN VOICE,
49—4, BENTINCK STREET,
CALCUTTA.

১২শ বর্ষ—১০ম, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা। মাঘ, ফাল্গুণ ও চৈত্র—১৩১১

পূর্ণিমা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম—

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল; শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল বি, এল; শ্রীগঙ্গেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য বি, এল, শ্রীআবদুলকরিম; শ্রীনিতাই চাঁদ শীল প্রভৃতি।

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১। মহাত্মা ব্যক্তির প্রয়োজন	২০৩
২। হুগলীর কথা	২১০
৩। প্রণয় যজ্ঞ	২২২
৪। জাতিভেদ	২২৪
৫। প্রাচীন সাহিত্য কীর্ত্তি	২৩০
৬। মৃত্যুর পর	২৩৮
৭। নিশালাপ	২৪৯
৮। বর্ত্তমান ভারত	২৫১
৯। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা	২৫৭

বাঁশবেড়িয়া,

পূর্ণিমা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

শাখাকার্য্যালয়— ২৪ নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩১১।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।
ঐ সুলভ সংস্করণ ১॥০ টাকা।

এক সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।
ঐ সুলভ সংস্করণ ৶০ আনা।

ডাক্তার মেজরের ইলেক্ট্রো সারশাপ্যারিলা।

চিকিৎসা-জগতে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে।

রক্তই মানবদেহের জীবনশক্তি, তাড়িৎ-শক্তিই জীবনশক্তির মূল।

প্রতিদিন নানা প্রকারে, বিশেষতঃ আহার বিহারে, অত্যাচার অনাচার, নিশ্বাস প্রশ্বাসে মানবদেহে বিষ প্রবেশ করিয়া থাকে। এই বিষ ক্রমে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া দেহাভ্যন্তরস্থ তাড়িতশক্তির হ্রাস করে, এবং পরিণামে প্রায়ই সাধারণতঃ শোণিত সম্বন্ধীয় পীড়া উৎপন্ন হয়। যে ঔষধ ঐ রক্তদুষ্টির বিষ তিরোহিত করিয়া ঐ হ্রাস প্রাপ্ত বৈদ্যুতিকশক্তির সামঞ্জস্য সম্পূর্ণরূপ রক্ষা করিতে পারে,

তাহাই প্রকৃত ঔষধ, এই—

"ইলেক্ট্রো-সার্শাপ্যারিলাই"।

তাহার একমাত্র আদর্শ।

ইলেক্ট্রো-সার্শাপ্যারিলাই, সর্ব্বপ্রকার মুদ্রিত ভাষায় ব্যবস্থাপত্র সংবলিত ৮ দিন সেবনোপযোগী প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৲ টাকা; ৩ শিশি ৫॥৹ টাকা; ৬ শিশি ১০॥৹ টাকা; ডজন ২০৲ টাকা; প্যাকিং ও মাশুল ইত্যাদি যথাক্রমে ৸৹; ৸৶৹ ১৷৹; ১৸৹। পাইকারগণের পক্ষে দর স্বতন্ত্র।

অসংখ্য অযাচিত প্রশংসাপত্র ঔষধের অব্যর্থতার, অকৃত্রিমতার ও অলৌকিকতার জ্বলন্ত প্রমাণ, জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে, আবেদন করিলেই তাহা বিনা মাশুলে সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়।

ডবলিউ মেজর এণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা।

মহাত্মা ব্যক্তির প্রয়োজন।

(১)

মহাত্মা ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস স্বাভাবিক। আমাদিগের বাল্যসঙ্গীগণের মধ্যে যদি কোনও ব্যক্তি বীর বলিয়া পরিচিত হয় এবং তাহাদের অবস্থা উন্নত হয় তাহা হইলে আমাদের মনে বিস্ময়ের লেশমাত্র উদিত হয় না। পুরাণের পত্রে পত্রে আমরা দেবতা গন্ধর্ব্বের সাক্ষাৎ পাই—উন্নীত এবং কবিত্বপূর্ণ অবস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টি পতিত হয়; বুঝিতে পারি যে তাহাদের প্রতিভা অতুলনীয়। গৌতমের কাহিনীতে কথিত আছে যে, প্রথমে মনুষ্যগণ মাটি খাইত এবং তাহাই তাহাদের কাছে সুস্বাদু বলিয়া আদৃত হইত।

প্রতিভার পূজার্থেই স্বভাব ব্যবস্থিত রহিয়াছে। সাধুগণ যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন সেই সত্যে জগত পরিচালিত হইতেছে। তাঁহারাই এ জগতকে সুখের স্থান করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের সংসর্গে যে সকল ব্যক্তি বাস করিয়াছে তাহারাও জীবন সুখকর দেখিয়াছে। এমনি একটা সমাজ ছিল এইরূপ বিশ্বাসেই আমরা জীবন সুখময় দেখি এবং যথার্থ হউক কল্পনায় হউক আমরা বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত বাস করিতে শিখি। তাঁহাদের নামে আমাদের পুত্রগণকে অভিহিত করি। ভাষার অস্থিমজ্জায় তাঁহাদের নাম মিশ্রিত হয়—তাঁহাদের কার্য্যকলাপ এবং স্মৃতি আমাদের গৃহে বর্ত্তমান থাকে এবং প্রতি নিমেষের ঘটনায় তাঁহাদের একটী করিয়া কাহিনী আমাদের মনে উদিত হয়।

মহাত্মার অন্বেষণই আমাদিগের যৌবনের স্বপ্ন এবং ভবিষ্য জীবনের কর্ম্ম। আমরা মহাত্মার কার্য্যকলাপ অন্বেষণে বিদেশ ভ্রমণ করি—মহাত্মারই চিহ্নের প্রত্যাশায়। কিন্তু আমরা অভিলষিতের সাক্ষাৎ পাইলাম না। অনেক ধনী দেখিলাম। দেখিলাম ইংরেজ কার্য্যদক্ষ—জর্ম্মাণ অতিথিবৎসল। ভ্যালেন্সিয়া নগরীর বায়ু স্বাস্থ্যকর।—গোলকুণ্ডায় হীরক আছে। অনেক দেখিলাম। কিন্তু যাহার জন্য গৃহ ছাড়িলাম তাহা কৈ? আমি ত দাতা সুখী অথবা ধনী ব্যক্তিদিগকে দর্শন করিতে বাহির হই নাই। আমি ত, নীলাকাশ অথবা বহুমূল্য সুবর্ণখণ্ডের দর্শন প্রত্যাশায় ভ্রমণ করি নাই। এমন দিক্‌দর্শন যন্ত্র যদি দেখিতে পাই যে তাহার দর্শনী দেখিয়া বুঝিতে

পারি কোন্ দেশে মানসিক বলে বলীয়ান্ এবং আধ্যাত্মিক ধনে ধনী মহাত্মা বাস করেন, তবে আমি সর্ব্বস্ব বিনিময়ে সেই দিক্ দর্শন কিনিব—এবং অভিলষিতের উদ্দেশে অদ্যই যাত্রা করিব।

মহাত্মার প্রতিভাই সমগ্র মানবজাতির গৌরবের একমাত্র কারণ। যে দেশের একজন রেল আবিষ্কার করিয়াছেন—সে দেশের সমগ্র মানব এক জনের প্রতিভায় গৌরবান্বিত হইয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র ভিক্ষুকে পরিপূর্ণ জনসংখ্যা বিরক্তিকর হইয়া উঠে। সে অনাবশ্যক জন সংখ্যা একরাশি মাছির মত যত বাড়িতে থাকে, ততই ঘৃণা বাড়াইতে থাকে।

ধর্ম্ম এই কর্ম্মবীরগণের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার অভিব্যক্তি মাত্র। পুরাণের দেবতাগণ মহাত্মার কল্পনাময় সমুজ্জ্বল মূহুর্ত্তে সৃষ্ট হইয়াছেন। আমাদের সকল আদর্শ আমরা এক ছাঁচে গঠিত করি। হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্ম, মহম্মদীয় ধর্ম্ম—সকল ধর্ম্মই মানবের মনের গঠনানুযায়ী কার্য্য মাত্র। ইতিহাসের ছাত্র বস্ত্রক্রেতার মত একটা বড় দোকানে প্রবেশ করেন। তিনি মনে করিলেন আজ এক খানা নূতন বস্ত্র ক্রয় করিলেন—একটা নূতন সত্য আবিস্কার করিলেন। তাহার পরে যদ্যপি তিনি বস্ত্রের কারখানায় প্রবেশ করেন—তবে দেখিবেন যে তাঁহার সেই নূতন বস্ত্র এককালে ইজিপ্টের পিরামিড্ অভ্যন্তরে গৃহভিত্তির আবরণ ছিল। ঈশ্বরবাদ আমাদের মনের পবিত্রতা মাত্র। যেহেতু আমরা মনুষ্য বতীত অপর কিছু মনে আনিতে পারি না—অপর কিছু অঙ্কিত করিতে পারি না—অপর কিছু নির্ম্মাণ করিতে পারি না। আমরা এই বিশ্বাস করি যে পঞ্চ মহা ভূতের উৎপত্তির কেন্দ্রস্থল মন অথবা চিন্তা। দর্শন শাস্ত্রকার বলিয়াছেন একই অনন্ত শক্তি সমস্ত পদার্থে বর্ত্তমান আছে।

(২)

অপর ব্যক্তির কাছে আমরা কেমন করিয়া উপকৃত হই তাহা জানিতে হইলে বর্ত্তমান গ্রন্থাদি পাঠ সম্বন্ধে আমাদিগকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। মানবে প্রেম সম্বন্ধে আমরা কোন প্রতিকূল কথা কহিব না—অথবা কোন সাধুর পরোপকার পুন্য জীবন লইয়া তর্ক বিতর্ক করিব না। তাহা করিলে আমাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। আমাদের সামাজিক বল আছে। অপরের প্রতি ভালবাসায় এমন একটা জিনিসের বিনিময় হইয়া

থাকে যাহা আর কিছুতেই হয় না। আমি নিজে যাহা করিতে পারি না—তাহা অপরের সাহায্যে সম্পন্ন করি। আমি আপনাকে যাহা বলিতে অক্ষম তাহা তোমায় বলিতে পারি। অপরের মন আমার মনটিকে দেখাইবার যন্ত্র মাত্র। প্রত্যেকেই ভিন্ন গুণাবলম্বী সাধুর সহবাস আকাঙ্ক্ষা করে। ……… মনুষ্য ঠিক তালবৃক্ষের মত—তাহার অভ্যন্তর হইতে বাহিরে বিকাশ। তাহার আপনার মন অপরের দুরবগম্য হইলেও সে আপনি অতি সহজেই তাহা দেখাইতে পারে। মধুর পক্ষে মিষ্ট হওয়া এবং নিম্বের পক্ষে তিক্ত হওয়া খুব সহজ। যাহা আপনি আসিবে তাহা পাইবার জন্য আমরা অনেক বৃথা পরিশ্রম করি। যে উচ্চ চিন্তা মণ্ডলে প্রবেশ করিতে হইলে অন্যকে পরিশ্রম করিতে হয় সেই মণ্ডলে যিনি সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত, তাঁহাকেই আমি মহাপুরুষ বলি। মহাত্মা জাগতিক ক্রিয়ার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে একবার মাত্র চক্ষু মেলিলেই যথেষ্ট হইল, কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি সেই ক্রিয়া সমূহের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে বহুক্লেশ সহ্য করে—ভ্রমপ্রমাদ এড়াইবার নিমিত্ত নিবিষ্টনেত্রে চতুর্দ্দিকে দেখিয়া থাকে। মহাত্মার কার্য্যই এই রূপ। সুন্দরী আমাদের নেত্রপটে তাঁহার রূপের প্রতিবিম্ব বিনা আয়াসে ফেলিয়া থাকেন. কিন্তু সেই অনায়াসসাধ্য কর্ম্মের ফল কি গুরুতর! জ্ঞানী মহাত্মাও এইরূপ অনায়াসে অপরের মনে আপনার গুণাবলি পৌঁছাইয়া দেন। প্রত্যেকেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ গৌরবের কার্য্য অতি সহজে সম্পন্ন করিতে পারেন। ফরাসী ভাষায় একটী বচন আছে—"Peu de moyens, beaucoup d'effet*" যিনি স্বভাব হইতে মহত্ব লাভ করিয়াছেন—তিনিই মহৎ, যিনি আপন কার্য্যকলাপে অন্য কাহাকে মনে আসিতে দেন না তিনিই মহৎ।

উদ্ভিদ্ যেমন ধাতু সমূহকে পশ্বাদির আহারে পরিবর্ত্তিত করে তেমনি মনুষ্য স্বভাব-সুলভ অব্যবহার্য্য পদার্থকে মনুষ্যের ব্যবহারে লইয়া আইসেন। তড়িৎ প্রবাহের শক্তি চুম্বকের আকর্ষনী শক্তি প্রভৃতির দ্রষ্টা—সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞ জ্যোতির্বেত্তা সকলেই আপনাপন বিষয়ে অজানিত এবং অন্ধকার পথের মধ্য দিয়া জন সাধারণের সহজ পথ নির্ম্মান করিয়া দিয়াছেন। স্বভাবের এক এক বিভাগের সহিত এক এক মহাত্মা গোপনে সংশ্লিষ্ট আছেন।

* Little of effort—Much of effect.

মহাভূত সমূহের সহিত পদার্থ নিচয়ের সম্বন্ধের রহস্য তিনিই উদ্‌ঘাটন করিয়া সাধারণের সম্মুখে ধরেন। তিনি দেখাইয়া দেন যে প্রতি উদ্ভিদের নায়ক আছে—এবং প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুরই কবি আছে। বিশ্বসংসারে কত জীব আছে—কত গুণ লইয়া তাহারা বিচরণ করিতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? তাহাদের প্রত্যেকেই যেন ইন্দ্রজালবদ্ধা রাজকন্যার মত কোন ভাগ্যবান্ উদ্ধর্ত্তার অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছে। প্রত্যেকেই বিশ্বহিতে ইন্দ্রজাল মুক্ত হইয়া সৌম্যমূর্ত্তি পরিগ্রহণ পূর্ব্বক মনুষ্য লোকে বিচরণ করিবে—ইহার সংঘটন করিবেন মহাত্মা! আবিষ্কারের ইতিহাসে অপ্রকাশিত পূর্ণ সত্য আপন প্রকাশের জন্য একটি বিশিষ্ট মস্তিষ্ক নির্ম্মাণ করিয়া রাখে—এই মস্তিষ্কই তাহার বিশ্বে অবতরণার্থ প্রথম সোপানের কার্য্য করে।

(৩)

আমি যদি আর কাহাকেও সাহায্য করি তবে সে আমার বুদ্ধি বৃত্তিরই সহায়ে। অন্ন বস্ত্র দিয়া সাহায্য করাও কার্য্য বটে—তবে সে ক্ষণিক বাহ্য সুখের জন্য। যাহাতে মানসিক ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় এবং নৈতিক সজ্জার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয় তাহাই নিত্য সুখের হেতু—তাহাতেই অনন্ত সুখ। আমি কোথায় আছি—শঙ্করাচার্য্য কোথায় ছিলেন! তিনি মোহমুদ্গার লিখিয়া গিয়াছেন—ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক তাহা তাঁহার লেখনীমুখে বাহির হইয়াছে—সে কবে কোন যুগে। আজ এত কাল পরে আমি সেই মোহমুদ্গার পাঠে শান্তি পাইলাম। তিনি কি একবারও আমার কথা ভাবিয়া ছিলেন! তাই বলিতেছি কোন শুভক্ষণে কিছু দিনের জন্য কোন অজানিত দেশে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া সহস্র সহস্র বৎসর আপনার প্রতিভা বিকাশে মহিমান্বিত করেন। জীবন চরিতের ইহাই শ্রেষ্ঠ নীতি।

উচ্চ অঙ্গের বুদ্ধি বৃত্তির কার্য্য সমূহ এমন পরস্পরে সম্বন্ধ বিশিষ্ট যে কিছু কল্পনাশক্তি উন্নত মন মাত্রেই স্থানলাভ করে। বিশেষতঃ যাঁহারা স্বভাবতঃ চিন্তাশীল তাঁহাদের মনে কল্পনা অতি সহজেই স্থান পায়। আমরা কল্পনা খুঁজিয়া বেড়াই—কিন্তু কল্পনা মহাত্মাকে খুঁজিতেছে। এই অন্বেষণের মূলে যে সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা আমাদের উপেক্ষণীয় নহে।

এই সত্য আবিষ্কারের সঙ্গে যে আনন্দ বিজড়িত আছে তাহা জন সাধারণের আত্মার পরিতর্পন করিয়া থাকে।

কিন্তু এই সুবিমল আনন্দেরও বিকৃত উৎসব আমরা দেখিতে পাই। জ্ঞানের গভীর আনন্দরাশি আমাদের পৌত্তলিকতায় পর্য্যবসিত হয়। বিশেষতঃ যখনি দেখি কোন প্রতিভা সম্পন্ন মহানুভব কোন নূতন সত্য শিক্ষা দিতে আসেন তখনি তাঁহাকে অগণ্য প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে হয়। তাহার সাক্ষী গ্যালিলিও। খলের এমনি স্বভাব যে সে সামান্য একটু বুদ্ধি লইয়া তাহাতে নানাপ্রকার ভাণ মিশ্রিত করিয়া ভস্মের বেশে মহাত্মার জ্ঞানাগ্নিকে চাপা দিতে আসে। সে তাঁহার অন্তঃসার শূন্য আড়ম্বরে আমাদের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিতে চাহে। কিন্তু মহাত্মাবিষ্কৃত সত্যের তাহাতে ক্ষতি হয় না। ভাণের সহিত বিবাদে সে সত্য আরো নূতন অঙ্গাভরণ খুঁজিয়া বাহির করে। আমার এই পল্লীতে যদি একজন বিদ্যাসাগর আসেন তবে দেখিতে পাইব তিনি তদ্দর্শনেচ্ছু সমাগতগণের হৃদয়ে কথায় কথায় অদৃষ্ট পূর্ব্ব সত্যের বীজ রোপণ করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝাইয়া দিবেন যে ঐশ্বর্য্য ব্যতীত অন্য বিভব এ জগতে আছে। আমাদের দেশের ধনী তাঁহার দারিদ্র্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন—এবং দরিদ্র প্রফুল্লচিত্তে নিজ কর্ত্তব্য পথে চলিতে সক্ষম হইবে।

সময় হইলে স্বভাব হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইবে। আমরা একজন সাধুর প্রতাপ অধিকদিন সহ্য করিতে পারি না তাই পরিবর্ত্তনের লালসায় আমরা ব্যতিব্যস্ত। আমরা সকলেই অসম্পূর্ণ ইচ্ছার মত—একটি জীবনের সমস্ত সারাংশ আমরা গ্রহণ করিতে পারিনা—আমরা এক এক মহাত্মার জীবনের এক এক কণিকামাত্র ফেণ পাইলেই খুসী হই। তাই বঙ্কিমচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন—আমরা তাঁহার সিংহাসনে কে আসিতেছেন দেখিবার জন্য সুদূর দিগন্তবৃত্ত পর্য্যন্ত সতৃষ্ণনেত্রে চাহিয়া দেখিতেছি। কিন্তু কেহ আসিল না—কেহ আসিবে না। তাঁহার সঙ্গেই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। অন্য একক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র আসিয়াছেন। তিনি বিদ্যাসাগর নহেন—বঙ্কিমচন্দ্র নহেন। অন্য এক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আসিয়াছেন তিনি মাইকেল নহেন হেমচন্দ্র নহেন।

এই শ্রেণীর দুই চারি জন ব্যক্তির কাছে আমরা অশেষ প্রকারে ঋণী।

মনুষ্যজাতি চিরদিনই দুই চারি জনকে গুরু বলিয়া মানিয়া আসিতেছে—যেহেতু ইঁহাদের ধারণা এবং কল্পনা এরূপ উচ্চ যে আমরা ইঁহাদিগকে নেতা বলিতে বাধ্য। এই মহাত্মারাই স্বভাবের আদিগুণ আমাদিগকে শিখাইয়াও থাকেন। আমরা প্রতিদিনই কুহেলিকার রাজ্যে ভ্রমণ করিতেছি—এবং ভোজবাজী সৃষ্ট বাড়ি ঘর যাহা আজ আছে কাল নাই তাহা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া আছি। কিন্তু জীবন ভোজবাজী নহে। তাই এক একবার চেতন মুহূর্ত্তে আমরা বলিয়া উঠি "বাস্তব জগতের দ্বার খুলিয়া দাও—আমি অনেক দিন বিদূষকের সজ্জা পরিয়া জগতকে হাসাইয়াছি।" আমরা জ্ঞান হারাইয়াছি—কিন্তু এমন মনুষ্য আছেন যাঁহারা জ্ঞানালোকে সমুন্নত জীবন যাপন করিতেছেন তাঁহারা যাহা জানেন আমাদেরই জন্য জানিয়াছেন। নূতন নূতন মহাত্মার আবির্ভাবের সহিত একটি করিয়া নূতন সত্য স্বভাবের একটি করিয়া নূতন গূঢ় রহস্য আমাদের চক্ষের সম্মুখে নীত হয়। এই মহাত্মারা আমাদিগের পশু জীবনের অভ্যন্তর স্বপ্নঘোর ভাঙ্গিয়া দিয়া আমাদিগকে জাগ্রত করিয়া নূতন উচ্চতর শ্রেষ্ঠতর লক্ষ্যে বদ্ধ করিয়া দেন। তাই এই সাধুগণ সম্মানের উচ্চ সিংহাসনে চিরদিন অধিষ্ঠিত থাকিবেন। চাহিয়া দেখ নগরে নগরে কত প্রস্তর মূর্ত্তি, কত চিত্র কত স্মৃতি চিহ্ন রহিয়াছে—এগুলি তাঁহাদেরই চির-অমরত্ব জাগরূক রাখিয়াছে।

(৪)

যে মহাত্মাগণ অদ্ভুত চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং যে মহাত্মাগণ সারসত্য আবিষ্কার করিয়াছেন এই উভয়বিধ মহাত্মাকেই আমি স্বদেশের গৌরবস্থল বলিয়া মনে করি। "নিশীথচিন্তা" অথবা "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" পড়িয়া আনন্দ পাইয়াছি—গ্রে লিখিত "এ্যানাটমির" বিষয় অবগত হইয়াও তৃপ্তি পাইয়াছি বিস্ময়ে নিমগ্ন হইয়াছি। আকবর, শীবাজী, শঙ্করাচার্য্য, সকলেই আমাদের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছেন। যে মহাত্মা আপনার ভাবে আপনি পূর্ণতালাভ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে আমি পূজা করি।—তিনি রাজা হউন, কবি হউন, যোদ্ধা হউন তাঁহাকে আমি শ্রদ্ধা করি। যিনি আপামর সাধারণকে স্বগুণে মুগ্ধ করিয়া আপন উচ্চলক্ষ্যে তুলিয়া লইতে পারেন তিনিই ধন্য। বীরাগ্রণী রাজদণ্ড ঢুলাইয়া প্রজা শাসন করিতে পারেন—তাহাতে বিশ্বের মঙ্গল সাধিত হয় সত্য।

কিন্তু যিনি আত্মত্যাগ করিতে পারেন—জ্ঞান বিচার ও প্রেমের চক্ষে যিনি ইতর বিশেষ বিস্মৃত হইতে পারেন—যিনি ব্যষ্টি ভুলিয়া মানব জাতিকে এক মহাসমষ্টিতে নিরীক্ষণ করিবার অধিকারী হইয়াছেন তিনিই যথার্থ বীর—তিনিই প্রকৃত রাজা—এবং তিনিই যথার্থ ঐশ্বর্য্যের আস্পদ। সেই রাজাই বিশ্বজিত যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দান করিয়াও রাজ্যেশ্বর তিনিই মহাত্মা ও মহাপুরুষ।

অপর এক চিন্তার বিষয় রহিয়াছে। ক্ষুদ্র হইলেও ইহা বিচারযোগ্য বটে। মহাত্মাদের কথায় ক্ষুদ্রপ্রাণীদের কথাও মনে আইসে। যাহারা কোন অংশে হীন, স্বভাব হইতে তাহারা এমন কিছু পায় যাহা লইয়া সে আপন হীনতা ভুলিয়া স্বচ্ছন্দে দিনপাত করে। সমাজে যে সমস্ত অনাবশ্যক জনসংখ্যা একটা হুঙ্কারজনক ইতিহাসের বিষয়ীভূত হয় তাহারা মনে করে মহাত্মারা তাহাদিগের প্রতি নিতান্ত অসদ্ব্যবহার করেন। তাহাদের মধ্যেও একটা গূঢ় রহস্য বিদ্যমান আছে। এই রহস্যই মহাত্মার মহত্ব বুঝিবার অন্যতম উপায়। যে অতি হীন সে তাহার ভ্রান্তি ভ্রম-ক্রমেও মনে আনিতে পারে না—মনে করে আমার জ্ঞান অভ্রান্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই আত্মপ্রশংসার লীলাস্থলে এমন ব্যক্তি আছেন যাঁহারা ঘোর পরনিন্দাপরায়ণের কাছেও প্রতিষ্ঠা-লাভ করেন। যিনি আমাদিগকে ন্যায়পথে ইঙ্গিত করেন তিনিই এই মহাত্মা। তাঁহার অনুগ্রহ অসীম। গীতাকার যদি না থাকিতেন তবে আমরা যুক্তি মীমাংসায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতাম না। আমাদের ধারণাশক্তি আছে বলিয়াই বিশিষ্টের সহবাস আমরা আকাঙ্ক্ষা করি। এবং সেই সহবাসের ফলে আমাদের মতিগতিও বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়। আমরা সংখ্যায় অনেক আছি। এই সংখ্যায় যদি একজন মহাত্মা আইসেন—তবে সকলেই মহত্ব প্রাপ্ত হইবে। গুণের বিসর্পিনী শক্তিই এইরূপ।

(৫)

জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় মহাত্মা গভীর মোহান্ধকারের মধ্যে আমাদিগের চক্ষু এইরূপে উন্মীলিত করিয়া দেন। জ্ঞানোদয়ে আমাদের অহংজ্ঞান দূর হয়—এবং আমরা অপরের গুণাবলি দেখিতে পাই। মহাপুরুষের সংসর্গে আমরা অতি সহজে সমসাময়িক ব্যক্তিগণেরর বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারি। কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না—সকলেই যেন আপনা আপনি লোম-

কূপের মধ্য দিয়া শরীরে প্রবেশ করে। সহানুভূতির দ্বারা স্ত্রী যেমন স্বামীর নৈতিক উন্নতি হৃদয়ঙ্গম করেন আমরাও সেইরূপ ভালবাসার গুণে জন সাধারণের হৃদয় বুঝিতে পারি। এই অনন্ত হৃদয়ের সম্মিলন ঘটান— মহাত্মা।

এইরূপে প্রতিভা প্রদত্ত আহার লাভ করিয়া আমরা বন্ধুগণের সহিত বিস্তর কথা কহি—সকলে মিলিয়া সৃষ্টি সৌন্দর্য্য অনুভবে আনিয়াছি ভাবিয়া গর্ব্বিত হই। সঙ্গে সঙ্গে এই পথে যিনি আমাদিগকে আনিয়াছেন তাঁহার কথা মনে করিয়া ধন্য হই। এক মহাত্মা সগৌরবে শত সহস্র মনুষ্যের ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতেছেন! তাই প্রত্যেক জননীই তাঁহার পুত্রকে প্রতিভা সম্পন্ন দেখিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাহাত' হয় না। শতকরা নব্বই জনে প্রতিভার গন্ধমাত্রও নাই। কিন্তু এক জনের অতিরিক্ত প্রভাবে একটা বিপদাশঙ্কা আছে। আমাদের নিজস্ব টুকু হারাইয়া ফেলি প্রতিভাশালীর প্রতিভা আপন তেজোমণ্ডলে আমাদিগকে পরিবেষ্টিত রাখে। আমরা নিতান্ত দীনহীন হইয়া যাই এবং জ্ঞানের জগতে মহাপুরুষের সংস্কাররূপ রজ্জু সংযোগে আত্মহত্যা করিয়া ফেলি। ঐ যে দিগন্তবৃত্তে আমাদের সাহায্যের জন্য এক মহাত্মা আসিতেছেন! নূতন তত্ত্ব, নূতন ভাব লইয়া আমাদিগকে বিলাইতে আসিতেছেন। এই রূপে ক্রমান্বয়ে নূতন নূতন মহত্ত্ব হইতে মধু সঞ্চয় করিতে করিতে আমাদের মনের মধুচক্রখানি অতিরিক্ত মাত্রায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে অথচ সেই মধু আমরা স্বোপার্জ্জিত ও নিজ স্বাধীন যত্নে সঞ্চিত বলিতে পারি না। তখন মনে ভাবি "কেহ জ্ঞানের হস্ত হইতে উদ্ধার কর"। তখন আর মহাত্মা ভাল লাগে না। Voltaire বোধ হয় অধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন না কিন্তু যীশু খৃষ্টের কথা শুনিয়া এক দিন তিনি বলেন "তোমায় বিনয় করিয়া বলিতেছি ঐ ব্যক্তির নাম আমাকে শুনাইও না।"

(৬)

মহাত্মাগণ সাধারণের ব্যবহারে কতদূর আইসেন তাহার একটা সীমা আছে। প্রতিভার কাছে যাওয়া যায় না। প্রতিভার আকর্ষণীশক্তি যথেষ্ট মাত্রায় আছে—এবং দূর হইতে প্রতিভাশালী মনীষি আমাদের আপনার বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যদি তাঁহাদের কাছে যাইতে চাই তাহা হইলে

সকল দিক হইতে একটা বাধা পাই। যত আমরা আকৃষ্ট হই তত আমাদিগকে বাহির হইতে কে বাধা দেয়। মহাত্মার কাছে যেটুকু ভাল আমরা পাই তাহাতে কিছু অসার বস্তুও আছে। আবিষ্কর্ত্তা যে টুকু আবিষ্কার করেন তাহা তাঁহার নিজেরই কাছে ভাল। তাঁহার সঙ্গীর পক্ষেও সে আবিষ্কারে কিছু অসার বস্তু আছে। আমার মনে হয় বিধাতা যেন প্রত্যেক উলঙ্গ আত্মাকে একটি করিয়া দেহাবরণ দিয়াছেন এবং পৃথিবীর মঙ্গলার্থ তাহাতে এমন কতকগুলি গুণ এবং ক্ষমতার অভ্যাস করিয়া দিয়াছেন যাহা অপর কাহাকেও দান করা যায় না। আত্মার আবরণের উপর রেলওয়ে টিকিটের মত ভগবান যেন লিখিয়া দেন "অপরকে দেওয়া যাইবে না— এই যাত্রার জন্য ইহা উপযুক্ত।" মনের পরস্পর একটা সম্বন্ধ আছে এই কথার একটা জুয়াচুরি আছে। আদানপ্রদানের এত ভাল বিষয় আছে যে আমার ভয় হয় পাছে এক মন আর হইয়া যায়। কিন্তু ব্যষ্টিবিভাগের চিরন্তন নিয়ম এই সময় প্রবল হয়। তাহার বলে তুমি "তুমি" আমি "আমি"। তুমি "আমি" হইবে না—আমি "তুমি" হইব না। সকলে যেমন আছি তেমনিই থাকিব। কেন না স্বভাবের ইহা ইচ্ছা যে যাহা আছে সে তাহাই থাকুক।

তথাপি আমাদিগের মহত্ত্বের প্রভাবকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। উদার বিশ্বাসে কুফল ফলে না। মহত্ত্বের সেবা করি আইস। আমিত্ব ভুলিয়া অন্যে মিশিতে শিখি। পরের খোসামোদ ভুলিয়া যাই। আইস যতটুকু সাহায্য অন্যকে দিতে পারি ততটুকু দিই। অহঙ্কার খাটো করি। গর্ব্ব ত্যাগ করিয়া উপাসনায় মন দি। তবেই মহাত্মা হইতে পৃথক থাকিয়াও তাঁহার মহত্ত্ব শিখিতে পারিব। দেখ জলে কেমন করিয়া একটী পরমাণু ভাসিতেছে, একটী কৃষ্ণবর্ণের ফোটা আসিয়া তাহাতে সংলগ্ন হইল, অমনি তাহা হইতে দুইটী কীটের সৃষ্টি হইল। ইহা অণুবীক্ষণ দেখাইয়াছে। এইরূপ উন্নতিকর বিচ্ছেদ মানসিক রাজ্যেও ঘটিতেছে। শিশুরা মনে করে পিতামাতা ছাড়িয়া তাহারা থাকিতে পারে না। সহসা মৃত্যুর কালো ফোটা আসিয়া বিচ্ছেদ ঘটাইল—তখন শিশুরা বুঝিল যে তাহারা স্বাধীন। মহাত্মার সহিত বিচ্ছেদও এইরূপ।

(৭)

'মহাত্মা'র কথা অধিক চিন্তা করিলেই কতকগুলা অপ্রীতিকর কথা মনে আইসে। মনে হয় যে দুই চারিজন ভাগ্যবানই মহিমা শিখরে আরোহণ করেন—এবং সহস্র সহস্র আত্ম দানের দৃষ্টান্তে, প্রেমে, চিন্তার উৎকর্ষ সাধনে স্বাধীন মত প্রকাশে তাঁহারাই সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হয়েন। সেই কয়জন মহাপুরুষই জন্ম এবং মৃত্যু পবিত্রীকৃত করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে যে দুর্ভাগ্যগণকে তাঁহারা হত্যা করিয়া যান তাহাদের দশায় কি হইবে? জগতে তাহাদের একান্ত স্থুলভত্বই চিরদুঃখের হেতু। আমরা নীচ হইলে যেমন ক্ষতি অন্যে নীচ হইলেও সেইরূপ ক্ষতি—যেহেতু পাঁচ জনকে লইয়াই সমাজবন্ধন।

তথাপি মনুষ্যের শিক্ষা এবং কর্ত্তৃত্বের সীমায় মহাপুরুষের অবস্থান বাঞ্ছনীয়—তবেই নূতন নূতন মহাত্মার আবির্ভাব সম্ভবপর। একাকার মনুষ্যকে দমন করিতে হইবে—তৎপরে তিনি চতুর্দ্দিকে সঙ্গীত এবং বিজ্ঞানের বীজবপন করিবেন। ইহার ফলে স্বাস্থ্য, শস্য, জীব, সকলেরই উন্নতি সাধিত হইবে—এবং প্রেম ও পরোপকারের ক্রম বিকাশ হইতে থাকিবে স্বভাব এই সকল সাধনার মূলমন্ত্র কর্ণে দিয়া মহাপুরুষকে জগতে পাঠাইয়া দেন। মহাপুরুষের জীবনীতে যিনি এই রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারেন তিনিই যথার্থ জীবন চরিত লেখক (১)।

হুগলীর কথা।

টিকটিকির ডিম।

হুগলীর কথাতে আমরা যে সমস্ত বিষয় বিবৃত করিতেছি তাহা আমাদের বিশ্বাস অসত্য ঘটনা নহে। অসত্য নহে বলিয়া প্রচার থাকাতেই আমরা কষ্ট করিয়া সংগ্রহ করিতেছি ও সাধারণ্যে প্রকাশ করিতেছি। ইহার ঐতিহাসিক মূল্য না থাকে নাটক নবেল রোমান্সের মত পাঠ করিতে পারেন। তাৎপর্য্য জ্ঞান থাকিলে সময় নষ্ট হইল বলিয়া পাঠান্তে মনে হইবে না।

(১) Emerson কৃত "Representative Men" অবলম্বনে লিখিত।

ছোট জিনিষের সহিত যদি বড় জিনিষের তুলনা করা সম্ভবপর হয় তবে আমরা আজিকার প্রবন্ধ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব ও লালা বাবুর নাম করিতে পারি। জরা-মৃত্যু-শব-ভিক্ষুক দেখিয়া বুদ্ধদেব বিচলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে প্রবল ঝড়ের তুফান বহিয়াছিল, তাঁহার হৃদয়কে আমূল আলোড়িত করিয়াছিল, তাঁহার হৃদয়ে প্রলয় হইয়াছিল, তাঁহার নৈতিক জীবনে পুনর্জন্ম হইয়াছিল। জরা তুমি দেখিতেছ, আমি দেখিতেছি, মৃত্যুযন্ত্রণা শব কে না দেখিয়াছে—হইতে পারে কাহারও কিছু মাত্র বিকার হয় না, হইতে পারে কাহারও হৃদয়ে ও মনে শ্মশান বৈরাগ্য উপস্থিত হয় কিন্তু বুদ্ধদেবের মত প্রবুদ্ধ হইয়া ক জন দেখে? যে চোখের দেখায় রাজপুত্র রাজ্যত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হয়, ইচ্ছা পূর্ব্বক রাজ-ঐশ্বর্য্য, পুত্র কলত্র ত্যাগ করে আর এই রোগ শোক জরা মরণ শঙ্কুল বিশাল পৃথিবী অরণ্যে একাকী মুষ্টি ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া বিচরণ করিতে সমর্থ হয়, সে চোখের দেখায় কজন দেখিতে জানে? দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বুদ্ধদেব কিন্তু সেই দেখা দেখিয়াছিলেন আর সেইরূপ শোনা লালাবাবু শুনিয়াছিলেন। পাইকপাড়ার রাজা লালা বাবু একদিন অপরাহ্নে বিশ্রাম সুখ সম্ভোগ করিতেছিলেন এমন সময় দ্বারবান ডাকিয়াছিল "মহারাজ উঠিয়ে দিন আথের হুয়া"। লালা বাবু দ্বারবানের কথা শুনিলেন "মহারাজ উঠিয়ে দিন আথের হুয়া"। কথা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—আকুল করিল তাঁর প্রাণ। তিনি ক্ষণকাল মাত্র করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া কি চিন্তা করিলেন তারপর পরিধেয় বস্ত্র খণ্ড মাত্র অবলম্বন করিয়া খিড়কী দ্বার দিয়া বাহির হইয়া রাজপথে গিয়া দাঁড়াইলেন। তীব্র বৈরাগ্য স্রোতে ভাসিয়া গেলেন। সংসার ত্যাগ করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন "দিন আথের হুয়া। তাঁর দ্বারবানের ডাক নহে তাহা ভবপারের কাণ্ডারীর ডাক। আজ যাঁহার কথা বলিব তিনি এইরূপ একজন মহাপুরুষ কি না পাঠক মহাশয় তাহার বিচার করিবেন।

যেখানে কুন্তীনদী পূতসলিলা ভাগিরথী প্রেমে আত্মহারা হইয়াছেন সেইখানে বর্ত্তমান হুগলি থানার অন্তর্গত নয়সরাই বা ন-সরাই গ্রাম। ইহারই নিকট গোপালপুর বলিয়া একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে পাঁচুর

পুত্র জিয়া গাঙ্গুলি "শক্তিখাঁ" নামধেয় এক ব্যক্তি বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের স্ত্রী ব্যতীত সংসারে আর কেহ ছিল না, অধিক বয়সে তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী হয়েন। কিন্তু হরিষে বিষাদ হইল, সূতিকাগারেই জিয়া গাঙ্গুলির স্ত্রীর মৃত্যু হইল। সাত দিনের পুত্র সন্তান রাখিয়া স্বামীকে কান্দাইয়া সতী পরলোকে চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণের বিপদের কথা আর লিখিয়া কি জানান যাইবে পাঠক মহাশয় সহজেই অনুধাবন করিতে পারিবেন। দুই একদিন এইরূপে বিপদে শোকে চিন্তায় কাটিয়া গেল ব্রাহ্মণ পুত্র লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পিঁড়িতে শিশুকে শোয়াইয়া তিনি আকাশ পাতাল ভাবিতেছেন এমন সময় দেখিলেন একটা টিকটিকি দেওয়ালের খুঁটিতে ছুটাছুটি করিতেছে। দেখিতে দেখিতে একটা ডিম বাহির হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল—মৃত্তিকায় পড়িবা মাত্র টিকটিকির ডিমটা ভাঙ্গিয়া গেল। লাল ঝোল মাখা একটা বাচ্ছা বাহির হইয়া ধূলায় মাখামাখি হইল। ব্রাহ্মণ বসিয়া দেখিতেছেন। কিছু কাল পরে ধূলায় ও বায়ুতে লাল ঝোল শুখাইয়া গেল, বাচ্ছা টিকটিকি এদিক্ ওদিক্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বেড়াইতে বেড়াইতে যেমন সুমুখে একটা ক্ষুদি পিঁপ্ড়া দেখিতে পাইল অমনি জিহ্বা বাহির করিয়া তাহাকে উদরস্থ করিল। ব্রাহ্মণের চিন্তার বিরাম হইল তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল, তাঁহার সমস্যা পূরণ হইল। তাঁহার ভাব-চক্ষু ও জ্ঞান-নেত্র খুলিয়া গেল তিনি চক্ষুর পলকে বুঝিলেন যে যিনি শিশু টিকটিকির দেবতা তিনিই তাঁহার শিশুপুত্রের দেবতা। ব্রাহ্মণ হাস্যমুখে উঠিলেন পিঁড়ার উপর শায়িত শিশুকে ঘরে রাখিয়া শিকল দিয়া বৈরাগ্যস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় কোন দেশে চলিয়া গেলেন তাঁহার সংবাদ আর কেহ পাইল না।

এদিকে গোপালপুর গ্রামে একজন গোয়ালার একটী পুত্র সন্তান হইয়াছিল। সে শিশুটি অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। শোকে দুঃখে গোয়ালিনী পাগলের ন্যায় এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে যখন ব্রাহ্মণের বাড়ীর নিকট আসিল তখন দৈবযোগে দ্বার রুদ্ধ গৃহে ব্রাহ্মণ পুত্র চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। গোয়ালিনী জানিত ব্রাহ্মণের স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। অর্গলবদ্ধ ঘরে শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া সে আর থাকিতে পারিল না। ছুটিয়া গিয়া শিশুকে বাহির করিল এবং শান্ত করিবার জন্য স্তন দান আরম্ভ করিল। মনে করিল দুগ্ধভার অনেকটা লাঘব হইবে আর ব্রাহ্মণ না আসা

পর্য্যন্ত শিশুকে রক্ষণাবেক্ষণ করাও হইবে। গোয়ালিনী দ্বারে বসিয়া রহিল, বসিয়া রহিল ত বসিয়া রহিল—আজও রহিল কালও রহিল। ব্রাহ্মণ আর আসিল না তখন সে সন্ধ্যাকালে নিরুপায় হইয়া শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া আপন গৃহে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণ আর ফিরিল না। এদিকে সুতরাং শিশু টিকটিকির দেবতার গুণে মা-হারা শিশু মা পাইল আর পুত্র-হারা জননী পুত্র পাইল। ব্রাহ্মণের লাখরাজ জমী ও কিছু জমার জমীও ছিল। গ্রামের পঞ্চজন ভদ্রলোক গোয়ালাকে সেই জমী দখল করিবার অনুমতি দিল। ব্রাহ্মণের পুত্র এইরূপে নন্দালয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ভগবানের রাজ্যে সামঞ্জস্যের অভাব নাই।

গাঙ্গুলি মহাশয় বীরভূম (তখনকার বীরভূমী) জেলার একটী পর্ব্বত গুহা অবলম্বন করিয়া তীব্র সাধনা আরম্ভ করিলেন। যে ভগবান টিকটিকির শিশু সন্তানের আহার যোগান সেই ভগবানই ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিক আহার যোগাইলেন। ব্রাহ্মণের যথাকালে গুরু মিলিল। ব্রাহ্মণের তীব্র সাধনায় তুষ্টা হইয়া শুভদিনে শুভক্ষণে ব্রাহ্মণকে "বরং বৃণু" বলিয়া জগদম্বা আবির্ভূতা হইলেন, ব্রাহ্মণ কৃতার্থ হইলেন। ব্রাহ্মণ দেবীর কৃপায় সিদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার নাম হইল কামদেব ব্রহ্মচারী। পাঁচু গাঙ্গুলির পুত্র জিয়া গাঙ্গুলির কেন "শক্তি খাঁ" উপাধি ছিল তাহা বলা হয় নাই। তিনি সরকারী কার্য্য করিতেন এবং শক্তিমান ও পারদর্শী পুরুষ বলিয়া ঐ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার বেশ বিষয় সম্পত্তি ছিল এবং ভগবানের কৃপায় তিনি পুত্র সন্তানও লাভ করিয়া ছিলেন। তাঁহার মত অবস্থায় অনেকে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া নূতন সংসার পত্তন করিয়া বসেন। তিনি কিন্তু টিকটিকির ডিমের ব্যাপারে ভগবানের ইঙ্গিত বুঝিয়াছিলেন। তাই চক্ষুর পলকে আপনার ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া যান। যাইবার সময় শিশুর বুকে একখণ্ড কাগজে নিম্নলিখিত শ্লোকটী লিখিয়া রাখিয়া যান।

কাকঃ কৃষ্ণঃ কৃতো যেন হংসঞ্চ ধবলো কৃতঃ।
ময়ূরশ্চিত্রিতো যেন তেন রক্ষা ভবিষ্যতি॥

অর্থাৎ যিনি কাককে কৃষ্ণ বর্ণ করিয়াছেন হংসকে শ্বেতবর্ণ ও ময়ূরকে নানা বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন সেই ভগবানই তোমাকে রক্ষা করিবেন, সেই ভগবানই এই পুত্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই পুত্র উত্তরকালে

লক্ষ্মীকান্ত গাঙ্গুলি নামে বিখ্যাত হন। ইনি যশোরেশ্বর মহারাজ প্রতাপ আদিত্যের সর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনিই হুগলি জেলার বলাগড় থানার অন্তর্গত দীর্ঘগুই গ্রামের বুড়া শিবকে অনেক ভূসম্পত্তি ও পুষ্করিনী দান করিয়াছিলেন। সে সম্পত্তির সমস্ত এখন আর নাই এখনও যাহা আছে তাহা শিবের সেবার জন্য নিয়োজিত আছে। মন্দিরের নিকটবর্ত্তী যে শিবের পুকুর এখনও বর্ত্তমান তাহাও লক্ষ্মীকান্তের দান। যখন হুগলি জেলা ত্যাগ করিয়া মজুমদার হইয়া হালিসহরে উঠিয়া যান তখন এই সব সম্পত্তি শিব সেবায় অর্পণ করিয়া চলিয়া যান। সে কথা পরে বলিব।

কামদেব ব্রহ্মচারী সিদ্ধত্ব লাভ করিয়া ভারত ভ্রমণে বাহির হন এবং নানাদিগ্দেশ ভ্রমণ করিয়া শেষে আপনার পুরাতন আশ্রমে আসিয়া উপনীত হন। তিনি ভ্রমণ কালে বারাণসী ক্ষেত্রে অনেক দিন অবস্থান করিয়া ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার ও সাধু জীবনের কথা চতুর্দ্দিক প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক বড়লোক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন যে সমস্ত বড়লোক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন তাহার মধ্যে রাজা মানসিংহ একজন। এই রাজা মানসিংহ রাজপুতানার রাজপুত। ইঁহারই পিতা ভারমল্ল স্বীয় কন্যাকে আকবরের পুত্র সেলিমের অঙ্কশায়িনী করেন। কেহ কেহ বলেন যে ভারমল্ল ভারত সম্রাটকে ঠকাইয়াছিলেন স্বীয় ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত দুহিতাকে যবন সম্রাটকে সমর্পণ করেন নাই, ঔরষজাত দাসী পুত্রীকে স্বীয় কন্যা বলিয়া দান করেন। সে কথার তর্ক করিয়া আমাদের কোন লাভ নাই। বলিবার উদ্দেশ্য এই যে রাজা মানসিংহ তখন ভারতবর্ষের মধ্যে অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন তাঁহার অধীনে তাঁহার নিজের বিংশ সহস্র রাজপুত অশ্বারোহী সৈন্য ছিল তাহার মধ্যে প্রত্যেকে তাঁহার জন্য প্রাণত্যাগ করিতে পারিত। আকবর ও জাহাঙ্গীর দুই জন ভারত সম্রাটের সময়ই মানসিংহ সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান লোক ছিলেন। যখনই যেখানে বিপদ মানসিংহ যাইয়া উদ্ধার করিবেন। উড়িষ্যার পাঠানেরা তিন বার বিদ্রোহী হইল মানসিংহ তাহাদিগকে সমরে পরাজিত করিলেন, কুচবিহারের রাজাকে রক্ষা করিতে হইবে—যাইবেন মানসিংহ প্রতাপ আদিত্যকে তথা পর্ত্তুগিজ জলদস্যু মাঙ্গোলিনকে, তথা আরাকানে

রাজপুত্র অনুপরামকে দমন করিতে হইবে মানসিংহের সাহায্য চাই দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিতে হইবে যাও মানসিংহকে বল। এইরূপে মানসিংহ সর্ব্বে সর্ব্বা ছিলেন। জাহাঙ্গীর যদিও তাঁহাকে বক্র নয়নে দর্শন করিতেন তথাপি প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারিতেন না। এই রাজা মানসিংহ কামদেব ব্রহ্মচারীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

যখন বীরভূমির একপ্রান্তে পর্ব্বতময় স্থানে এক পর্ব্বতের সানু দেশে তমাল বনের একান্ত ছায়ায় কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া কখনও কুটীরে কখনও গুহায় থাকিয়া, বিরলে বিজনে গাঙ্গুলি ব্রাহ্মণ লীলাময়ী জগদম্বার সেবা নিরত থাকিয়া মানসে তাঁহার লীলা দর্শন করিতেছিলেন তখন রাজা মানসিংহ দিল্লীর সম্রাটের আজ্ঞায় বঙ্গদেশে আসিয়া সেই লীলাময়ী জগদম্বারই উদ্ভ্রান্ত তাণ্ডবনৃত্য প্রকাশ্যে দর্শন করিতেছিলেন। বঙ্গদেশে তখন নিত্য বিপদ, নিত্য যুদ্ধ নিত্য লুট নিত্য উৎপাত লোকে ছারে খারে যাইতে বসিয়াছিল। কুচবিহারে বিদ্রোহ জয়ন্তি পাহাড়ে বিদ্রোহ, উড়িষ্যার পাঠানদের বিদ্রোহ, প্রতাপ আদিত্যের স্বাধীনতা ঘোষণা, পর্ত্তুগিজ জলদস্যুর অত্যাচার আরাকাণ রাজপুত্রের অত্যাচার। পাঠানেরা তাঁহাকে একেবারে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। বার বার বঙ্গদেশ লুট করিতে লাগিল। তখনও সপ্তগ্রাম সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল তাহারা সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত লুট করিয়া চলিয়া গেল উত্তরকালে যেরূপ বর্গীর হাঙ্গামা ও লুট হইয়াছিল পাঠানেরা উড়িষ্যা হইতে আসিয়া তদ্রূপই করিতেছিল মানসিংহ পাঠানদিগের দৌরাত্ম্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কখন তাহারা কোন পথ দিয়া আসিবে তাহা তিনি ঠিক করিতে পারিতেন না সুতরাং লুণ্ঠন নিবারণ অসাধ্য হইত। দিল্লীর বাদসাহ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিরক্ত হইলেন মানসিংহের মান রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিল। তিনি তখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া দৈববল আশ্রয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারই একজন সেনাপতি কামদেব ব্রহ্মচারীর বিষয় অবগত ছিলেন তিনি কার্য্যোপলক্ষে অনেক দিন ব্রহ্মচারীর আশ্রমের নিকট থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মচারীর অলৌকিক শক্তির কথা জ্ঞাত হইয়াছিলেন। তিনি রাজমহলে মানসিংহের নিকট ব্রহ্মচারীর বিষয় গল্প করিয়াছিলেন। এক্ষণে মানসিংহ ব্রহ্মচারীকে রাজমহলে

লইয়া যাইবার জন্য একজন সেনাপতিকে পাঠাইয়া দিলেন। সেনাপতির অনুচরেরা আশ্রমের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে অত্যাচার করায় এবং সেনাপতির অবিমৃষ্যকারিতাদোষে সমস্তই পণ্ড হইল। ব্রহ্মচারী বলিলেন যে তিনি কাহারও প্রজা নহেন তিনি ভগবানের প্রজা বঙ্গের শাসনকর্ত্তার বা দিল্লীর বাদসাহের নিকট তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই এবং তিনি যাইবেনও না। সেনাপতি ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। পরে কিন্তু কামদেব ব্রহ্মচারী মানসিংহকে কৃপা করেন। সে সব কথা খুলিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। কামদেব ব্রহ্মচারী কৃপা করিয়া মানসিংহকে বলিয়া দেন যে অমুক দিন অমুক সময়ে অমুক পথ দিয়া শত্রুরা আগমন করিবে ও তাহাদের বল এইরূপ। সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া মানসিংহ সৈন্য চালনা করিলেন এবং অচিরে ফল প্রাপ্ত হইলেন। শত্রুরা তাঁহার নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল ও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। এই ব্রহ্মচারীর কৃপায় মানসিংহ অনেকবার বিপন্মুক্ত হয়েন অনেকবার তাঁহার জীবন সংশয় পর্য্যন্ত হইয়াছিল কিন্তু তিনি সাধুর কৃপাবলে বাঁচিয়া যান পরে তিনি কামদেব ব্রহ্মচারীর পদে আত্ম সমর্পণ করেন ও তাঁহার শিষ্য শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হয়েন। কামদেবের পূর্ব্ব ইতিহাস অবগত হইয়া তিনি তাঁহার পুত্রের অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পুত্র তখন যশোর অধিপতি প্রতাপ আদিত্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী। গুরুপুত্র প্রতাপ আদিত্যের দলে থাকায় প্রতাপ আদিত্যকে দমন করাও তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়াছিল। তখন তিনি শূদ্রমুনি জয়ানন্দের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। এই জয়ানন্দ বাঁশবেড়িয়া রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ ইঁহারই সাহায্যে অনেক অনুসন্ধানের পর তিনি কালীঘাটে কামদেব পুত্র লক্ষ্মীকান্তের সাক্ষাৎ পান। মানসিংহ শক্তি উপাসক ছিলেন এবং তিন জন শক্তি উপাসককে বাদসাহের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে মজুমদার অর্থাৎ কর সংগ্রহকারী নিযুক্ত করিলেন। ভবানন্দ কানুন গো, লক্ষ্মীকান্ত ও জয়ানন্দ এইরূপে বাদসাহের তরফ "মজুমদার" অর্থাৎ করসংগ্রহকারী নিযুক্ত হইলেন। মানসিংহের অনুরোধে বাদসাহ তাঁহাদিগকে মজুমদার উপাধি দিয়া বঙ্গদেশে অনেক জায়গীর প্রদান করেন। বাঙ্গালায় এইরূপে তিনজন শাক্ত বড়লোক হইলেন। ভবানন্দ মজুমদার কৃষ্ণনগর রাজপুরুষদের আদি পুরুষ, জয়ানন্দ

বাঁশবেড়িয়া রাজবংশের ও সেওড়াপুলি বংশের আদিপুরুষ এবং লক্ষ্মীকান্ত সাবর্ণ চৌধুরী মহাশয়গণের আদিপুরুষ। দেবী কৃষ্ণনগরে রহিলেন, আনন্দময়ীরূপে, জয়ানন্দের বংশধরগণের জন্য রহিলেন, বাঁশবেড়িয়ায় হংসেশ্বরী ও সেওড়াফুলিতে নিস্তারিণীরূপে এবং সাবর্ণ চৌধুরী মহাশয়গণের বংশধরগণের জন্য রহিলেন, কালীঘাটের কালীরূপে। জয়ানন্দ ও ভবানন্দের কথা অদ্য আমরা বলিব না। আমরা অদ্য কেবল কামদের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার ও তৎবংশধরগণের কথাই বলিব। মানসিংহ যখন লক্ষ্মীকান্তকে বাদসাহের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে জায়গীর প্রদান করিলেন, তখন লক্ষ্মীকান্ত গোপালপুর হইতে উঠিয়া স্বীয় জায়গীর ২৪ পরগণার অন্তর্গত হালিসহরে গিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। গোপালপুর হইতে উঠিয়া যাইবার সময়ই হুগলি জেলার সম্পত্তি লক্ষ্মীকান্ত দীর্ঘশুই গ্রামের বুড়া শিবকে দান করিয়া যান এবং এখনও সেই বুড়া শিব ও কতক সম্পত্তি বর্ত্তমান। লক্ষ্মীকান্তকে যখন রাজধানীতে লইয়া যাওয়া হয় তখন লক্ষ্মীকান্ত কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, কেন তাঁহাকে সহসা নবাবের লোকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে তবে এটা বুঝিয়াছিলেন যে যথেষ্ট মান সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইতেছে। তখন মানসিংহ ও কামদেব রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন। কামদেব দূর হইতে পুত্রকে দেখিলেন মাত্র আলাপ পর্য্যন্ত করিলেন না, নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলেন। এ দিকে লক্ষ্মীকান্ত নিজ মুখে আপনার ইতিহাস বর্ণনা করিলেন। সন্দেহ একেবারে দূর হইল। মানসিংহ পরে মহাসমারোহে বাদসাহ কর্ত্তৃক জায়গীর দান করাইয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। পরগণা মাগুরা, খানপুর, কলিকাতা, পাইকান, হাবেলী সহর, আমরপুর, হাতিগড় লক্ষ্মীকান্তকে জায়গীর স্বরূপ প্রদত্ত হইল। এই সকল পরগণার অধিকাংশ লক্ষ্মীকান্তের বংশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ও ছিল। ১৭৮৮ সালের ২৪শে জুলাই তারিখের কার্য্যবিবরণীতে এই বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলাই বাহুল্য তখন লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল।

সাবর্ণ চৌধুরীগণ এক্ষণে হালিসহর পাণিহাটি ও বড়িশা বেহালা গ্রামে প্রধানত বাস করেন। ইঁহাদের উপাধি এক্ষণে হইতেছে "রায় চৌধুরী"। কি করিয়া এই উপাধি হইল—রায় মজুমদার ঘুচিয়া রায় চৌধুরী হইল—

সে সম্বন্ধে কিছু বলা উচিৎ। লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের সাত পুত্র। তন্মধ্যে
রাম রায় জ্যেষ্ঠ। রাম রায়ের ৩ পুত্র তন্মধ্যে কনিষ্ঠ জগদীশ, জগদীশের
জ্যেষ্ঠ পুত্র বিদ্যাধর। ইনি নর-পর্ব্বত ছিলেন, যেমন ভীমকায় তেমনি বর্ণ
যেন কাঁচা সোণা তেমনই বল তেমনই আহার। ইঁহার বসিবার পিঁড়িখানা
অদ্যাপি হালিসহরে আছে। ইঁহার আহারের থালাখানাও আছে, ঠিক যেন
ভীমের উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম যেন মহা নৈবেদ্যের বড় বারকোশ এত বড়
থালা। ইঁহার আহার ও পিঁড়া ও থালার সহিত তালে ঠিক ছিল। সদ্যো-
জাত হৈয়ঙ্গবীণ ভিন্ন দেবসেবা ও তাঁহার আহার হইত না। ইনি পরের
দুঃখে দুঃখী ছিলেন এবং প্রাতঃকালে উঠিয়া পাড়ার চারিদিকে ঘুরিয়া উপ-
বাসীকে আহার দিতেন, রোগীকে ঔষধ ও পথ্য দিতেন, নিরন্নকে অন্ন ও
বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতেন। যাহাহৌক তিনি ক্রমে সময়ে নবাবের রাজস্ব
দিতে পারিলেন না। তথম যেমন হইত রাজস্ব বাকি পড়ায় তাঁহাকে
নবাবের লোক ধরিয়া লইয়া গেল। সেথানে রাজস্ব দিতে না পারায় তিনি
নবাব সরকারে নজরবন্দী কয়েদে রহিলেন। দিন কয়েক পর নবাবের এক
জন কর্ম্মচারী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেথিল যে তিনি
অত্যন্ত কৃশ হইয়া গিয়াছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বিদ্যাধর রায় বলেন
যে না থাইতে পাইয়া তিনি দিন দিন রোগা হইয়া যাইতেছেন। কর্ম্মচারী
তাহাতে রাগ করিয়া বলেন "এ বড় বেয়াদবী—নবাব সরকারে আপনি
থাইতে পান না, এমন কথা আপনি বলেন।" বিদ্যাধর বলিলেন, হাঁ বলি।
কর্ম্মচারী আরও চমৎকৃত হইয়া বলিল "আপনার জন্য যে ছোলা আসে
তাহা কি হয়?" সহাস্যে বিদ্যাধর বলিল "আমার পাখী থায়।"

"দুগ্ধ?"

বিড়ালে থায়।

কর্ম্মচারীর আর সহ্য হইল না। বলিলেন "আমি এখনই এই কথা
নবাবকে বলিব আপনি কত থাইতে পারেন দেখা যাইবে।" তিনি আরও
বলিলেন "নবাবের খাদ্য আপনি থাইতে পারিবেন?" বিদ্যাধর বলিলেন—
অখাদ্য থাই না—থাব না সুথাদ্য হইলে ও যদি নিজে পাক করিতে পাই
তবে বোধ হয় নবাবের পাচ ছয় গুণ বেশী থাইতে পারি।

কথা নবাবের কানে উঠিল। তথনই বন্দোবস্ত হইল। দুইটা খাসীর

মাংস ব্রাহ্মণে একজন একেবারে প্রস্তুত করিয়া দিল। বিদ্যাধর বীর কোচা
বাঁধিয়া রন্ধনে বসিলেন। রন্ধন সমাপ্ত হইলে অন্নব্যঞ্জন ও থাসীর মাংস
লইয়া থাইতে বসিলেন। ভীমের আহার, অন্নস্তূপ ও থাসীর মাংস স্তূপ
অবলীলাক্রমে বিদ্যাধরের উদররূপ মহাগহ্বরে নীত হইল। লোকে দেখিয়া
অবাক্। নবাব ঠিক বুঝিলেন বিদ্যাধর কিরূপ থাইয়ে লোক। হায় রে
সেকালের লোক—কি হিন্দু কি মুসলমান কি ফিরিঙ্গী সকলেরই প্রাণ ছিল—
ভাব ছিল—রসিকতা ছিল। এথনকার মত কথায় কথায় মান—অপমান—
ডিফামেশন ছিল না; গোমড়ামুথ, পেচকের দৃষ্টি, ও বিড়ালের স্বাতন্ত্র্য ও
ঘড়ঘড় ছিল না। নবাব মহা খুসী হইলেন, বিদ্যাধর ওরূপ থাইতে পারে
শুনিয়া তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি তথনই কর্ম্ম-
চারিদের ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন "ইঁহাকে এথনই ছাড়িয়া দাও—ইনি ত
থাইয়া ফতুর, উনি আমার অপেক্ষা বেশী খান ভাল থান—ইনি কোথা
হইতে থাজনা দিবেন? ইঁহার যাহাতে স্বচ্ছন্দে চলে অর্থাৎ আহার চলে
এমন উপায় করিয়া দাও—দুইটা পরগণা জায়গীর দাও। এই থাসী থাওয়া
স্মরণ করিবার জন্য বিদ্যাধরের উপাধি হইল "রায় চোধুরী" আর যে দুইটা
পরগণার জায়গীর দেওয়া যাইবে তাহার নাম হইবে থাসী-থাওয়া পরগণা।
নবাব এইরূপে রায়ের উপর চোধুরী লাগাইয়া উপাধিতে ভূষিত করিয়া ও
জায়গীর দান করিয়া ও বাকীপড়া রাজস্ব মাফ করিয়া পরম সমাদরে বিদায়
দিলেন। এথনকার দিনে কেবল ভূয়ো টাইটেল দান—তথনকার দিনে
সেরূপ ছিল না। থাসী খাওয়ার জন্য দুইটা পরগণার জায়গীর দান যেমন
নবাব তেমনই প্রাণ তেমনই দান তেমনই দানের পাত্র। যেন মণিকাঞ্চন
যোগ। হায়রে সেকাল আর হায়রে একাল। যাহাহৌক পাঠক মহাশয়
শুনিয়া বিস্মিত হইবেন না—এথনও রায় চৌধুরীদের থাসী-থাওয়া পরগণার
কতকাংশ বর্ত্তমান আছে। একটির নাম মাগুরা আর একটির নাম ভুলিয়া
যাইতেছি।

নবাব বিদ্যাধরকে ধরিয়া লইবার যে কারণ, আমরা নির্দ্দেশ করিলাম
কোন কোন লেথকের মতে তাহা ঠিক নহে। তাঁহাদের মতে এই কারণ
বিদ্যাধরের বৃটিস প্রেম। সুতানুটি গোবিন্দপুর কলিকাতা, লক্ষ্মীকান্ত
মজুমদার জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে যে জায়গীর প্রাপ্ত হয়েন তাহার অন্তর্গত

ছিল। বিদ্যাধর সুতানুটিতে ইংরাজদিগকে অবস্থান করিবার অনুমতি দেন। তাঁহার নিজের কাছারী বাড়ীটী পর্য্যন্ত ইংরেজদিগকে মহাফেজখানা করিবার জন্য ছাড়িয়া দেন। তাঁহার গোমস্তা আণ্টুনি সাহেবের সহিত জব চার্ণক সাহেবের ঝগড়া হইলে আণ্টুনি সাহেবকে স্থানান্তরিত করেন। কথার পিঠে কথা বলিয়া যাই এই আণ্টুনি সাহেব কবিওয়ালা আণ্টুনি সাহেবের পিতামহ। এই সমস্ত কারণে নবাব একটা ছল করিয়া বিদ্যাধরকে ধরিয়া লইয়া যান। সে যাহাহৌক পরে লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের বংশধরগণ সুতানুটি গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিন গ্রাম ইংরেজ কোম্পানিকে বিক্রয় করেন। তাঁহারা যে নবাবের উপর বিরক্ত হইয়াই বিক্রয় করেন তাহা বেশ বুঝা যায় কেন না ১৩০০৲ টাকা লইয়া এই তিন গ্রাম বিক্রয় করেন। বিদ্যাধরের পুত্র রামচাঁদ, মনচোরা দেব, (ভ্রাতুষ্পুত্র), লক্ষ্মীকান্তের দ্বিতীয়পুত্র গৌরী রায়ের বংশধর মনোহর, রামচন্দ্র ও প্রাণরায় মিলিয়া ইংরেজ কোম্পানিকে ঐ তিন গ্রাম বিক্রয় করেন, এই বিক্রয়ের জন্য নবাব সাবর্ণ চৌধুরীদের উপর হাড়ে চটিয়া যান তিনি ইংরেজদিগকে ফার্ম্মান দিব বলিয়া ক্রমাগত বিলম্ব করিতেছিলেন ও দফায় দফায় হাজার হাজার টাকা লইতেছিলেন, কখনও ৩৫০০০ কখন ৫০০০০ আর বলিতে ছিলেন জায়গিরদার বিক্রয় করিলেই হইল আমার কোন আপত্তি নাই। নবাবের ইচ্ছা ছিল জায়গীরদার বিক্রয় না করেন। কোন ছলে বিলম্ব করেন, তাহা হইলে তাঁহার টাকা আদায়ের বিলক্ষণ সুবিধা হইবে কিন্তু যখন চৌধুরী মহাশয়গণ বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন তখন তাঁহার ভয়ানক রাগ হইল কেন না কামধেনুরূপ কোম্পানিকে দোহন বন্ধ হইয়া গেল।

জায়গীরদার জমীদার নিম্নলিখিত মত রাজস্ব দিতেন—

	টাকা	আনা	পাই
ডিহি কলিকাতা	৪৬৮	৯	৯
সুতানুটি	৫০১	১৫	৬
গোবিন্দপুর (পং পাইকান)	১২৩	১৫	৩
গোবিন্দপুর (পং কলিকাতা)	১০০	৫	১১

নবাব বিক্রয়ের পরই পাইকান পরগণার গোবিন্দপুরের রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। ১২৩-১৫-৩ স্থানে বৃদ্ধি হইয়া ২১০॥/০ হইল।

"কালীক্ষেত্র দীপিকা" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে লক্ষ্মীকান্তের বংশধরেরা কালীঘাটের কালীর আবির্ভাব করেন। কিন্তু এ কথন অপর লেখকেরা স্বীকার করেন নাই। তবে কিম্বদন্তীমূলে এটুকু জানা গিয়াছে যে কামদেব ব্রহ্মচারীও কালীঘাটের কালীমন্দিরের উত্তরে পঞ্চবটী প্রস্তুত করিয়া কিছু দিন তথা অবস্থান করিতেন। এই স্থান এখন "ফকিরের স্থান" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বিদ্যাধর রায়ের বংশধরগণের মধ্যে অনেকে বর্ত্তমান আছেন। হুগলি আদালতের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী একজন। ইঁহারা চারি সহোদর। তন্মধ্যে অতুলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী একজন। অতুলকৃষ্ণ হুগলি কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এম, এ, দিয়া কৃষিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া ইনি বিলাত গমন করেন। সেথানে সিসিটার (cirencester) কালেজে শিক্ষা লাভ করিয়া এখানে ফিরিয়া আসিয়া দিনকত শিক্ষা বিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন, কটক কলেজে ছিলেন। ইনি এক্ষণে হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট। গত ১৯০১ সালের লোকসংখ্যা কার্য্যে ইনি বড়পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি কলিকাতার ইতিহাস সংক্ষেপে লিখিয়াছেন ও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। (See Census of India, 1901, Volume VII Part I.) টিকটিকির ডিমের বৃত্তান্ত ইনি লিখিতে ভুলেন নাই।

Jiya Ganguli was the heir of Panchu Ganguli, who had obtained the title of 'Sakti Khan', as an officer of the State. Jiya was therefore a man of substance. His wife died at childbirth and he sat by the dead body of his wife, contemplating the future of the babe. Suddenly the egg of a lizard dropped from the ceiling and broke. A little lizard straggled out of the slime and lay still for a while apparently dead. At this very juncture, there crawled up to it a little ant and the lizard fell upon it. Jiya saw in this divine dispensation.

ভগবানের অপার মহিমা। একটা টিকটিকির ডিমের মধ্যে কত ইতিহাস।

প্রণয় যজ্ঞ।

(১)

মুগ্ধ করিয়াছ মম নিখিল হৃদয়
বচন ভঙ্গিতে তব ; ওগো প্রিয়তম !
বিতরণ করিয়াছ স্বর্গসুধাসম
সঙ্গীত-লহরী নিত্য নবাবেশময়।
আজো সে লহরী-লীলা উঠে গো জাগিয়া
মরমের আশে পাশে,—আজো তব গান
আনে কত বিস্মৃত কাহিনী ;—মোর প্রাণ
চাহে গো রহিতে নিত্য তোমাতে মিশিয়া।
কে জানে কেন এ পোড়া অন্তর আমার
চাহে সেই অতীতের পানে,—বিলোম বাত্যায়
রথের পতাকা যথা পাছু ফিরে চায়।
সে অন্ধ আনন্দ রাশি মিলিবে কি আর ?
অতীতের দেব আজি দানব হইয়া
সে উজ্জ্বল চিত্রে মসী দিয়াছে লেপিয়া।

(২)

জানিতাম—এ জীবনে হবে না বিচ্ছেদ
সখ্যতা-গগণে নিত্য উঠিব দুজনে
সমুজ্জ্বল তারকার মত—ভেদাভেদ
মুহূর্ত্তেক তরে কারো উঠিবেনা মনে।
জানিতাম মনে—কভু যদি উঠে দ্বন্দ্ব
বজ্র হুহুঙ্কারে—বরষি' নয়নাসার
দিব নিবাইয়ে ;—মালিন্য মেঘের ছন্দ
হাসিতে উজ্জ্বল হবে মুখে দুজনার।
স্বার্থের সঙ্ঘাৎ যদি (জানিতাম মনে)
নিপীড়িত করে সখা হৃদয় দোঁহার—

প্রেম পুণ্য উভয়ের হবে খড়্গাকার
স্বার্থে দিতে বলিদান প্রেমের চরণে।
হা ভাগ্য নিষ্ঠুর! সব হ'ল বিপরীত—
স্বার্থ এল প্রেমে বিশ্বে শিখাইতে হিত।

(৩)

যে মুখে দু'দিন পূর্ব্বে মোর যশোগান
উচ্ছ্বসি উঠিত সখা সমুদ্র সমান
আনন্দের স্ফীত ফেন বহি'—যে কীর্ত্তনে
প্রীতির উজ্জ্বল রশ্মি জাগিত নয়নে—
সেই মুখে—সেই চোখে কহ হে কেমনে
জাগিল নির্ম্মম নিন্দা—হিংসার কালিমা ?
একা স্বার্থ সিদ্ধি কি হে জগতের সীমা ?
পুণ্য-প্রেম বলি দিলে স্বার্থের চরণে!
এখনো নেহারি হাসি ও অধর-তটে
তব পূর্ব্ব সখারে হেরিয়া। নাহি তাহে
সে মাধুরী আর। সখা! কলঙ্কিনী চাহে
আনিতে সাধুর হাসি।—কার হৃদিপটে
পড়িবে তাহার রশ্মি সতীর যেমন ?
চিরদিন নাহি রহে মিথ্যা আবরণ।

(৪)

ভালত' বেসেছ বহু।—আমার নয়নে
নেহারিয়া অশ্রুবিন্দু করেছ রোদন—
এই কি হে শেষ পরিণাম ? জানি মনে—
দেখিলে আমার ভ্রান্তি করিবে শোধন
মধুর বচনে তুমি। ভুলি' সাধুতায়
উল্লাসে কীর্ত্তন কর তাহা। ভাবি তাই
জগতের কুহেলিকা—ভাবি হেথা নাই—
সত্যের কণিকা। হেথা স্বার্থের শিখায়

বন্ধুত্বের ঘৃতাহুতিদানে, সিদ্ধি আসে
যজ্ঞফলে, কাম্য লয়ে যাজ্ঞিকের বাসে।
ধন্য অগ্নি!—ধন্য হবিঃ—ধন্য সেই তন্ত্র!
পূজার পদ্ধতি ধন্য!—সেই গুপ্ত মন্ত্র
একা ধন্য এ পৃথিবীতলে। হে যাজ্ঞিক!
মিথ্যা এ জগতে তুমি একাই প্রেমিক।

জাতিভেদ।

জাতিভেদ সম্বন্ধে আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্দোলন চলি-
তেছে। দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদিগের হৃদয়ে এ তর্কের উৎপত্তি কোন
বিস্ময়ের হেতু নহে এবং আমার বিবেচনায় এ সম্বন্ধে আমরা যে যাহা বুঝি
তাহা সাধারণের সমীপে উপস্থিত করাই কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষে যে প্রকারের বর্ণভেদ আছে তাহা পর্য্যাপ্তরূপে কোন ব্যক্তি
অবগত নহেন। কিরূপে এই লক্ষ প্রকারের ভেদ উপজাত হইয়াছে, তাহার
কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলন করাও সহজ
ব্যাপার নহে। পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমান শাসনকালে, বর্ণ বৃদ্ধি রোধের কোন
চেষ্টা ছিল বলিয়া জানা যায় না। বর্ণ বৃদ্ধিতে যে অনিষ্ট আছে, লোকে
বোধ হয় ইহাও ভাবিত না; কিন্তু তখন সমাজে অপরাধীর বিচার ও দণ্ড
বিধানের প্রথা ছিল, প্রত্যেক বর্ণের স্বজাতির প্রধানেরা এখনও কিয়ৎ পরি-
মাণে এই শক্তির পরিচালনা করিয়া থাকেন। অতএব কর্ম্মদোষে পতিত
এবং পরিত্যক্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা বর্ণান্তরের সৃজন হওয়া সম্ভব। ইহা অনু-
মান মাত্র, এই ভেদের যথাযথ হেতু আমাদিগের দ্বারা নির্দ্দেশ হওয়া সম্ভব
বলিয়া বোধ হয় না। যাহারা ব্রাহ্মণকে কি কোন রাজা বা রাজবংশকে
এই অনন্ত ভেদের হেতু স্বরূপ নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা যে ভ্রান্ত তাহা বিচার
দৃষ্টির দ্বারা নখদর্পণে দেখিতে পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল নানাপ্রকার জ্ঞাত
অজ্ঞাত হেতু আশ্রয় করিয়া এই বিস্তারিত ভেদরাশি স্তূপীকৃতভাবে আমা-
দিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। এই ভেদ ভারতবর্ষীয় মহাজাতির সব-

প্রধান ব্যাধি বলিয়া ইহার নিয়োগ এক্ষণে সকলেরই অভিপ্সিত হইয়া
উঠিয়াছে। কিন্তু যে ব্যাধির চিকিৎসার প্রয়োজন, প্রথমে তাহার কি রূপ
নির্ণয় হওয়া দরকার। বঙ্গবাসীগণ কি প্রকার ব্যাধির দ্বারা পীড়িত; কি
রোগের সঞ্চার নিদ্রা যাইতে পারিতেছে না, কি রোগে মধ্য ভারতবাসীদিগের
অন্নজল পরিপাক হইতেছে না, কি রোগে বোম্বাইবাসীরা কঙ্কালীভূত
হইয়াছে, কি রোগে মাদ্রাজীদিগের মুখশ্রীতে কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে,
কি রোগে শিখ ও রোহিলাগণ সহাস্য মুখদ্যুতি পরিত্যাগ করিয়াছে,
তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্দেশ হওয়া আবশ্যক। যদি তোমাদিগের
শুনিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, রাজানুগ্রহে এখন রেলের দ্বারা সর্ব্বত্র
গতিবিধি করা যায়, রাজার কৃপায় এক্ষণে সকল দেশের লোকের সহিত
আলাপ করা যায়। দুর্ভিক্ষে দেশ কাতর হইয়া থাকিলেও অশান্তি নাই।
দস্যুভয় নাই—দেখিবার, শুনিবার, জানিবার দ্বার এরূপভাবে উদ্ঘাটিত
হইয়াছে যে এই বিরাট জাতির যে কোন বর্ণের শ্রেণীর বা ধর্ম্মের আচার
ব্যবহার সম্বন্ধীয় কোন কৌতূহলই তোমাদিগের অতৃপ্ত থাকিবার সম্ভাবনা
নাই। রাশিরাশি প্রয়োজনীয় সংবাদ তোমরা ইচ্ছা করিলেই পাইতে পার।
তোমরা ইঙ্গিত করিলে ভূরি ভূরি স্বস্ব বর্ণীগণের কথিত লিখিত বৃত্তান্ত
তোমাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। তোমরাই ইহা
করিতে সক্ষম, কোন প্রকারে পরের মুখের অপেক্ষা করিয়া থাকার এবং
ইহার ব্যয়ের জন্যও কোন কষ্ট পাইবার আশঙ্কা নাই। কার্য্য কথনও
কর্ম্মীকে খুঁজিয়া লয় না, কর্ম্মীই কাজের অনুসন্ধান করিয়া থাকে। যতক্ষণ
সুযোগ থাকে, কার্য্যও ততক্ষণ বিদ্যমান থাকে; সুযোগ চলিয়া
গেলে কার্য্যও কর্ম্মীর মুখে পদাঘাত করিয়া চলিয়া যায়। পূর্ব্ব
কথিত বিষয় যদি কার্য্য বলিয়া বোধ হয় তবে এই বিষয় আমাদের উদ্যোগ
করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয় সংগৃহীত হইলে বিষয়ের
অন্তস্তল পর্য্যন্ত পর্য্যাবেক্ষণ করিয়া অনুসরণীয় নীতির অবধারণ করিবে কে?
বিগত লোকগণনার উপলক্ষে বৈদ্য কায়স্থ পদটী নির্ণয়ের সমস্যার সামঞ্জস্য
বৃদ্ধি বিষয়ে আমরা কিরূপ দীন তাহা পরিলক্ষিত হইয়াছে। বহুদিন হইতে
ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যের সূচনা হইয়াছে। তদবধি এ ভূমিতে অন্য মনুষ্য
জন্মগ্রহণ করিতেছে না। ঋষিপ্রবর শাণ্ডিল্য ভরদ্বাজ দক্ষের বংশে নির্ম্মল

চন্দ্র সূর্য্যের বংশে ও বীরপ্রবর আকবার শিবজী প্রতাপ সিংহ প্রতাপাদিত্য,
হাইদার আলী ও রণজিৎ সিংহের বংশে এক্ষণ কেবল অকর্ম্মণ্য লোক
জন্মিতেছে। ইঁহাদিগের নিজের সম্মান জ্ঞান নাই, পিতৃপুরুষদিগের গৌরব
স্মরণ নাই, স্বজাতি স্বদেশীর প্রতি মমতা নাই একেবারে যেন বিষ হারা-
ইয়া ঢোঁড়া হইয়া গিয়াছে, কেহ বিশেষ নিয়ম বদ্ধ গোষ্পদ ভূমির অধিপতি
হইয়া আপনাকে সম্রাট জ্ঞান করিতেছে। কেহ অন্নাভাবে প্রতিবাসীর অন্ন
কাড়িয়া খাইবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কালের লক্ষণের দিকে একবারও
চাহিয়া দেখিতেছে না যাহারা চরিত্রবান লোক নহে তাহাদিগের কার্য্য-
কারিতা-শক্তি হইতে পারে না। আমাদের দেশে এক্ষণ প্রধানগণের চরিত্র
নানাবিধ। এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহাদিগকে শিক্ষার বিমল আলোক
সহকারে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বলিলেও বলা যায় কিন্তু তাঁহারা ভারতবর্ষে হিন্দু
মুসলমান নামে কোন সমাজ আছে বলিয়া স্বীকার করেন না, সেই সমাজে
প্রবেশ করা তাহাদিগের পক্ষে কারাগৃহ প্রবেশের ন্যায় ঘৃণ্য। তাঁহারা
বহ্নির ন্যায় সর্ব্বভোজী ও সমুদ্রের ন্যায় সর্ব্বপায়ী হইয়াও কেহ সবর্ণ বিবাহের
পোষক, কেহ নমাজ ও দেবপূজার পক্ষপাতী। কেহ য়ুরোপীয় আইনের
পাণিগ্রহণ করিয়া স্বজাতিকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য ব্যস্ত, কেহ চিত্তের
উদারতার প্রভাবে শ্বেত পুরুষের করে কন্যা সমর্পণ করিয়াছেন। কেহ
পুত্রকে য়ুরোপীয়্যান ব্রিটিস সবজেক্ট করিবার অভিপ্রায়ে, স্ত্রীকে প্রসবের
জন্য বিলাত পাঠাইতেছেন; কেহ বা পরাধীনতা নিতান্ত অসহ্য হওয়াতে
দূর স্বাধীন দেশে বাসস্থান স্থির করিয়া দ্বৈপায়ন হ্রদে দুর্য্যোধনের ন্যায়
স্বাধীনতার নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতেছেন। এই সকল আচার ভ্রষ্টের
মধ্যে, কেহ কেহ শাস্ত্রের নিকট মস্তক অবনত করা অগৌরব বিবেচনা
করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিতেছেন না, কেহ প্রায়শ্চিত্তের প্রসঙ্গ অবজ্ঞা
সূচক মনে করিতেছেন। কেহ বা মনে মনে ভারতের ভবিষ্য জাতির
আদর্শপুরুষ হইয়া নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বদেশকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে
অচলের ন্যায় সুদূরে অবস্থান করিতেছেন।

কিছু দিনের জন্য শিক্ষোপলক্ষে পাশ্চাত্য ভূমিতে পদার্পণ করিয়া কেহ
কেহ এইরূপ ধারণা লইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন যে এ দেশের অশন বসন
আর তাহাদিগের মনঃপূত হয় না, তাহারা ধুতি চাদর পরিতে পারেন না,

পীড়িতে বসিয়া হস্তের দ্বারা অন্নাদি গ্রহণ করিতে পারেন না, কাহারও
কাহার এদেশের পাকপ্রণালীও অগ্রাহ্য। তাঁহারা বস্ত্র পরিহিত পিতা
মাতাকে দেখিয়া ঘৃণা সম্বরণ করিতে পারেন না এবং সাধারণ স্বদেশীদিগকে
কুক্কুর শৃগালের ন্যায় অবলোকন করেন। এই সকল ব্যক্তিগণের স্মরণ করা
কর্ত্তব্য যে ইহারা আমাদিগের স্বজন হইয়া ইন্দ্রালয়ের পাদস্পর্শগুণে যদি
আমাদিগকে এতই অবহেলা করেন তবে যাহারা সেই ইন্দ্রালয়ের অধীশ্বর
জাতি, তাঁহারা আমাদিগকে কিরূপ সম্মান করিবে? যে চসমা চক্ষে দিলে
জনক জননীকে কপির ন্যায় দেখায়, সে চসমা চক্ষে দেওয়া কৃতী পুত্রের
কর্ত্তব্য কি? আজ তুমি রাজকীয় মলয় পবনের হিল্লোলে দেশীয় ধুতি,
ভাত ঘৃণা করিলে কিন্তু চিরকাল তুমি কি এই সৌভাগ্যের দোলায় থাকিতে
পারিবে; তুমি যদি ভাগ্যগুণে পার, তোমার পুত্র পৌত্রেরা পারিবে ত?
পারস্য তাতার হইতে যে সকল রাজবংশীয় মুসলমান নরপতিরা ভারতবর্ষের
সিংহাসনে অধিরোহণ করিরাছিলেন, এক্ষণে তাহাদিগের অনেক বংশধরেরা
এদেশের সামাজিক অশন বসন গ্রহণ করিয়াছেন; কৃপাপরবশ হইয়া এরূপ
করেন নাই। অনিবার্য্য কাল করাইয়াছে।

সমাজের আচার ব্যবহার যাঁহারা জানেন, তাঁহারা ইহা অস্বীকার
করিতে পারিবেন না যে ভক্তিবলে সমাজকে অনায়াসে আয়ত্ত করা যায়।
যাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠেন নাই বা উঠিতে পারেন নাই,
তাঁহারা যদি ভক্তিমার্গ আশ্রয় করিতেন অর্থাৎ "আচার প্রভাবে ধর্ম্ম"
স্মরণ করিয়া দৃঢ়রূপে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপালন করিতেন তাহা হইলে অর্গলিত
সমাজের দ্বার অনেক পরিমাণে উদ্ঘাটিত হইত। আচারের যাহা কঠিন ভাগ
তাহা ইঁহারা পালন করেন কারণ ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকে সত্যনিষ্ঠ ও
সংযতেন্দ্রিয়; যাহা সহজ পরিচ্ছন্ন আহার ভাল তাহারই উপেক্ষা করেন।
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যাহাদিগের নিকট হেয় অন্য প্রকারে দেবতার ন্যায় গুণান্বিত
হইলেও সমাজ তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে পারেন না এজন্য অনেক স্বাধীন-
চেতা, কৃতবিদ্য ও দেশের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগকে হারাইয়া আজ
সমাজ সন্তপ্ত। স্বদেহ জাত রত্ননিচয় বিচ্যুত হইয়া, সমাজ দীনহীন হইয়া
পড়িতেছে। প্রায়শ্চিত্ত সামান্য বিধান মাত্র; রাজবিধি যেমন মদ্যপায়ীকে
অপায়ী করিতে পারে না, অসতীকে পতিব্রতা করিতে পারে না, সেইরূপ

পিতৃপিতামহের আচরিত পবিত্র মার্গে বুদ্ধির স্রোত না প্রবাহিত হইলে, তুচ্ছ প্রায়শ্চিত্ত বন্ধনে মনুষ্যকে সুমতি সম্পন্ন করিতে পারে না। মস্তিষ্কের উগ্রতা পরিত্যাগ করিয়া যদি ইহারা সুমনা হন, তাহা হইলে অচিরে ইহাদিগের প্রতি সমাজপতিদিগের দৃষ্টি পড়িতে পারে এবং জাতীয় সহানুভূতি উত্থিত হইলে ভেদ সকল কোথায় উড়িয়া যাইবে কেহ তাহার সন্ধান করিতে পারিবে না।

দেশে অন্য কতকগুলি লোক আছেন তাহারা বিদেশে না যাইয়াও, বিদেশের সমস্ত ও তদতিরিক্ত অনেক দোষ আহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহারা অভোজ্য ভোজন, অপেয় পান ও অগম্য গমনে তৎপর। কেহ ইন্দ্রিয়ের বাতাসে উড়িতে উড়িতে ব্রাহ্মসমাজের ক্রোড়ে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছেন, কেহ খৃষ্টান সমাজের চরণ তলে নিপতিত হইয়াছেন কেহ ইহুদি প্রদেশ স্পর্শ না করিয়াও অস্পৃষ্ট ইহুদী হইয়াছেন; কেহ কি যে আশ্রয় করিয়াছেন বা কি হইয়াছেন তাহা অদ্যাপি মনুষ্যকে জানিতে দেন নাই এবং আজীবন জানাইবেন না বলিয়া বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। কেহ ঘোরতর লোক হইয়াও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির গুণে সমাজ হইতে বহিস্কৃত হন নাই বলিয়া তাঁহারা এক এক দল এক এক দেশের অগ্রণীর ফলভোগ করিতেছেন। এই প্রকারের মিথ্যা-বাদ-রত, ভয়-সঙ্কোচ-বিহীন লোকের পদভরে আজকাল দেশ কম্পিত। ইহারা অনেকে ধর্ম্মবীর; ক্ষিপ্রহস্ত, ক্ষিপ্রপদ ও ক্ষিপ্র জিহ্বত্ব প্রযুক্ত রাজদ্বারে গণনীয়, অর্থশালী এবং সর্ব্বদা কূট জালের ব্যবসার বলে বিপুল আহার ও অনুচর সম্পন্ন। ইহারা অনেকে বাক্য ব্যবসায়ী, তজ্জন্য বক্তৃতা ক্ষেত্রে ইহাদিগের অপ্রতিহত প্রভুত্ব।

কেহ কেহ বলেন কলুষিত চরিত্রের লোকদিগকে নির্ব্বিঘ্নে দেহমধ্যে বিচরণ করিতে দিয়া সমাজ ঘোর অবিমৃষ্যকারিতার কাজ করিতেছেন, কারণ ইহাতে অপরাধ কোন প্রকারে দমিত না হইয়া ঘোরতর প্রশ্রয় পাইতেছে। বস্তুত সমাজ মধ্যে এরূপ লোক বহুতর দেখা যায় যাহারা আচার ও নীতির বিষয়ে য়ুরোপ প্রত্যাগতদিগের পাদস্পর্শ করিবারও অযোগ্য। কিন্তু সমাজের পুলিশ নাই; ফৌজদারি দেওয়ানী আদালত নাই। যেমন সর্ষপ ভূতে পাইলে রোজা ভূত ছাড়াইতে পারে না সেইরূপ যাহারা সমাজের হস্তপদ স্বরূপ তাহারা সমস্তই প্রায় বিকারগ্রস্ত। নানা

প্রকারের হর্ষকৌতুকে উন্মত্ত হইয়া তাহারা জন্মভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে না।

ইহারা কেহ জমিদারের ষ্টেটের ম্যানেজারী করিয়া সেই ষ্টেট ডুবাইয়া দিয়া একবারে দায়ী হইতেছে না। মক্কেলের উকিল বা মোক্তার হইয়া তাহার সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া তাহাকে মুখ ব্যাদন করিতে দিতেছে না। নির্ম্মল সাধুবেশে সাধারণের তহবিলমন্দিরে ম্লেচ্ছের ন্যায় প্রবেশ করিয়া সেই তহবিল নিঃশেষ করিতেছে। ইহারা অনেকে অবৈতনিক পদভোগী। ভ্রমরেরা পুষ্প হইতে মধুচয়ণ করে কিন্তু ইহারা নীরস অবৈতনিক পদ হইতে অপরিমিত মধু আহরণ করিয়া অপূর্ব্ব মধুর সংরক্ষকরূপে দিন যাপন করিতেছে। বোধ হয় প্রচুর নজর সেলামী দিতে হইলেও ইহারা অবৈতনিক পদ রাখিতে প্রস্তুত। রাজদ্বারে ইহরা এরূপ সম্মানিত যে কেহ উপাধি পাইয়াছে, কেহ বা পাইবে কেহ না পাইয়া ভূমণ্ডল কাঁপাইতেছে। য়ুরোপ প্রত্যাগত দিগের অপেক্ষা ইহারা আহারের খরচে নিরতিশয় লম্বোদর। খাদ্যের সময় কেহ দেখিলে ইহারা এরূপ দিশাহারা হইয়া পড়ে যে নিজের স্বদেশ কোথায়, স্বয়ং কোন বংশ সম্ভূত তাহা বিকৃত বুদ্ধির প্রভাবে একবারে ভুলিয়া যায়। দিল্লীর দরবারে এ প্রকারে কত কুলাঙ্গারকে আত্মহারা হইতে শুনিয়াছি। সুতরাং ভারতবর্ষ এক্ষণে নূতন ভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইহাদিগের কার্য্যের কোন সমালোচক নাই। যাহারা ইহাদিগের চরিত্রের বিষয় উত্তম অবগত তাহারা স্বার্থহানির ভয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে অবস্থিতি করিতেছে। ইহাকে কেহ উন্মুক্ত স্বাধীনতা বলিতে চাহেন বলুন কিন্তু সেই বক্তার সহিত আমাদিগের সহানুভূতি নাই কারণ যে স্ত্রী ঈষৎ রক্ষণ শিথিলতার মলয় পবন পাইয়া বেশ্যা হয়, তাহাদিগের সহিত ইহাদিগের প্রভেদ কি? নির্লজ্জতা ও দুরভিসন্ধির ইহা সেই পুস্তকবর্ণিত পতিত ললনাদিগকে বহুদূর পশ্চাতে নিক্ষেপ করিয়াছে।

শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাচীন সাহিত্য কীর্ত্তি।

নিমাইর সন্ন্যাস-পটি।

এই পুঁথিখানি কাহার লেখনী প্রসূত, পুঁথিতে কোথাও তাহার উল্লেখ নাই; সুতরাং তাহা জানিবার আর উপায়ও নাই। লিপিকর রামহরি দের নিবাসাদি অজ্ঞাত হইলেও তিনি যে চট্টগ্রামবাসী ছিলেন, তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত হইলেও গ্রন্থখানি যে চট্টগ্রামী সম্পত্তি নহে, তাহার প্রমাণ পুঁথিতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে যে প্রকারের ক্রিয়া, বিভক্তি প্রভৃতির ব্যবহার হইয়াছে, তাহা যে কখনো এদেশে ব্যবহৃত হইত, এমন বোধ হয় না। তদ্ভিন্ন, চট্টগ্রামে চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম বিশেষ প্রভাব বিস্তারিত করিতে পারে নাই বলিয়া এখানে বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রসার অতীব সঙ্কীর্ণ। এরূপ অবস্থায় ইহাকে চট্টগ্রামী কীর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করিতে আমরা নিতান্তই সঙ্কোচ বোধ করি।

এতন্নামধেয় আর একখানি কাব্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে; তাহার অপর নাম 'গৌরাঙ্গ-চরিত'। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ উহার প্রণেতা। 'গৌরাঙ্গ-চরিতে' যাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সমালোচ্য পুঁথিতে তাহাই অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে; অর্থাৎ গৌরাঙ্গ-দেবের সন্ন্যাস-যাত্রাই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়।

চণ্ডীদাস-রচিত 'শ্রীরাধার কলঙ্ক-ভঞ্জন' 'গৌরাঙ্গ-চরিত', রাধিকার মানভঙ্গ, বলরাম দাসের রাধিকার বারমাস এবং এই পুঁথির ব্যবহৃত ছন্দ একইরূপ। করুণ রস-বর্ণনায় এই প্রকার ছন্দ বড়ই উপযোগী বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহা এক অদ্ভুত গ্রন্থ। এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালায় বেশী আছে, মনে হয় না; অন্তত আমরা দেখি নাই, এই গ্রন্থের রচনা এতই কোমল ও মধুর যে, পুত্র-শোকাতুর কোন ব্যক্তি ইহার পাঠে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। গীতের সুরে এই গ্রন্থ পঠিত হইত বলিয়াই বুঝি পয়ারের চরণে অক্ষর সংখ্যা কেবল চতুর্দ্দশেই পরিমিত নহে। দেখা যায়, তাহা অনেক স্থলে বিংশতি সংখ্যা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে! ইহার রচনা-প্রণালীর

কথা পৃথক রূপে বলিয়া কাজ নাই। নিম্নে পুঁথিখানা প্রকাশিত করিলাম। পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

ইহার রচনা-কাল ঠিক নির্ণয় করা কঠিন। যে কালে বৈষ্ণব কোবিদ-কুল বঙ্গ-সাহিত্য-কানন মধুর ঝঙ্কারে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ ইহাও তখনকার রচিত। তাহা সত্য হইলে ইহাকে অতিপ্রাচীন রচনা বলিয়াই অবধারিত করিতে হয়।

অন্য প্রতিলিপির অভাবে ইহার স্থানে স্থানে কিছু কিছু অপূর্ণতা বা প্রমাদ রহিয়া গেল, বোধ হইতেছে। যাহা হউক, তাহাতে আমাদের বড় কিছু আসিয়া যায় না।

নমো গণেশায়।

অথ নিমাইর সন্ন্যাস-পটি লিখ্যতে।
নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র বাস হে নারদ॥

একদিন ভারতী গোসাঁই শচী মাতার মন্দিরে আসিল।
ভারতীরে দেখি রাণী ডণ্ডবত কৈল॥
সেই দিন ভারতী শচীর মন্দিরে রহিল।
কি না মন্ত্র কর্ণে দিয়া নিমাই সন্ন্যাসী করিল॥ ধু ॥
কি না মন্ত্র কর্ণে দিল।
নিমাই চাঁদ সন্ন্যাসী হৈল॥
প্রভাতে ভারতী গোসাঁই গমন করিল।
তান পাছে নিমাই চাঁদ হাটিতে লাগিল॥
ধাইআ জাইআ শচী মাতা নিমাইকে ধরিল।
কান্দিতে কান্দিতে তবে কহিতে লাগিল॥
সন্ন্যাসী না হৈয় বাছা বৈরাগী না হৈআ।
অভাগিনী মাএর প্রাণ বধিআ না জাইঅ॥ ধু ॥
যদি নিমাই ছাড়িআ জাবে।
ছেল হৈআ বুকে রবে॥
বৈশাখ মাসে তুলসীরে দিআছিলাম ঝাড়া।
জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠীপূজা কর্যাছিলাম সারা॥

আর জথ ব্রাহ্মণেরে দিয়াছিলাম আম ?
সেই পুণ্যে পাইআছিলাম দূর্ব্বাদল-শ্যাম ॥
আষাঢ়েতে বিল্ব পত্র শিবেরে স্বস্ত্যয়ন।
শ্রাবণ বহিআ গেল মনসা-পূজন ॥
ভাদ্র মাসে ভদ্রকালী করিআছি পূজা।
আশ্বিনেতে পুজি আছি দেবী দশভূজা ॥
কার্ত্তিক মাসে গোবিন্দেরে দিআছি তুলসী।
আগ্রাণেতে ইষ্টদেব তানে সেবিআছি ॥
পৌষ মাসে লক্ষ্মীব্রত কৈর‍্যাছি গো আমি।
মাঘ মাসে সূর্য্যদেব আরাধিছি আমি ॥
ফাল্গুন মাসে গোবিন্দকে দোলাই আছি দোলে।
চৈত্র মাসে শিব পূজা মম কুতূহলে ॥ ধু ॥
ব্রাহ্মণকে দিআছি সোনা।
সেই পুণ্যে পাইআছি তোমা ॥
সন্ন্যাসী হইবেক বাপু তার অধিক নাই।
অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপাই(১) ॥ ধু ॥
আমার গলে দিআছি দড়ি।
না গেলে কি রৈতে পারি ॥
এ বোলিয়া শচী মাতা নিমাইকে ধরিল।
বিষ্ণু প্রিয়ার স্থানে তবে গমন করিল ॥
শাশুড়ী দেখিআ বিষ্ণু প্রিয়া লজ্জিত হইল।
নিমাই চান্দ দেখিয়া তবে হাসিতে লাগিল ॥ ধু ॥
আজু আমার শুভ লেখা।
নিমাইর সঙ্গে হৈল দেখা ॥ ২০

কথা।

শচী মাতাএ বিষ্ণু প্রিয়াকে বুলিতেছে।
কেশব ভারতী গুরু কথা(২) হোস্তে আসি।
কি না মন্ত্র কর্ণে দিআ করিল সন্ন্যাসী ॥ ধু ॥

১। উপাই—উপায়। ২। কথা—কোথা।

সুখের কালটি বহিআ গেল।
দুঃখের কালটি ফির‍্যা আইল ॥
এ বোলিআ শচী মাতা নিমাইকে ধরিল।
বিষ্ণু প্রিয়ার হাতে নিমাই সমর্পণ কৈল ॥ ধু।
আমার নিমাই তোকে দিআ।
পাষাণে বান্ধিছি হিআ ॥
এ বোলিআ শচী মাতা গমন করিল।
নিমাই দিআ বিষ্ণু প্রিয়াকে কহিতে লাগিল ॥
প্রেমকথা দিআ নিমাই বান্ধিতে লাগিলা।
কান্দিতে কান্দিতে নিমাই কহিতে লাগিলা ॥ ধু।
বিষ্ণুপ্রিয়া কহ কি।
প্রেম ডুরি কাট্যাছি ॥
এ বোলিতে বিষ্ণুপ্রিয়া চরণে পড়িল।
কান্দিতে কান্দিতে তখন কহিতে লাগিল ॥
তুমি আমার আমি তোমার জানে জগভরি।
মাতা পিতা দিছে তোমা অগ্নি সাক্ষী করি ॥ ধু।
যে রমণীর স্বামী ছাড়্যা গেল।
জীতা সে বিধবা হৈল ॥
লোহার ছিকলে নিমাই যখন বান্ধিতে লাগিল।
কান্দিতে কান্দিতে নিমাই কহিতে লাগিল ॥ ধু।
বিষ্ণুপ্রিয়া বান্ধ তুমি।
প্রেমছাড়া হৈলাম আমি ॥
আমিস্য (আলস্য ?)[১] হৈআ বিষ্ণুপ্রিয়া যখন ভূমিতে পড়িল।
নিদ্রাকে ডাকিআ নিমাই কহিতে লাগিল ॥
শুন শুন নিদ্রাণী [২] তুমি আমার বচন।
বিষ্ণুপ্রিয়ার নআনেতে বৈসএ আপন ॥

[১] 'আমিস্য' না হইয়া সম্ভবতঃ 'আলস্য'('অলস' অর্থে) হইবে।
[২] 'নিদ্রালী' হয় কি ? 'নিদ্রাণী' বোধ হয় 'নিদ্রার রাণী' অর্থে প্রযুক্ত।

আপনার বন্ধন নিমাই আপনে খোসাইল।
চন্দ্র সূর্য্য আদি করি তাহা সাক্ষী কৈল॥ ধু।।
বিষ্ণুপ্রিয়া জাগ তুমি।
ব্রজের বিদায় মাগি আমি॥
এ বোলিআ নিমাই চান্দ গমন করিল।
নিশাভাগ রাত্রিতে শচীমাতা স্বপ্ন যে দেখিল॥
প্রভাতকালে শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়ার মন্দিরে আসিল।
বিষ্ণুপ্রিয়া জাগাইতে গাএ হস্ত দিল॥
চৈতন্য হইআ বিষ্ণুপ্রিয়া শাশুড়ী দেখিল।
কান্দিতে কান্দিতে শচীমাতা কহিতে লাগিল॥ ধু।
ফিরিআ দেখ নৈদা [১] পানে।
শূন্য লাগে নৈদা কেনে॥
কালুকা আমার নিমাই তোকে দিছি আনিআ।
আমার নিমাই কি করিলি বোলহ জানিআ॥
না কান্দ না কান্দ তুমি স্থির কর মন।
নিমাই চান্দ বান্ধি আছি ঘরেতে আপন॥
তোমি (তুমি) বোলো নিমাই চান্দ বান্ধিআ রাখিল।
স্বপ্নেতে দেখিল নিমাই সন্ন্যাসী হইল॥
এথ শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহ বিচারিল।
নিমাই চান্দ না দেখিআ কান্দিতে লাগিল॥ ধু।
নিমাই মোরে ছাড়্যা গেল।
ছেল কুটি বুকে রৈল॥
হিয়া কুটি ভূমি পড়ি বাহে গড়াগড়ি।
যারে দেখে বিষ্ণুপ্রিয়া কহে বচন ফুকারি॥ ধু।
সেই নিমাই রসিক ছিল।
প্রেম ছাড়া কে করিল॥
পাগলিনীর মতে শচীমাতা গমন করিল।
যারে দেখে শচীমাতা তাকে জিজ্ঞাসিল॥ ধু।

[১] নৈদা—নদীয়া।

যারে দেখে তারে পুছে।
দেখিছ নি নিমাই জাইতে॥
বৎস ছাড়ি যেন গাভী চতুর্দ্দিগে ধাএ।
তেন মতে শচীমাতা ডাকে উচ্চরাএ॥ ধু।
সবে বোলে তোরে নিমাইর মা।
অথন কেহ বুলিবে না॥
কান্দি কান্দি শচীমাতা গমন করিল।
চম্পক নগরে গিআ দরশন দিল॥
চম্পকের লোকে সবে বেড়ি রঙ্গ চাহে।
কান্দি কান্দি শচীমাতা তাহাকে বুঝাএ।
একদিন ভারতী গোঁসাই আমার মন্দিরে আসিল।
কি না মন্ত্র কর্ণে দিআ সন্ন্যাসী করিল॥ ধু।
যে অতিথের স্থান দিল।
তার ছাল্যা(১) বৈরাগী হৈল॥
তরুছায়া পাই শচী তার নীচে রৈল।
মস্তকেতে হস্ত দিআ ভাবিতে লাগিল॥
ভাবিতে ভাবিতে শচী তাপিত হইল।
দশরথের কথা তথা মনেতে স্মরিল॥ ধু।
দশরথ রাজা ছিল।
তারে বিধি বাম হৈল॥
কেকৈর সত্যেতে বনে পাঠাইল শ্রীরাম।
দশরথের কর্ম্মে ছিল দুঃখের অবিরাম॥
চারি পুত্র থাকিতে রাজা বাসি মরা হৈল।
বিধির নির্ব্বন্ধ সেহ খণ্ডাতে নারিল॥ ধু।
পুত্র শোকে রাজা মৈল।
সেই দশাটি আমার হৈল॥
নিমাই চান্দ না পাইআ ফিরা ঘরে আইল।
ভারতীর সঙ্গে নিমাই পন্থে দেখা পাইল॥ ধু।

[১] ছাল্যা—ছেলে।

ডোর কপিন(১) দেঅ মোরে।
অথন ব্রজে চলি জাই রে॥
দিন দুই চারি রহ স্থির করি মন।
ডোর কপীন দিব মাতা শুনহ বচন॥
কান্দিতে কান্দিতে নিমাই ভারতীকে বোলে।
যথন আছিলাম আমি শচীমাতার কোলে॥ ধু।
দেখাইআ রাঙ্গা পাও।
পাসরাইলা বাপমাও॥
পুনরপি নিমাইচান্দ ডোরকপীন মাগিল।
হরসিতে ভারতী গোঁসাই কহিতে লাগিল॥
না কান্দ না কান্দ নিমাই স্থির কর মন।
ডোর কপীন দিব আমি স্থির কর মন॥ ধু।
পুন নিমাই চান্দে বোলে।
ডোর কপীন নহি দিলে॥
গৃহের বাহির কেনে কৈলে।
পুন ভারতী এ বোলে।
মস্তক মুণ্ডন হৈলে।
ডোর কপীন দিতে পারে।
এথেক শুনিআ নিমাই গমন করিল।
মধু মধু করি নিমাই ডাকিতে লাগিল॥
হাতে গদা করি মধু দিল দরশন।
নিমাই চান্দে বোলে মধু শুনহ বচন॥
আমার মস্তক তুমি করহ মুণ্ডন।
মধু নাউ(২) বোলে নিমাই করি নিবেদন।
মস্তক মূড়াইলে আমা কিবা দিবা ধন॥ ধু।
আমি এথন কি ধন দিবো।
গোলোক জাইতে সঙ্গে নিবো॥

[১] কপীন—কৌপীন।
[২] নাউ—নাপিত।

সুবর্ণের ঝারি ভরি গঙ্গাজল আনে।
গঙ্গার কূলেতে বৈসে মস্তক মুণ্ডনে॥
একগাছি ক্ষুর যবে টানিআ থসাইল।
হস্তেতে দাবিআ তখন মস্তকেতে দিল॥
যখনে মস্তকে মধু ক্ষুর উঠাই দিল।
প্রভু প্রভু করি নিমাই কান্দিতে লাগিল॥
আর না জাইব আমি গয়া বারাণসী।
আর পিণ্ড নাহি দিব পুরুষ প্রকাশি॥ ধু।
আমি কূলেতে জন্মিলাম ছার।
না শুজিলাম(১) মাএর ধার॥
এথ শুনি ভারতী গোঁসাই নিমাইর হস্তেতে ধরিল।
বৈষ্ণবের কথা কিছু কহিতে লাগিল॥
গঙ্গা জাইআ স্তব কর কৃষ্ণের গোচর।
মায়া পাপ মুক্ত করে প্রভু গদাধর॥
গঙ্গার জল হস্তে করি নিমাই কহিতে লাগিল।
শুন শুন গঙ্গাদেবি আমার বচন॥ ধু।
নিমাই ফিরে গঙ্গার কূলেতে।
কেশব ভারতীর সাথে॥
যেই ক্ষণে সাধু সবে তোমার জলে মস্তক ডুবাএ।
তথক্ষণে তোমার পাপ ভস্ম হৈয়া জাএ॥
বসুমতীর স্তব করে সাক্ষাতে কৃষ্ণের।
আমা পাপ মুক্ত কর প্রভু গদাধর॥
বসুমতীর হস্তে ধরি কহিতে লাগিলেন।
শুন শুন বসুমতী আমার বচন॥
যখনে বৈষ্ণবের ধূলি বক্ষেতে পড়িব॥
ততক্ষণে তোমার পাপ ভস্ম হৈআ জাইব॥
ভারতী বোলে নিমাই চান্দ স্থির কর মন।
ডোর কপীন পৈর তুমি শুনহ বচন॥

[১] শুজিলাম—পরিশোধ করিলাম।

যার বংশে একজন বৈষ্ণব হইল।
তার শত কুল জান স্বর্গে চলি গেল ॥
একথা শুনিআ নিমাই ডোর কপীন পরিল।
স্বর্গে থাকি দেবগণে পুষ্পবৃষ্টি কৈল॥ ধু।
ডোর কপীন করঙ্গ হাতে।
কেশব ভারতীর সাথে ॥ ৯৩

"সমাপ্ত সন ১২৪৮ বাঙ্গলা তারিখ ১৭ আগ্রান স্বঅক্ষর শ্রীরামহরি দে।

আবদুল করিম।

মৃত্যুর পর।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসকে একজন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "ঈশ্বরকে কি দেখা যায় উত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "দেখা যায় ব্যাকুলতা হলেই দেখা যায়। ব্যাকুলতার সঙ্গে তিনি অরুণোদয়ের তুলনা করিয়াছেন, অরুণোদয়ের পরই সূর্য্যের প্রকাশ। তাঁহার মতে তিন টান হইলেই ঈশ্বরকে দেখা যায়, এই তিন টান কি কি? যেমন মাতার পুত্রের প্রতি টান, বিষয়াসক্ত লোকের বিষয়ের উপর টান আর যেমন সতীনারীর স্বীয় পতির প্রতি টান। এই তিন আবার এক সঙ্গে হওয়া চাই, মা যেমন ছেলেকে ভাল বাসে, বিষয়ী লোক যেমন বিত্ত ভাল বাসে, আর সতী নারী যেমন পতিকে ভালবাসে, এই তিনের ভালবাসা একত্রে যোগ করিয়া যতখানি হয় ততটা ভালবাসা ভগবানকে অর্পণ করিলে ঈশ্বর দর্শন দেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতেও ভগবানকে পাইবার ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে।
(১) জ্ঞানযোগ (২) কর্ম্মযোগ (৩) ভক্তিযোগ।

(১) জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে তিনি বলেন, জীব মায়ার আবরণ বশত ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। জীবের অহংকারই জীবের মায়া। যদি গুরুকৃপায় জীবের অহং বুদ্ধি যায় তাহা হইলে ঈশ্বর দর্শন হয়। জীব সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইলেও অহং পরবশতঃ জীবের নানা উপাধি হয় এই মায়া ও উপাধি

নেতি নেতি বিচার করিয়া ত্যাগ করিতে হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে "আমি" টা আছে।

জ্ঞান লাভ হলে, অহংকার যাইতে পারে। সমাধিস্থ হইলে অহংকার যায় বেদে আছে, সপ্তম ভূমিতে মন গেলে তবে সমাধি হয়। মনের সচরাচর বাস লিঙ্গ গুহ্য নাভি এই তিন ভূমিতে তখন সংসারে কামিনী কাঞ্চনে ঘোর আসক্তি। হৃদয়ে মন রাখিলে ঈশ্বরের জ্যোতি দর্শন হয়, কপালে ভ্রূমধ্যে মন গেলে সচ্চিদানন্দরূপ দর্শন হয়। সহস্রার সপ্তম ভূমি এখানে মন রাখিলে সমাধি। নুনের পুতুল তখন সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবিয়া যায়।

পরমহংসের মতে কলিকালে লোকের অন্নগত প্রাণ, জ্ঞানযোগ ভারি কঠিন। জীবের দেহাত্মবুদ্ধি অহং বুদ্ধি যায় না। সমাধি হইলেও অহং সকলের যায় না। তাই বলিয়াছেন কলিকালের পক্ষে ভক্তিযোগই প্রশস্ত— সহজ পথ। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, এ ধারণা অপেক্ষা ভগবানের নামগান করা ভাল। "আমি" থাকিবে ত দাস আমি হইয়া থাকুক।

পাঠক মহাশয় দেখিবেন ষট্‌চক্রভেদ বা যোগকে পরমহংস জ্ঞানযোগের মধ্যে ধরিয়াছেন।

(২) কর্ম্মযোগ। জীব কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না—কর্ম্ম তাহার প্রকৃতিগত। ইচ্ছা না করিলেও কর্ম্ম করিতে হয়। সেই জন্য অনাসক্ত হয়ে অর্থাৎ কর্ম্মের ফল আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ম্ম করিতে হয়। পূজা, হোম, জপ, তপ, কর কিন্তু দেখিয়ো যেন লোকমান্য হইবার জন্য বা পুণ্যকর্ম্ম করবার জন্য তোমার এ কর্ম্ম না করা হয়।

কলিতে কর্ম্মযোগ ভারি কঠিন, পূজা করিলাম, মহোৎসব করিলাম কোথা হইতে একটু যোগমান্য হবার ইচ্ছা এসে পড়ে যে তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়। হে ঈশ্বর আমার কর্ম্ম কমিয়ে দাও, যেটুকু কর্ম্ম কর্‌ব যেন অনাসক্ত হয়ে কর্ত্তে পারি।

আমি চিন্তা করিতেছি, আমি ধ্যান করিতেছি, ইহাও কর্ম্ম। যে একবার ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছে কেবল সেই অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম কর্‌তে পারে।

"কর্ম্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়। মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। কর্ম্ম একটা উপায়ও নয়। নিষ্কাম কর্ম্ম একটা উপায় বটে—জঘন্য উদ্দেশ্য হইতে

পারে না, (বিলাত প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশবাসীরা কর্ম্মকে যে জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে সেটা তাদের ভুল)

ভক্তিযোগ।—ভক্তি যুগধর্ম্ম। কলিতে ভক্তিযোগ। নারদীয় ভক্তি। ঈশ্বরের নামগুণ গান করা ও ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করা—'হে ঈশ্বর আমার জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, আমায় দেখা দাও। আমার কখন ইচ্ছা হয় না যে বলি আমি ব্রহ্ম। আমি বলি তুমি ভগবান, আমি তোমার দাস। জ্ঞানীর ব্রহ্ম যাহা, যোগীর পরমাত্মা যাহা, ভক্তের ভগবান তাহাই। চিনি হওয়া ভাল নয় আমি চিনি খেতে চাই।

ভক্তির পথ ধরে গেলেও ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান তিনি সব দিতে পারেন।

পরমহংসদেব বলিতেন "ভক্তি" দ্বিবিধ। (১) বৈধী বা বিধি বাদীয় ভক্তি আর (২) রাগভক্তি বা প্রেমাভক্তি। প্রথম প্রকারের ভক্তি কিরূপ না, এত জপ করিতে হইবে, এত ধ্যান করিতে হইবে, এইরূপে পূজা করিতে হইবে ইত্যাদি। যেমন মাঠে ধান থাকিলে মাঠ পার হতে হলে আল দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয়। স্মুমুকের গাঁয়ে যাবে কিন্তু বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে। এরূপ ভক্তি করিতে করিতে ক্রমে রাগভক্তি আসে। রাগ-ভক্তি না আসিলে ঈশ্বর লাভ হইবার উপায় নাই।

দ্বিতীয় প্রকারের ভক্তির নাম রাগভক্তি বা প্রেমভক্তি। ইহাতে ঈশ্বরকে আত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসিতে হয় যেন ধান কাটা মাঠ পার হওয়া আল দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয় না, বন্যা এলে বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয় না। তখন মাঠের উপর যে এক বাঁশ জল, সোজা নৌকা চালাইয়া দিলেই হইল।

ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ করিলে যে ভক্তিটুকু অবশিষ্ট থাকে তাহা শুদ্ধাভক্তি। আমি মাকে বলেছিলাম, মা এই নাও তোমার ধর্ম্ম এই নাও তোমার কর্ম্ম, আমায় শ্রদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার পুণ্য এই নাও তোমার পাপ, আমায় শ্রদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান এই নাও তোমার অজ্ঞান আমায় শ্রদ্ধা ভক্তি দাও। দেখ আমি জ্ঞান পর্য্যন্ত চাই নাই, লোকের মান্য চাই নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়লে শ্রদ্ধাভক্তি থাকে—অমলা, নিষ্কাম, অহৈতুকী ভক্তি।

রাগ ভক্তিতে একটুকুও সংসার বুদ্ধি থাকে না। সংসার বুদ্ধি একেবারে চলে যাবে ভগবানের উপর ষোল আনা মন হবে তবে তাঁকে পাবে কাহার কাহারও রাগভক্তি আপনা আপনি হয়,—হয় ত স্বতঃসিদ্ধ যেমন প্রহ্লাদ, ছেলেবেলা হইতেই ভগবানের জন্য কাঁদে।

কলিকালে ভক্তিযোগই প্রশস্ত পথ কলিতে জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ বড়ই কঠিন। এখন অন্নগত প্রাণ পরমায়ু অল্প, কবিরাজী চিকিৎসার দেরী সয় না, রোগীর ও দিকে হইয়া যায়। তাই যেমন ডিঃ গুপ্ত তেমনি কলিতে ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম। ভগবানের নাম রূপ গুণ গান করা আর প্রার্থনা করা। আমায় ভক্তি দাও, দেখা দাও ইত্যাদি।

অতি স্থূল ভাবে ভক্তি সম্বন্ধে পাঠক হৃদয়ে একটা ছায়া দিবার জন্য রামকৃষ্ণ পরমহংসের সোজা কথার মোটা উদাহরণের অলৌকিক উপদেশ পাঠক মহাশয়কে উপহার দিলাম ভক্তির সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে পাছে পাঠক পরে খাই হারাইয়া ফেলেন সেই ভয়ে সর্ব্ব প্রথমেই স্থূল জিনিষটা দিয়াছি।

আবার একটা স্থূল কথা শুনুন, যাহা হইতে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ভাষ্যাদি কত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে ভগবান ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নামই হইতেছে "ভক্তিযোগ"।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎপার্থ ময্যাবেশিত চেতসাং॥ ৭
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়িবুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধ ন সংশয় ॥ ৮
অথচিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাস যোগেন ততোমামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯
অভ্যাসেঽপ্য সমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমোভব।
মদর্থমপি কর্ম্মানি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদযোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্ম ফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১

শ্রেয়োহি জ্ঞান মভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২
অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখং ক্ষমী॥ ১৩
সন্তুষ্ট সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষ ভয়োদ্বেগৈ র্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়॥ ১৫
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান যঃ সমে প্রিয়ঃ॥ ১৭
সম শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমান য়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃসঙ্গবিবর্জ্জিত॥ ১৮
তুল্যনিন্দা স্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান মে প্রিয়োনরঃ॥ ১৯
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ২০

যাহারা সকল কার্য্য আমাতে অর্পণ করিয়া মৎ পরায়ণ হইয়া অনন্য ভক্তিযোগে আমাকে ধ্যানধারণায় উপাসনা করে, হে পার্থ! আমাতে আবিষ্টচিত্ত তাহাদিগকে আমি মৃত্যুময় সংসার সাগর হইতে অবিলম্বে উদ্ধার করি। ৬।৭

আমাতে মন অর্পণ কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবেশ কর, ইহার পর আমাতেই অবস্থিতি করিবে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। ৮

হে ধনঞ্জয়! যদি আমাতে চিত্তকে স্থিরভাবে রাখিতে না পার তবে অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে পাইতে যত্ন কর। ৯

অভ্যাসেও যদি অসমর্থ হও তবে আমার কার্য্যে লিপ্ত হও, আমার জন্য কার্য্য করিলেও সিদ্ধি লাভ করিবে। ১০

ইহাতে যদি অক্ষম হও, তাহা হইলে এক মাত্র আমার শরণাপন্ন ও সংযত চিত্ত হইয়া কর্ম্মফল ত্যাগ কর। ১১

অভ্যাস হইতে জ্ঞান, জ্ঞানাপেক্ষা ধ্যান, ধ্যান হইতে কর্ম্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ; কর্ম্মফল ত্যাগে শান্তি লাভ হইয়া থাকে। ১২

সর্ব্বভূতে দ্বেষ বিরহিত, অপিচ মিত্র ভাবাপন্ন, দয়ালু মমতা এবং অহঙ্কার বর্জ্জিত, সুখ দুঃখে সাম্য ভাবাবলম্বী ক্ষমাশীল, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট সংযত স্বভাব দৃঢ় নিশ্চয় এবং আমাতে মনোবুদ্ধি সমর্পণকারী ব্যক্তিই আমার প্রিয়। ১৩।১৪

যাহা দ্বারা লোক উৎত্যক্ত হয় না, এবং যিনিও লোক কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হয়েন না, যিনি হর্ষ, পরশ্রী কাতরতা ভয় উদ্বেগ শূন্য তিনিই আমার প্রিয়। ১৫

যিনি অনপেক্ষ পবিত্র অনলস উদাসীন বিগত বেদন সমুদয় উদ্যোগ পরিত্যাগী তিনি আমার প্রিয়। ১৬

যিনি প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে আনন্দিত হয়েন না, যিনি দ্বেষ করেন না, যিনি ইষ্টনাশে শোক করেন না, যিনি কিছু কামনা করেন না এবং যিনি পাপ পুণ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন এমন যে ভক্তিমান্ তিনি আমার প্রিয়। ১৭

শত্রু মিত্র মানাপমানে শীতোষ্ণ সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন সঙ্গ বিবর্জ্জিত নিন্দাগুণে যাঁহারা সমান জ্ঞান মৌনী কিঞ্চিৎ পাইলেই সন্তুষ্ট যাহার গৃহ নাই স্থির চিত্ত এবং ভক্তিমান্ তিনি আমার প্রিয়। ১৮।১৯

যাহারা শ্রদ্ধাবান্ মৎপরায়ণ হইয়া এই অমৃতরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা আমার অতীব প্রিয়। ২০

(ভক্তিযোগ)

স্থূলভাবে ভক্তির স্বরূপ বোধ হয় পাঠক মহাশয় ধারণা করিয়াছেন আর একটু শ্রবণ করিলে আরও খুলিয়া যাইবে। "শাণ্ডিল্য সূত্র" বলিয়াছেন, ভক্তি কি?—না, "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"; ভগবানে শ্রেষ্ঠ বা যৎপরোনাস্তি অনুরাগ, ভগবৎপদে একান্ত রতি।

"নারদ ভক্তিসূত্র" বলিয়াছেন—সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা অর্থাৎ কাহারও প্রতি পরম প্রেমভাব। "ভক্তিরসামৃত সিন্ধু" বলিয়াছেন—ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ মাত্র রাগাত্মিকোদিতা।

"ইষ্টে অর্থাৎ অভিলসিত বস্তুতে যে কুরসপূর্ণ পরম আবিষ্টতা অর্থাৎ অত্যন্ত গাঢ় আবেগ তাহার নাম রাগ, সেই রাগময়ী যে ভক্তি তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি কহে। কোন কারণ অপেক্ষা না করিয়া, কোন কার্য্য অপেক্ষা না করিয়া সকল হইতে ভগবানের জন্য যে প্রাণের ব্যাকুলতা তাহাই রাগাত্মিকা।

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥

যাহা রাগাত্মিকা তাহারই আর একটী নাম "অহৈতুকী"। আরও একটী নাম "মুখ্যা"। অহৈতুকী অর্থাৎ যাহার হেতু নাই। পুত্র দাও, ধন দাও, যশ দাও, মোকদ্দমা জিতাইয়া দাও এরূপ কোন হেতুর উপর যাহার ভিত্তি নাই। এই ভক্তিতে ভক্ত মুক্তিপদ পর্য্যন্ত চান না। কেবল চান, হরি হে তোমার শ্রীচরণ। কেবল চান, কালী গো তোর রাতুল পাদপদ্ম খানি।

ভগবান বলিয়াছেন—

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্র ধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যাপিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥

ভগবান বলিতেছেন—যিনি আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মার পদ কি ইন্দ্রের পদ কি সার্ব্বভৌম পদ কি পাতালের আধিপত্য, এমন কি যোগসিদ্ধি বা মোক্ষ পর্য্যন্ত চান্ না। আমি ভিন্ন তাঁহার আর অপর কোন বস্তুতেই অভিলাষ নাই।

ভগবান যাহা বলিয়াছেন ভগবানের ভক্ত তাহা অপেক্ষা জোরে স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন "সকলের মূল ভক্তি মুক্তি তার দাসী"।

আবার দেখুন,

যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দ সান্দ্রা
বিলুঠতি চরণাগ্রে মোক্ষ সাম্রাজ্য লক্ষ্মী।

যাঁহার মুকুন্দ পদ্মে আনন্দ সান্দ্রা ভক্তি উৎপন্ন হয় সেই ভক্তের চরণ পদ্মে, মোক্ষরূপ অতুল সাম্রাজ্যের লক্ষ্মী যিনি তিনি, 'আমাকে গ্রহণ কর, আমাকে গ্রহণ কর,' এই বলিয়া লুণ্ঠিত হইতে থাকেন।

ভগবানের কৃপায় তাঁহাদের অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয় তাঁহারা ভ

চরিতার্থ। কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাহা হয় না। প্রহ্লাদের এই অহৈতুকী ভক্তির উদয় হইয়াছিল কিন্তু ধ্রুবের হয় নাই। ধ্রুব প্রথমে রাজপদ প্রাপ্তির জন্য তপস্যা আরম্ভ করেন, শেষে যখন ভগবান ধ্রুবের নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিলেন "বর গ্রহণ কর" তখন তিনি বলিলেন কি বর? তখন ভগবান স্মরণ করাইয়া দিলেন যে রাজপদ প্রাপ্তির জন্য তাঁহার তপস্যার সূচনা। তখন ধ্রুব বলিলেন—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্র গুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্য রত্নং স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, সদ্মাভিলাষী হইবার আমি তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু পাইলাম হে দেব, কত মুনীন্দ্র যোগীন্দ্র তপস্যা করিয়া যাঁহাকে না পায় সেই তোমাকে কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে হঠাৎ পাইলাম দিব্যরত্ন; হে স্বামিন্ কৃতার্থ হইয়াছি; আর বর চাহি না।

অহৈতুকীভক্তি যাঁহারা পাইয়াছেন—অপর ভাবে, নিকৃষ্ট ভাবে, ভক্তির নিম্নস্তর হইতে তপস্যা আরম্ভ করিয়া যাঁহারা শেষে তাঁহাকে পাইয়াছেন—তাঁহাদের সকলেরই এক কথা। সর্ব্বানন্দ যখন সিদ্ধ হয়েন, যখন জগজ্জননী সর্ব্বানন্দের সম্মুখে শবশিব হৃদয়ে দণ্ডায়মানা এবং বরং বৃণু বরং বৃণু বলিতে-তেছেন তখন মাকে দেখিয়াই সর্ব্বানন্দের অহৈতুকী ভক্তির উদয় হইয়াছে। বলিতেছেন—

মাতঃ কিং বরমপরং যাচে সর্ব্বং সম্পাদিত মিতি সত্যং।
যচ্চরণাম্বুজমতি গুহ্যং দৃষ্টং বিধি হর মুরহর ধৃষ্টং।

ভাবার্থ এই—মাগো আর বর কি চাহিব, ব্রহ্মাবিষ্ণু শিব যে চরণ পূজা করেন, সেই যে দুর্লভ তোমার চরণপদ্ম তাহা যখন দেখিয়াছি তখন আর কি চাহিব? আমার সকলই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

রাগাত্মিকা অহৈতুকী বা মুখ্যা উচ্চতর ভক্তের ভক্তি। যাঁহারা নিম্নস্তরে তাহাদের ভক্তির নাম হইতেছে বৈধী; হৈতুকী, গৌণী, এখন ভক্তিশাস্ত্র এবং ভক্ত সম্রাটগণ বলিতেছেন যে মন্দাধিকারীর ভয় করিবার কারণ নাই, নিরাশ হইবার আশঙ্কা নাই, ভক্তি সাধন করিয়া চল ক্রমে ক্রমে উচ্চ ভক্তি লাভ করিবে। "ভক্তি রসামৃত সিন্ধু' বলিয়াছেন

বৈধ ভক্ত্যাধিকারী তু ভাবাবির্ভাবনাবধি
তত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমনুকূল মলক্ষতে ॥

যে পর্য্যন্ত ভাবের আবির্ভাব না হয় সেই পর্য্যন্ত বৈধী ভক্তি সাধন করিতে হয়। বৈধি ভক্তি শাস্ত্রে ও অনুকুল তর্কের অপেক্ষা রাখে, ভাব হইতেই রাগ হয়, রাগ হইতেই রাগাত্মিকা ভক্তির আবির্ভাব হয়, ক্রমাগত শাস্ত্রাধ্যয়ন ও শাস্ত্রশ্রবণ ও ভগবানের স্বরূপ প্রতিপাদক তর্ক করিতে করিতে ও শুনিতে শুনিতে ভগবদ্বিষয়ে মতি হয়, তাঁহাতে ভাব হয়। অমন মধুর বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে তাহাতে লোভ না হইয়া যায় না। লোভ হইলেই প্রাণের টান হয়, প্রাণের টান হইলেই রাগাত্মিকা ভক্তির উদয় হয়। ভগবানের নাম উপর্য্যুপরি শুনিলে মানুষ কদিন স্থির থাকিতে পারে। কত নাস্তিক ভগবানের নাম শুনিতে শুনিতে পাগল হইয়া গিয়াছে। ধ্রুবের কি হইল? যখন ভগবান সম্মুখে দণ্ডায়মান তখন ধ্রুব রাগাত্মিকা ভক্তি সাগরে নিমজ্জিত হৈতুকী ভক্তি তখন কোথায় লোপ পাইয়া গিয়াছে। সর্ব্বানন্দের কি হইল? আমাকে মূর্খ বলিয়াছে, এই অভিমানে ফুলিতে ফুলিতে বিদ্যা শিক্ষার আয়োজন, তালপাতা কাটিয়া গোড়া হইতে বিদ্যারম্ভ করিতে হইবে সেই আয়োজন,—তার পর যখন মহাবিদ্যার চরণ সরোজ দর্শন করিলেন তখন রাগাত্মিকায় একেবারে ডুবিয়া গিয়াছেন, সব ভুলিয়া গিয়াছেন, বলিতেছেন, বর আর কি চাহিব?

অতএব সাধনার যাহা মন্দাধিকারীর বৈধী তাহা উচ্চাধিকারীর রাগাত্মিকায় পরিণত হয়।

অতএব সাধনাদ্বারা যাহা মন্দাধিকারীর হৈতুকী তাহা উচ্চাধিকারীর অহৈতুকীতে পরিণত হইতে পারে। যাহা মন্দাধিকারীর "গৌণী", তাহা উচ্চাধিকারীর "মুখ্যা"য় পরিণত হয়। অতএব বৈধী হৈতুকী, গৌণী ভক্তি, উচ্চ ভক্তি লাভের সোপান স্বরূপ- সকাম হইতে নিষ্কামে যাইবার উপায়।

গৌণী ভক্তির আবার প্রকার আছে। সত্ত্ব রজ তম গুণ ভেদে গৌণী ভক্তি তিন প্রকার তামসী, রাজসী, সাত্ত্বিকী। ডাকাইতগণ কালী-পূজা করিয়া যে ডাকাতি করিতে যায় ইহা তাহাদের তামসী ভক্তি, মিথ্যা

মোকদ্দামা জিতিবার জন্য কলীপূজা—ইহাও তামসীর উদাহরণ। পুত্র ধন মান যশ আরোগ্য ঐশ্বর্য্য এই সকল পাইবার জন্য যে পূজা তাহার রাজসী—ভক্তির লক্ষণ। তার যিনি ইহকালের ভোগ চান না কেবল মাত্র স্বর্গ ভোগ চাহেন এবং কেবল মাত্র পরোপকার করিয়া থাকেন তিনি সাত্ত্বিকী ভক্তের উদাহরণ।

গৌণী ভক্তির আরও প্রকার আছে। ভগবান গীতায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

চতুর্ব্বিধা পুজান্তমাং জনা! সুকৃতিনেবর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ ॥

আর্ত্ত—কোন বিপদে পড়িয়া তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যে ভগবানকে বারম্বার ডাকে সে আর্ত্ত-ভক্ত। রোগ শোক বিপদে পড়িয়া কে ভগবানকে না ডাকে? অধিকাংশ লোকেই ডাকে।

জিজ্ঞাসু—যিনি ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝিবার জন্য ব্যাকুল বা কৌতুহল তিনি জিজ্ঞাসু ভক্ত। তাঁহার হৃদয়ে প্রেম বা ভক্তি বা ভাবও নাই তথাপি তিনি কে তাহার কার্য্য কলাপ কিরূপ কোথা থাকেন ইত্যাদি বিষয় অনুশীলনকারী ভগবানের জিজ্ঞাসু ভক্ত।

অর্থার্থী—কোন অর্থ সাধন করিবার জন্য যিনি ভগবানকে ডাকেন তিনি অর্থার্থী। ভক্ত ভগবানের নিকট বলিতেছেন নির্বংশ হইতে বসিয়াছি পুত্র দাও, সংসার চলে না ঠাকুর ধন দাও। নিদারুণ রোগে ভুগিতেছি একটা দৈব ঔষধ দাও ইত্যাদি।

এই সকল ভক্ত নিকৃষ্ট ভক্ত সন্দেহ নাই কিন্তু তাই বলিয়া এই সকল ভক্তকে অনাদর করা উচিৎ নহে। কেন না কিছু দিন সাধন করিলেই ইঁহারা উৎকৃষ্ট ভক্ত হইয়া উঠেন। বিপদে পড়িয়া ভাবিতেছি সত্য কিন্তু যখন বিপদ কাটিয়া গেল তখন আবার সেই ভগবানকে ডাকিতে ইচ্ছা হইতে পারে—এমন শত শত লোকের হইয়াছে। ভগবানের তত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে কত লোক ধার্ম্মিক হইয়া গিয়াছেন। অর্থ কামনায় আরম্ভ বলিয়া ধ্রুব ও সর্ব্বানন্দকে কি ঘৃণা করিতে পারেন? শেষে কি হইল।

সার কথা এই ভগবানকে ভাবিতে আরম্ভ করিলে আপনা হইতে

উত্তরোত্তর উন্নতি হইবে। নহিলে মহাপাপীর উপায় কি? ভগবান স্বয়ং গীতায় বলিয়াছেন—

অপিচেৎ সুদুরাচরো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হিসঃ।
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।

হে অর্জ্জুন অতি দুরাচার লোকও যদি অনন্যচেতা হইয়া আমার ভজনা করিতে থাকে, তবে তাহাকে সাধু বলিয়া মনে করিতে হইবে, সে সম্যক্ জ্ঞানবান্ হইয়াছে। যে এরূপে আমার ভজনা করে সে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইয়া যায়, এবং নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হয়। হে কৌন্তেয় তুমি নিশ্চয় জানিও আমার ভক্ত কখনও নাশ পায় না। (১)।

---

(১) শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত কর্ত্তৃক বিবৃত "ভক্তিযোগ" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত, আমরা পাঠক মহাশয়কে একবার এই পুস্তক খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কেতাব পড়িয়া কেহ ভক্ত হইতে পারে কি না তর্কের কথা। হইতে পারে নাই ধরিলাম তথাপি এই গ্রন্থ পাঠক মহাশয়কে পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

নিশালাপ।

ধীর তটিনী সলিল মলয় অনিল
চুমিয়া বহিছে ধীরে,
ঈষদ্ হিল্লোলে জোছনার কোলে
নাচায় নদীর নীরে;
চারু চিকণ চাঁদিমা পূর্ণ পূরণিমা
পূরব আকাশে-ভাসে,
ঝলিছে আকাশ-বাসে!
মরি বিমল আকাশ করেছে প্রকাশ
অমল কিরণ ছটা;
নদী দুই কূলে মেদিনী-দুকূলে
মোহন ফুলের ঘটা!
নীল লহরী মালায় ভাসি ভাসি যায়
জোছনা, সফরীমত;
লহরীর পাশে নিশাবুকে হাসে
কুসুম, তারকা শত!
বুঝি সুবেশে সাজিয়া সোহাগে মজিয়া
যামিনী বিধুর আশে
সৃজেছে বাসর, সুতনু নিথর,
সুহাসি অধরে ভাসে!
বুঝি মিলনে তাহার হৃদি স্রোত ধার,
তটিনী বহিছে থর;
হৃদয়ের আশ হয় পরকাশ
ফুটিয়া ফুলের থর!

বুঝি সরমে সম্বরি নব বধূ মরি
ঝিল্লির মৃদুল তানে
কহিতেছে কথা, মরালিনী যথা
সোহাগে মরালকানে !
মরি কখন ব্রীড়ায় টানিতেছে হায়
ঘোমটা, জলদ ভার,
চাঁদিমা হাসিয়া কর প্রসারিয়া
খুলিছে ঘোমটা তার ;
আহা, এ কি প্রেম খেলা, তটিনীর বেলা
উচ্ছাসে ভাসিয়া যায়,
বিপিনে বিজনে বসি দুই জনে
প্রেমেতে ডুবিতে চায় !
আহা, জগৎ নিঝুম, আঁখি ভরা ঘুম
চাহিয়া নিদ্রার বশে
যামিনী চাঁদিমা প্রেমের প্রতিমা
দেখিনু স্বপন দেশে !
শশী শ্রবন কুহরে মধুমাথা স্বরে
শুনিনু বলিছে নিশি
ধীরে ধীরে ধীরে হাসি তুলি শিরে
আতুরি জগৎ দিশি ;
"আমি তোমার প্রভায় সুমোহন কায়
ধরেছি দেখ গো প্রভু !
তোমার বিহন এত মনোরম
করে কি শরীর কভু !
আমি যেথা যেথা যাই সেথা দুঃখ পাই,
ভাল কেহ নাহি বাসে ;
চোখ নাহি খুলে মোর প্রতি ভুলে,
লুকায় সকলে ত্রাসে !

তুমি এমন সুন্দর এত সুধাকর
রতির দুর্লভ ধন,
আমি এত কাল তবু বাস' ভাল ;
একি দয়া প্রিয়তম !"
"আমি রূপ নাহি চাই, পুড়ে হ'ব ছাই
জলন্ত অনলে হায় ;
বিষ পারাবার মথি অনিবার
কে কবে অমৃত পায় ?
আমি ভালবাসি তোরে এ হৃদয় ভোরে
প্রেয়সী ! তোমার গুণে !"
বলে নিশানাথ ; হাসি আঁখিপাত
মুদিনু, ডুবিনু ঘুমে।

শ্রীনিতাই চাঁদ শীল।

বর্ত্তমান ভারত।

বর্ত্তমান ভারত সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি পুস্তকাকারে প্রকাশিত
হইয়াছে। তিনি বৈদিক পুরোহিতগণের সময় হইতে বর্ত্তমান ইংরাজ
রাজত্বের কাল পর্য্যন্ত সংক্ষেপে ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়াছেন
অনেকের বিশ্বাস বৈদিককালে পুরোহিতগণের দুর্দ্দমনীয় শক্তি ছিল—সেই
শক্তিপ্রভাবে তাঁহারা রাজশক্তিকে সঙ্কুচিত রাখিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে
"চিরন্তন বিবাদ" ছিল। বৌদ্ধকালে সেই বিবাদে পুরোহিতশক্তির হ্রাস
হইয়া রাজশক্তির বিকাশ ও প্রাধান্য ঘটিয়াছিল। বিবাদ পূর্ব্ববৎ চলিয়া-
ছিল। পুনরায় পুরোহিতগণের জয় হইয়াছিল—তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম ও রাজ-
পূত জাতির অভ্যুত্থান হইয়াছিল। "ইঁহাদের হস্তে ভারতের রাজদণ্ড
পুনর্ব্বার অখণ্ড প্রতাপ হইতে বিচ্যুত হইয়া শতখণ্ড হইয়া যায়।" ক্রমে
সে বিবাদ মিটিয়া যায়। তাহার পর মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া
পুরোহিত শক্তিকে নিস্তেজ ও হীনপ্রভ করিয়া রাখে। ব্রাহ্মণ্য তেজ ও
ক্ষত্রিয়ের প্রতাপ হ্রাস হইয়া যায়। এইবার বৈশ্যেরা ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত
হইয়া স্বীয় প্রতাপ বিস্তার করে। ইংরাজ আগমনে এই বৈশ্যশক্তির

বিকাশ হয়। অর্থ সঞ্চয়ই জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য ইহাই বৈশ্যের মূলমন্ত্র। ক্রমে শূদ্রগণ জাগ্রত হইয়া আপনাদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন। ইংরাজি শিক্ষার ফলে ইঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি বাড়িতেছে। এই বৈশ্যশূদ্রের ব্যাপার বর্ত্তমান ভারতের প্রধান ঘটনা। বাণিজ্য ও রাজসেবা (চাকরী) প্রধান লক্ষ্যের বিষয়, অর্থাগমই জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। স্বামীর মুখে এইরূপ আভাষ পাইলে মনে হয় ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষত্রিয়ের প্রতাপ হ্রাস হওয়ায় তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতের স্বামী পৃথক উপাদানে গঠিত। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবের স্রোতে তিনি অবগাহন করিয়া অনেক পরিমাণে পুরাতন ভাব হইতে অতিক্রান্ত হইয়া নূতন ভাবে সমালোচনাদি করিয়াছেন। তিনি উল্লাস হৃদয়ে কহিতেছেন "কিন্তু আশা আছে। কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণও শূদ্রের নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে ও শূদ্রজাতিও উচ্চস্থানে উত্তোলিত হইতেছে। তথাপিও এমন সময় আসিবে যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য্য বিকাশ করিতেছে, তাহা নহে, শূদ্রধর্ম্ম কর্ম্মসহিত সর্ব্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।" তিনি জাতিভেদের উচ্ছেদ করিতে চাহেন না। শূদ্র শূদ্রই থাকুক তবে নিজে উন্নত হইয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুক ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। শূদ্র উন্নত হইয়া অপর সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে শূদ্রজাতির তাহাতে মঙ্গল হইতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশে গুণানুসারে জাতি বা শ্রেণী বিভাগের যে নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে তাহা যে সমীচীন নহে—স্বামী বিবেকানন্দ তাহা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন।

আমাদের মতে পুরোহিতশক্তি ও রাজশক্তির চিরন্তন বিবাদের কথা যাহা বলা হইয়াছে তাহা প্রকৃত নহে। পাশ্চাত্য জগতে এইরূপ বিবাদ ছিল তাহা ঐতিহাসিক সত্য। সেই বিবাদের কথা মনে করিয়া যাঁহারা ভারতে তাদৃশ ব্যাপার দেখিতে চাহেন তাঁহাদের যে ভ্রান্তি হইবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পাশ্চাত্য পুরোহিতগণের অত্যাচার ও স্বার্থপরতার কথা পাঠ করিয়া পুরোহিত মাত্রের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করা অসঙ্গত

না হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে সত্যের অপলাপ আছে তাই আমরা প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছি।

ভারতের ঋষি আর স্বর্গের দেবতা একই কথা। তাঁহারা ভারতকে ও ব্রাহ্মণ জাতিকে চিরগৌরবান্বিত করিয়াছেন। সংসারত্যাগী অতিন্দ্রিয় মহাপুরুষ আজীবন তপজপে নিরত থাকিয়া পারমার্থিক চিন্তায় নিমগ্ন। সংসারের বিলাসসুখ তাঁহার লক্ষ্যের বিষয় নহে। কাঞ্চন ও মৃত্তিকা তাঁহার নিকট তুল্য। তিনি যাহা পাইয়াছেন তাহার তুলনায় সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য অতি তুচ্ছ। পাশ্চাত্য পুরোহিতকে তাঁহার নিকট দাঁড় করাইতে যাওয়া ধৃষ্টতার বিষয়। পূর্ণ শশধরকে রাহু কবলিত করিও না। তাঁহার আবাস তপোবন, শান্তির প্রস্রবন তাঁহার লীলাস্থান, জ্ঞানের কজ্জলে তাঁহার নয়নযুগল অনুরঞ্জিত, নির্ব্বিকার প্রসন্নচিত্তে তিনি সমাধিস্থ হইয়া যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন তাহা মানবীয় কল্পনার অতীত। এদিকে সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর যিনি অধীশ্বর তিনি পার্থিব ভাবের তাড়নায় ব্যাকুল, মরুভূমের মৃগের ন্যায় কাতর হইয়া তপোবনের ঋষির চরণে শরণাপন্ন। বিষাদ, অশান্তি, অতৃপ্তি আর নাই। সম্রাট বুঝিলেন ঋষি কি বস্তু। যদি রাজ্য করিতে হয় তবে ঋষিকে চাই। ইনি সমাগত হইলে সমস্ত রাজ্য তপোবন হইয়া যাইবে। চরণে অবলুণ্ঠিত হইয়া কাকতি মিনতি করিয়া ঋষিকে রাজধানীতে আনিলেন এবং তাঁহার উপদেশ মতে প্রজাপুঞ্জের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কে তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে আবদ্ধ করিতে পারে—তপোনিধি পুনরায় তপোবনের দিকে ছুটিলেন।

এইরূপ প্রকৃতি বলিয়াই ঋষির এত আদর। তাঁহার পবিত্রতায় তদীয় কুল ধন্য হইল। এই জন্য ব্রাহ্মণ জাতির এত প্রাধান্য দাঁড়াইল।

প্রাধান্য চাহিলেই তাহা পাওয়া যায় না—গুণ না থাকিলে তাহা ঘটে না। রাজা যাঁহাকে এত মান্য করেন ইতরজাতি তাঁহাকে কিম্বা তাঁহার বংশধরকে অবমাননা করিলে রাজা যে গুরুতর শাস্তি দিবেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তিনি যে পথানুবর্ত্তী হইয়া এত উন্নত হইয়াছেন ইতরজাতির কেহ সেই পথের অনুসরণ করিয়া ঋষি হইবার ইচ্ছা করিলে রাজার তাহা অসহ্য তাই "জিহ্বাচ্ছেদ শরীর ভেদাদি" দণ্ড প্রচারিত হইল। শূদ্রের

প্রতি এই কঠোর ব্যবহার রাজা করিলেন কালে তাহাই রাজবিধান বলিয়া গণ্য হইল—ঋষি তাহা গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিলেন। অনেকে মনে করেন ব্রাহ্মণ আইন করিলেন, তদনুসারে রাজা কার্য্য করিতে লাগিলেন। ইহা যে অপ্রকৃত তাহা নহে। কিন্তু রাজা যে আইন করিতে পারেন না বা করেন না তাহা কে বলিল? রাজা যে নিয়ম করিলেন এবং কালে যাহা রাজনিয়ম বলিয়া গণ্য হইল তাহা গ্রন্থে প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার দোষী কেন হইবেন? আমরা অনেক স্থলে ইহা বুঝি না—তাই ভারতীয় ব্রাহ্মণের নিন্দা করিয়া থাকি।

ফল কথা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে কোন বিবাদ ছিল না। স্বার্থের জন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে দমনে রাখিবার চেষ্টা করেন নাই। পরশুরাম ভারতকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। রাজ্য পাইবার লোভ তাঁহার ছিল না পিতার অবমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি ক্ষত্রিয়রুধিরে পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন। রাজার কল্যাণ কামনায় ব্রাহ্মণ যাগযজ্ঞ করিতেন। উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধভাব ছিল না। কালে ব্রাহ্মণ হীন হইলেন, ক্ষত্রিয়ের প্রাদুর্ভাব বাড়িল, বা ক্ষত্রিয় হীন হইলেন ব্রাহ্মণের প্রতাপ বাড়িল—ইহা বিরোধের জন্য নহে—কাল মাহাত্ম্যের ফল মাত্র। বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে যতদিন ব্রাহ্মণের শক্তি ছিল ততদিন রাজশক্তিও প্রবল ছিল। রাম ও যুধিষ্ঠিরের সময় ঋষিগণের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল। বৌদ্ধযুগে রাজশক্তির যে বিস্তার হইয়াছিল তাহা পুরোহিত শক্তির লোপে ঘটে নাই— রাজা ধর্ম্মের (বৌদ্ধধর্ম্মের) শক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠেন। মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া উন্নত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের উপদেশ ক্ষত্রিয় রাজাকে যেরূপ উন্নত করিয়াছিল, ঋষিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধদেবের নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মহারাজ অশোক এতদূর প্রবল ও পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। বিরোধের বিপর্য্যয়ে ইহা ঘটে নাই—মিলনের মধুর মিশ্রণে ইহা সাধিত হইয়াছিল।

শূদ্রাদি জাতি যদি মনে করেন যে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় জাতির অধঃপতন হইলে তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে তবে তাহা বিষম ভ্রান্তি। উচ্চ দৃষ্টান্ত হারাইয়া কে কবে নিজেকে লাভবান মনে করিয়া থাকেন? বশিষ্ঠের ন্যায় ব্রাহ্মণ এবং ভীষ্মার্জ্জুনের ন্যায় ক্ষত্রিয় জন্মিলে কোন্ শূদ্র মর্ম্মপীড়িত হইবে?

নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। কালমাহাত্ম্যে কাহারও পথের কণ্টক আর থাকিবে না। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। বৌদ্ধদেবের চরণ স্পর্শ করিয়া অনেক শূদ্র উন্নত হইয়াছিলেন। চৈতন্যের ভক্তিস্রোতে পরিস্নাত হইয়া হরিভক্তি পরায়ণ অনেক চণ্ডাল দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে ও ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবে অনেক শূদ্র উন্নত হইতেছেন।

মনে করিও না শুধু ইংরাজি শিক্ষায় বিলাত গমনে বা অর্থ সঞ্চয়ে প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়। স্তূপাকার অর্থের উপর বসিয়া বিষাদমনে অশ্রুপাত করিতেছ কেন? এত বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াও শান্তিসুখের অধিকারী হইতে পারিতেছ না কেন? প্রকৃত কারণ সে ঋষি নাই, সে ব্রাহ্মণ নাই যাঁহাদের চরণস্পর্শে দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে পার। নাই সে সব মহদ্দৃষ্টান্ত, কিছুই নাই। এত শারীরিক বল পাইয়াও পদে পদে পদাঘাত সহ্য করিতেছ কেন? সাগরকূলের বালুকারাশির ন্যায় অসংখ্য হইয়াও স্রোতাঘাতে ব্যাকুল হইতেছ কেন? সে ক্ষত্রিয়ের মানসিক শক্তির পরিচয় পাও না, সে মহাপর্ব্বত হইতে বিচ্যুত হইয়াছে তাই এত অধোগতি। আজ যদি ভারতের তপোবন হইতে ঋষিধ্বনি শুনিতে পাইতে, ভারতের মহাশ্মশান হইতে ব্রাহ্মণ জাতির পুনরভ্যুত্থান হইত, আজ যদি কুরুক্ষেত্রের বিশালভূমি হইতে ভীষ্মার্জ্জুনের শঙ্খনিনাদ ও বাণনিক্ষেপ নির্ঘোষ শুনিতে পাইতে তবে বর্ত্তমান ভারতে বর্ত্তমান উন্নতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নূতন পথে সতেজে প্রধাবিত হইতে সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া নিজেকে প্রকৃতভাবে উন্নত করিতে পারিতে।

অতীত কালে যিনি স্বামী হইতেন তিনি পারমার্থিক চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। তখন হিন্দুরাজত্বে রাজনৈতিক ব্যাপারের কোন কথা বলিবার তত প্রয়োজন ছিল না। তখনকার রাজা ছিলেন ঋষির শিষ্যস্থানীয়—অন্যায় অত্যাচার দেখিলে ঋষি আসিয়া রাজাকে সদুপদেশ দিতেন—রাজাও অবনত মস্তকে তাহা গ্রহণ করিতেন। যাহা শিখিলে আর কিছুই শিখিবার প্রয়োজন থাকে না—তখন তাহাই শিক্ষার প্রধান বিষয় ছিল। ব্রাহ্মণগণ সেই শিক্ষা প্রদানে ব্রতী থাকিতেন। বর্ত্তমান সময়ে নানা বিষয়ে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন হইয়াছে। নানা প্রকার সাম্প্রদায়িক ভাব আসিয়া

সমাজকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিরা সাহেব সাজিতেছেন, ব্রাহ্মেরা নূতন একটী সম্প্রদায়ে পরিণত হইতেছেন। ইংরাজি শিক্ষিতদলের মধ্যে অনেকে নাস্তিক হইয়া পড়িতেছেন এবং হিন্দুধর্ম্মকে কুসংস্কারপূর্ণ আবর্জ্জনারাশি মনে করিতেছেন। জাতিবিদ্বেষ দিন দিন বাড়িতেছে। সমাজে শাসনশৃঙ্খলা শিথিল হইয়া পড়িতেছে। উদরের চিন্তায় অনেকে ব্যাকুল। যেরূপে হউক অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইলেই জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হইল এই সংকীর্ণ ভাব হৃদয়কে অধিকার করিতেছে। অনু-করণ ও আড়ম্বরের ভাব বৃদ্ধি পাইয়া মানুষ অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছে। তোষামোদের স্রোতে মনুষ্যত্ব ডুবিয়া যাইতেছে। হিন্দুর যে সরল ও উদার ভাব তাহা ক্রমশঃ তিরোহিত হইতেছে।

এই দুর্দ্দিনে স্বামী বিবেকানন্দ বর্ত্তমান ভারতের বিষয় আলোচনা করিয়া অনেক সারকথা কহিয়াছেন। তিনি বৈরাগ্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া আশার বীণা বাজাইয়া একতার সুতান তুলিয়াছেন। "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" এ গীত না গাহিয়া তিনি অতীতের গৌরব সঞ্জীবন মন্ত্রে পুনরুদ্দী-পিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। আক্ষেপের বিষয় স্বদেশ প্রেমিকের হৃদয় হইতে যে ভাবস্রোত বহিয়াছে তাহাতে ভাষা প্রণালীর বৈষম্য দোষে কেমন যেন একটু বিঘ্ন ঘটিয়াছে, এত আয়োজনেও যেন তৃপ্তির কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। প্রাণখুলে প্রশংসা করিতে না পারায় যেন মনে কথঞ্চিৎ ক্ষোভের সঞ্চার হইতেছে। তাঁহার রচনা পাঠ করিলে অনেক সময়ে মনে হয় যেন হৃদয়ের ভাব প্রথম ইংরাজি ভাষায় ব্যক্ত হইয়া শেষে মাতৃভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। যতক্ষণ না ভাব সহজভাবে মাতৃভাষার অন্তরে অন্তরে সঞ্চারিত হইয়া শাখা প্রশাখায় প্রসারণ পূর্ব্বক ফলফুলে সুশোভিতা চিরপরিচিতা উদ্যান লতিকার ন্যায় তাহার শোভাসম্বর্দ্ধন করে—ততক্ষণ সে ভাব বিসদৃশ হইয়া পাঠকের সম্যক তৃপ্তিসাধন করিতে পারে না। ভাষার এই দোষ না থাকিলে গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হইত। তথাপি ভাবের পবিত্রতায় সে দোষ নিমজ্জিত হইয়াছে। একতার স্রোতে সমুদায় ভারতকে পরিক্ষালিত করিতে না পারিলে যে কোন বীজ নিক্ষেপ করিবে তাহা ব্যর্থ হইবে, যে কোন চেষ্টা করিবে তাহা নিষ্ফল হইবে, যে কোন গীত গাহিবে তাহা অরণ্যে রোদন হইবে। সারবান্ স্বামী যে সকল সার কথা কহিয়াছেন, তাহা সক-

লেরই অবিহিত চিত্তে পাঠ করা কর্ত্তব্য। বিরোধ জ্ঞানে কাহারও প্রকৃত উন্নতি হইবে না। মিলন ও একতা ইহাই উন্নতির মূলমন্ত্র। স্বামী বিবে-কানন্দ স্বদেশ প্রেমিক। তিনি শূদ্রকে ভাই বলিয়া আহ্বান করিতেছেন। তিনি বুঝিয়াছেন উন্নতির পথে কাহারও বাধা নাই। স্বয়ং কায়স্থ হইয়াও নিজের পবিত্রতা গুণে স্বামী বিবেকানন্দ হইয়া সমাজে মান্য গন্য হইয়াছেন। উপসংহারে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। এই গ্রন্থ যে কিরূপ উপাদেয় তাহার পরিচয় আর কি দিব? নিম্নে যাহা উদ্ধৃত হইল তাহাই যথেষ্ট পরিচয়। "বলবানের দিকে সকলে যায়; গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোনও প্রকারে একটুও লাগে,—দুর্ব্বল মাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইউ-রোপীয় বেশভূষামণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত! চতুর্দ্দশশতবর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্সী এক্ষণে আর "নেটিভ" নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণপুত্রের ব্রাহ্মণ্য গৌরবের নিকট মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণেরও বংশমর্য্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটীতট মাত্র আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি, উহারা অনার্য্য জাতি!! উহারা আর আমাদের নহে!!!

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে, এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলি প্রদত্ত; ভুলিও না— তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়া মাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল মূর্খ ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই—তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর,

ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যান আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ হে জগদম্বে আমায় মনুষত্ব দাও, মা; আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দুর কর। আমায় মানুষ কর।"

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

অর্চ্চনা।—মাঘ ১৩১১। প্রথম বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যা। প্রথমেই পদ্য "কতদূরে," ইহার ধূয়া নাই। আমরা ধূয়াটি ধরাইয়া দিতেছি——

"জনমে জনমে হায়—আসে কান্না চলে যায়।"

অপর প্রবন্ধগুলি এই— "দ্বন্দ্ব ও জীবন," বাঙ্গালার প্রাচীন পুঁথীর উদ্ধার, মাধুরী (উপন্যাস), রাঠোর বালক (ষষ্ঠ স্বর্গ), কবিতা-কুঞ্জ। পাঠক বলিবেন অর্চ্চনায় ব্রহ্মচর্য্যের অভাব, অর্চ্চনায় বিলাসের চঞ্চলতা পদ্যে ও উপন্যাসের তরঙ্গে প্রকাশ পাইতেছে, "দ্বন্দ্ব ও জীবন" প্রবন্ধে যদি Survival of the fittest বুঝাইবার চেষ্টা হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা সফল হয় নাই। প্রাচীন পুঁথির উদ্ধার, অবশ্য আবদুল করিম সাহেবের— এ সংখ্যার "পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর" কিছু বুঝিবার উপায় নাই। সাহিত্য—সাধনায় একবৎসর কাল কিছুই নহে, ভবিষ্যতে যোগ-স্তিমিত গম্ভীর সাত্বিক মূর্ত্তিতে যেন আমরা অর্চ্চনা দেখিতে পাই। পদ্য উপন্যাসে বাঙ্গালা বা বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন উপকার হইবে না। কবে একজন বলিয়াছিলেন "অসভ্য জাপান," কবে একজন বলিয়াছিলেন, দিনের পর রাত্রি আসে, রাত্রির পর দিন ইহাই সাধারণ নিয়ম। যখন রাত্রি আসিয়াছে তখন ভোর হইবে। তার পর আর কোথাও কিছু দেখিয়াছেন কি? নিদাঘের দ্বিপ্রহরের "ফটিক জল" বলিয়া একটা চাতকের ডাকও নাই যে, যাহাহউক অর্চ্চনায় মাসিক সাহিত্য সমালোচনও আছে।

বীরভূমি।—১৩১১ ফাল্গুণ। এই প্রবন্ধগুলি আছে—বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক, তুমি (পদ্য), কবির সমাধি (পদ্য), ভক্তজীবনী, তুমি (পদ্য), বঙ্গে বর্গী, পৌরাণিক চিত্র, সমালোচনা। বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক অর্থে ৺ঈশ্বর

চন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী তারপর পদ্য ও কবিতা হিসাবে পাঁচটি (শক্রর মুখে ছাই দিয়া) বিষয়—দুইটি "তুমি", একটি কবির সমাধি, ভক্তজীবনী ও পৌরাণিক চিত্রে কৌশিক ব্রাহ্মণের পতিব্রতা রমণীর উপর অভিশাপ প্রদান উদ্যোগ এই দুইটি আমরা কবিতা বলিয়া গ্রহণ করিলাম। সকলেই জানেন বঙ্কিম বাবু গদ্যে কবিতা লিখিতেন, তাঁহার বৃষ্টির কথা, যাহা "প্রচারে" প্রকাশিত হয়—আষাঢ় আসিয়াছে চল নামি, চল নামি—মনে পড়ে কি? ভক্তজীবনীতে গৌরাঙ্গভক্ত গৌরাঙ্গ দাসের জীবনী পাঠ করিলে মনে হয় যেন দিবানিদ্রায় একটি সুখস্বপ্ন দেখিলাম। তবেই দেখুন মাসিক সাহিত্যে কিরূপ পদ্যের ছড়াছড়ি ও বাড়াবাড়ি। "বঙ্গে বর্গী" বাঙ্গালার ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা-- পুরাতন কথার চর্ব্বিত-চর্ব্বণ। বীরভূমি জানেন আমরা বীরভূমির চিরকাল পক্ষপাতী কিন্তু এবার যেন বীরাচারের পর অবসাদ দেখিলাম। সাধকের আবার অবসাদ কি, অবসাদ কেন? মৃত্যুর পর যথেষ্ট বিশ্রাম করিবার সময় আছে।

সে যাহা হৌক "কবির সমাধিতে" দুইটি বড় লোক দেখিলাম। "একটি কীর্ণহার গ্রামস্থিত বঙ্গের অমর কবি চণ্ডীদাসের পবিত্র সমাধি দর্শনে লিখিত।" আরটি ("ভুবনমোহিনী প্রতিভার" বিখ্যাত কবি কর্ত্তৃক লিখিত) কবিতার শেষে নাম সই আছে— "শ্রীনবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।" কত পুরাতন কথা মনে পড়িতেছে। যদি বৃদ্ধ সাহিত্য সেবক কেহ থাকেন তাঁহারও কত পুরাতন কথা মনে পড়িবে। যে দিন "সাধারণী"তে "পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী" প্রকাশিত হয় সেদিনকার তুমুল আন্দোলনের কথা কাহারও কি মনে পড়ে? ভুবন মোহিনী দেবী কবিতা লিখিতেছেন আর সাধারণী সম্পাদক তাহা জগতে প্রকাশ করিতেছেন। এখনও বহু বর্ষের পদ্ম মনে পড়িতেছে

পিঞ্জরেতে রব পিঞ্জরেতে খাব
পিঞ্জরে বসিয়া গাহিব গান
কখন হাসিব কখন কাঁদিব
কখন থাকিব করিয়া মান।

আজি বাহির হইল "পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী" কালি বাহির হইল "অকৃতজ্ঞ শুক" তারপর আবার এইরূপ। এ কবিতা বলে আমায় দ্যাখ, ও কবিতা বলে আমায় দ্যাখ বঙ্গসাহিত্য সাগরে তুমুল ...

সহস্র কণ্ঠ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল কে ভুবন মোহিনী, কোথা ভুবন মোহিনী, কার ভুবন মোহিনী ইত্যাদি। কেহ জানেনা কেহ কিছু বলিতে পারেনা, বাহা কিছু জ্ঞান চিঠির খামের মোহর দেখিয়া। মনে পড়ে তাহাতে যেন "হুব্‌রাজপুর" ডাকঘরের ছাপ থাকিত। ভুবন মোহিনী মেঘনাদের ন্যায় মেঘের আড়ালে থাকিয়া চোখে চোখে কবিতা-শরে সাধারণীর সাধারণকে বিঁধিতে লাগিলেন পাঠকগণ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। অথচ বিস্ময় যবনিকা উত্তোলন করিবার কাহারও সাধ্য নাই। পসার জমিয়া গেল। জুনিয়াস্‌কে আজি পর্য্যন্ত কেহ ধরিতে পারিল না। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে তাহা হইবে কেন? দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমে নবীন চন্দ্র মুখো চুচুঁড়া কদমতলায় ১৯৬ সংখ্যক ভবনে সাধারণী আফিসে স্বয়ং আসিয়া দেখা দিলেন। পর পর সব কথা লিখিবার আবশ্যকতা নাই, শেষে প্রকাশ হইল নবীন বাবুই স্ত্রীর নাম দিয়া কবিতা লিখিতেন লোকের রাগের আর সীমা নাই। সাধারণী সম্পাদকের অবস্থা তখন যে কিরূপ পাঠক মহাশয় একবার কল্পনায় দেখুন। যাহা হউক বঙ্গসাহিত্যে একটা সাহিত্য রহস্য রহিয়া গেল। বঙ্গীয় পাঠক ভরসা করি নবীন বাবুকে ক্ষমা করিয়াছেন সেই নবীন বাবু বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাসের সমাধি দেখিয়া কবিতা লিখিয়াছেন —

ধন্য তুমি কবিবর — কবিকীর্ত্তি অনশ্বর
করিয়াছে অমর তোমারে
তোমার মধুর গানে — স্বর্গীয় বংশীর তানে
মৃতদেহে জীবন সঞ্চারে
এ বিদগ্ধ ধরাতলে — প্রেমের পীযূষ ঢেলে
করিয়াছ বিশ্ব সুশীতল
এ দারুণ মরু মাঝে — নন্দন কানন রাজে
ধন্য তব কবিত্ব কৌশল

× × × × ×

তোমারে লম্পট শঠ — নির্লজ্জ কামুক নট
বলিয়া সকলে দিত গালি
পতিত করিয়া জেতে — রেখেছিল সমাজেতে
আরোপিয়া কলঙ্কের কালী

হায়রে অন্ধ সংসার — সদ্‌গুণের পুরস্কার
এইরূপে হয় কিরে দিতে।
ক্ষণজন্মা মহাত্মারা — জন্মিয়া জীবিতে তাঁরা
কি জন্য লাঞ্ছিত নানা মতে

× × × × ×

বঙ্গের শিক্ষিত জন — ভাবুক প্রেমিক গণ
এস সবে এ সমাধি স্থানে
পূর্ব্ব পুরুষের পাপ — স্মরি কর অনুতাপ
প্রায়শ্চিত্ত কর জনে জনে
কবির সমাধি পরে — অশ্রুবিসর্জ্জন করে
তাপদগ্ধ হৃদয় তাঁহার
সিক্ত করি ভক্তিভরে — পূজ মৃত মহাত্মারে
সদ্‌গুণের কর পুরস্কার।

চণ্ডীদাসের সমাধিতে বুঝি অনেকের সমাধি। চণ্ডীদাসের তাপ-দগ্ধ হৃদয় একথা বলিলে পাপ হয় না কি? তাঁহার যদি তাপদগ্ধ হৃদয় তবে সুধাসিক্ত কাহার হৃদয়?

সাহিত্য।— পৌষ, ১৩১১। এই বিষয়গুলি আছে— ভারত সুহৃদ ডিগ্‌বী, সম্পাদক লীলা, বেদান্ত-দর্শন, বিপত্নীক, য়্যাসবেস্‌টোজ, ভারত ইতিহাসের এক অংশ, বিশ্বকাব্য (পদ্য), অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা, কবিতা, সহযোগী সাহিত্য, বলরামপুর (পদ্য), এবং মাসিক সাহিত্য সমালোচন, আমাদের বিবেচনায় "ডিগ্‌বী" ও "য়্যাস্‌বেস্‌টোজ" সাহিত্যের উপযোগী হয় নাই। প্রথম সংবাদ পত্রের মত এবং দ্বিতীয় বস্তুবিচারের মত হইয়াছে। "বেদান্ত দর্শনে" লেখকেরও লিখিবার ধরন নাই। সাধারণ পাঠকের জন্যইত লেখা— অভিজ্ঞের জন্য হইলে না লিখিলেইত চলিত। খুব সোজা বাঙ্গালায় বুঝাইতে হয়, মধ্যে মধ্যে পাঠককে থাই ধরাইয়া দিতে হয় এবং শেষে প্রবন্ধের একটা রেওয়া করিয়া দিতে হয়। নইলে ছাপা হইল ঐ পর্য্যন্ত— কেহ পড়িল না। ১৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী আর্টিকেলের লোভ কি সম্পাদক সংবরণ করিতে পারেন, তিনিও বাঁচিয়া গেলেন। তবে তিনিত নিশ্বাস

ছাড়িলেন পাঠকও নিশ্বাস ছাড়িলেন্ "মায়ারূপা কামধেনুর বৎস জীব ও ঈশ্বর; অর্থাৎ উভয়ই মায়িক অবস্তু। তদ্বারা দ্বৈত সিদ্ধ হয় হউক, অদ্বৈতই কিন্তু তত্ত্ব" পাঠক মহাশয় কিছু বুঝিলেন কি? য়্যাসবেস্‌টোজ যেন বাঙ্গালা হরপে ইংরাজী, এও তেমনি বাঙ্গালা হরপে সংস্কৃত প্রবন্ধ। "সম্পাদক লীলাটী" বেশ চলিতেছিল শেষটা কিন্তু একনিশ্বাসে রামায়ণ গোঁছ করিয়া শেষ করা হইয়াছে। শেষ রক্ষা হয় নাই। 'নবীন গল্প-লেখক' বলিলেই হয় না। বড় ভাবের গোলমাল হইয়াছে, "বিপত্নীক"—— গল্প সকল উচ্চ-অঙ্গের সাহিত্যের জিনিষ বলা যাইতে পারে লেখক সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন কিন্তু আমরা এরূপ অহিন্দু ব্যাপারের পক্ষপাতী নহি। বিমলা ষোল বৎসর রয়সে ফাষ্টআর্টস্ পাস করিয়াছিলেন তিনিই গল্পের নায়িকা "অপূর্ব্ব-বীরাঙ্গনা" আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছে। দেবেন্দ্র বাবুর মঙ্গল হৌক।

সাহিত্য।— মাঘ, ১৩১১, এই বিষয়গুলি আছে—— ভারতচন্দ্র, ফিরিঙ্গি বণিক, মাতৃপূজা (কবিতা), ইংরাজ বর্জ্জিত ভারতবর্ষ, আমার সংসার, সহযোগী সাহিত্য, কথা, মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

এবারকার সাহিত্যের প্রায় সকল প্রবন্ধ গুলিই ভাল লাগিয়াছে 'প্রায়' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে "কথা"টা বুঝিতে পারি নাই। ভারতচন্দ্র প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের রচনা সংক্ষিপ্ত ইহা বুঝাইবার জন্য প্রায় সকল কবিকেই আসরে ধরিয়া আনা হইয়াছে ও তাঁহাদের অসম্ভব ও অতিবিস্তৃত রচনার উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস, কবিকঙ্কণ, ঘনরাম এইগুলির উদাহরণ তুলিয়া দিলে কি সংক্ষিপ্ত রচনা হয়? দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ "পর্ব্বত প্রমাণ বাস" বলাতেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়াছে? "পুঞ্জ পুঞ্জ" এক স্থানে আছে নয়——

বিবিধ বর্ণের শাড়ী দুঃশাসন ফেলে কাড়ি
পুঞ্জ পুঞ্জ হইল স্থানে স্থানে;
পর্ব্বত প্রমাণ বাস, দেখি লোকে লাগে ত্রাস
চমৎকার হইল সভাতে।

লেখক মূল সংস্কৃত হইতে দেখাইয়াছেন তাহাতে অতিবিস্তৃতি দোষ নাই। মূলের অনুবাদ এই "মহাত্মা ধর্ম্ম অন্তরিত থাকিয়া বিবিধ সুবস্ত্রে তাঁহাকে সমাবৃত করিলেন, মহারাজ দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিলে তদ্রূপ অনেক বস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইল। হে প্রভো, ধর্ম্মের প্রতিপালন হেতু নানা বরণ রঞ্জিত শত শত বসন প্রাদুর্ভূত হইল।" এইত মূল উক্তিতে যে শত শত

আছে তাহার মানে কি? শত আর শত। (১০০+১০০=২০০) দুইশত ইহা কি বুঝিতে হইবে? না বুঝিতে হইবে শত শত অর্থাৎ অসংখ্য। অসংখ্য বস্ত্র উপরি উপরি বলিলে একটা পর্ব্বত প্রমাণ হইতে পারে না কি?

তাই বলি নিজে লেখক অতিবিস্তৃতি দোষে দোষী হইয়াছেন। ভারতচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত রচনা বলিলেই পাপ ঘুচিয়া যাইত এত আড়ম্বর কেন-- এত ফেনান কেন? তারপর প্রবন্ধের শেষাংশের লেখকের রচনা পাঠ করিয়া আমাদের মনে হইল, যেন, শ্রাবণের দুর্দ্দিনে আমসত্ত্ব দেওয়া দুধের বাটীতে ল্যাংড়া আমের রস ঢালিয়া খাইতে বসিয়াছি। কবিকঙ্কণ বেচারি লেখকের দুগ্ধের বাটীর তলায় আমসত্ত্বরূপে বিরাজ করিতেছেন আর ল্যাংড়ারূপী ভারতচন্দ্রের রস সেই বাটীতে লেখক মহাশয় গড় গড় ঢালিতেছেন। বেশ। 'ফিরিঙ্গি বণিকে' কাজের কথা অতি কমই বাহির হইয়াছে। ভরসা করি ভবিষ্যতে বাহির হইবে। "আমার সংসার" নক্সাটি বেশ। কাজে ও কর্ত্তব্যে মিষ্টি লঙ্কার আচার।

বঙ্গদর্শন।— মাঘ, ১৩১১, এবারকার প্রবন্ধগুলি এই— সংস্কৃত সাহিত্যে সামাজিক চিত্র, বাচ্ছা-বর, আদিম ধর্ম্মভাব ও যোগের অঙ্কুর, উৎসবের দিন, ত্রিবঙ্কুর, সারসত্যের আলোচনা, নৌকাডুবি (উপন্যাস), পথে, (পদ্য)।

"বাচ্ছাবর", ও "আদিম ধর্ম্মভাব ও যোগের অঙ্কুর" আমাদের ভাল লাগে নাই। "বাচ্ছাবরে" ভাষার দিকে একেবারেই দৃষ্টি নাই। আর শেষোক্ত প্রবন্ধটি কতকগুলি বাজে কথায় পরিপূর্ণ। আর যাহা খুসী তাহাই বলা হইয়াছে। দুই ছত্র পড়িলেই বেশ বুঝা যায় লেখক অনধিকার চর্চ্চা করিয়াছেন। বলিয়াছেন মৃত মানুষকে জাগ্রত করিবার জন্য অসভ্য মনুষ্য আহার্য্য সামগ্রী পর্য্যন্ত উপহার দিত। "শ্রাদ্ধের পিণ্ড জলে"র ইহাতেই উৎপত্তি।

আবার বলিয়াছেন "অতি প্রাচীন বেদে জন্মান্তরবাদের নামগন্ধ নাই" অথচ দ্বিতীয় ছত্রে বলিতেছেন উপনিষদে আছে। পাদরি ম্যাক্‌ডোনেল হইতে অথর্ব্ব বেদের সার্টিফিকেট দাখিল করিয়াছেন।

তাহা এইঃ—

Taken as a whole, it is a heterogeneous collection of spells. Its salient teaching is sorcery, for it is mainly directed against hostile agencies, such as, diseases, noxious animals, demons, wizards, foes, oppressors of Brahmans.

এরূপ প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে সম্পাদকেরও একটা দায়িত্ব আছে কেন না লেখক বলিতেছেন "জন্মান্তরবাদ, ভূতনামাইবার শক্তি এবং যাদু মন্ত্রাদির, বলের উপর যে যোগতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, তাহা যোগ-প্রক্রিয়ার বিশেষ বল হইতে লক্ষিত হইতে পারিবে।"